সংসারদ্বেষী সন্ন্যাসী টাইমনই হউন; আর অতুল প্রতিভাশালী শান্তির প্রচারক, পরহিত-জীবন, মহাপুরুষ বুদ্ধদেবই হউন, সকলেরই চক্ষে সর্ব্বপ্রথমে এজগতের শোক, তাপ, বিষাদ ও যাতনা প্রতিভাত হয়। হয়ঘটে; কিন্তু যিনি তত্বজ্ঞ, যিনি বুদ্ধদেব, যিনি জরামৃত্যুর পরপারে নির্ব্বাণমুক্তি দেখিয়া, শান্তিময় সুধাময় "অহিংসা পরমো ধর্ম্ম"—সাম্যনীতি—প্রেমনীতি, প্রচার করেন; কিন্তু টাইমনের মত সংসার ছাড়িয়া পশুত্বলাভ করেন না। এই প্রভেদ। চন্দ্রনাথ বাবু ধ্যানে সর্ব্বপ্রথমে জগতের বিষাদের স্বপ্ন দেখিয়াছেন। অতলস্পর্শ শূন্য কূপ, সে শূন্যে অতলস্পর্শ অন্ধকার, সে অন্ধকারে বিষাদের—প্রলয়ের—মৃত্যুর—অনন্তপোরা, অনন্তভরা, অনন্তদীর্ঘ অনন্তপ্রস্থ, কঅ-অ-ধ্বনি। কি ভয়ানক! পাঠকেরা সে অপূর্ব্ববর্ণনা চন্দ্রনাথ বাবুর মোহকরী ভাষায় নিজেই পড়িবেন। কিন্তু চন্দ্রনাথ বাবু এই ভীষণ, অসার সৌন্দর্য্যকেই ধেয় করেন নাই। তিনি পৌষমাসময় পৃথিবীর পরপারে বসন্ত দেখিয়াছেন—কোকিলের শব্দ শুনিয়াছেন, ফুলের শোভা দেখিয়াছেন। অন্ধকারের মধ্যে, জ্যোতির্ম্ময়, শান্ত, গম্ভীর, সংযত সুন্দর মূর্ত্তি দেখিয়াছেন;—যাহার অনন্তদীর্ঘদেহের ভিতরে, অনন্ত যৌবন দূরে প্রলয় কোথায় লুকাইয়াছে। অনন্ত বিশ্ব আহ্লাদে ভাসিল, চন্দ্রনাথ বাবু তখন সেই মহাপুরুষকে ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে প্রণাম করিলেন। চন্দ্রনাথ বাবু বুদ্ধদেবের পদধূলি পাইবার যোগ্য বটে। আর যদি তিনি সত্য সত্যই অনন্তব্যাপী মহাপুরুষের কণ্ঠস্বর শুনিয়া থাকেন, তবে এ সমালোচক তাঁহার পদধূলির প্রার্থী।

এজগৎ সৌন্দর্য্যময়, কিন্তু কয়জন তাহা বুঝিতে পারে? সৌন্দর্য্য বোধ প্রস্ফুটিত করান চাই—ইহার জন্য শিক্ষাচাই। কবিগণ ইহার শিক্ষক। চন্দ্রনাথ বাবু, কোকিল, ও ফুলের ভাষায় জগৎ যে সুন্দর, তাহাই দেখাইয়াছেন। তাঁহার ভাষা যেরূপ কবিত্বময়, তাহাতে পদ্য না হইলেও এই গদ্যেই উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে। চন্দ্রনাথ বাবু জগৎকে সুন্দর দেখিয়াছেন, কাজেই কঠোর, ভীষণ মৃত্যুতে তাঁহার বিশ্বাস আর নাই। এই জন্যই তাঁহার ফুলের ফল—'ভ.বানা' ও 'পরলোক'। এই বিশ্বব্যাপী নাস্তিকতার দিনে চন্দ্রনাথ বাবুর মত শিক্ষিত লোককে আনন্দময় জগদীশ্বরে এবং পরলোকে আস্থাবান দেখিলে বড়ই সুখ হয়।

কিন্তু একটী কথা; চন্দ্রনাথ বাবু কবি, দার্শনিক নহেন। ফুলগুলি যেমন সুগন্ধযুক্ত ও সুন্দর করিয়া গড়িয়াছেন, ফল গুলির বেলায় তেমনটী হয় নাই। ফলে, যতটুকু ফুলের গন্ধ আছে সেই টুকুই ভাল, বাদবাকী নহে। ফল গড়িতে যে, ব্যবসায়িত্ব (Practicality) চাই, কবির ভাব প্রধানতায় (Ideality) তাহা মিলিতে পারে নাই। অখণ্ডজগতের সুন্দর ছবি যেমন অঙ্কিত হইয়াছে, জগৎ বিশ্লেষণ তেমন হয় নাই। দার্শনিকের বিশ্লেষণ অস্ত্রে অদৃষ্টের তত্ব, পরলোকের তত্ব তেমন যোগ্যতার সহিত উদ্ভিন্ন হয় নাই। এ অযোগ্যতার কথা কবি নিজেই একরকম স্বীকার করিয়াছেন; অদৃষ্ট আলোচনা করিতে গিয়া তিনি লিখিয়াছেন যে, "আমি অদৃষ্টবাদে যত দর্শন দেখি, তদপেক্ষা কবিত্ব দেখি, যত জ্ঞান দেখি তদপেক্ষা ভাব দেখি" ইত্যাদি। অদৃষ্ট মানিলে দয়া বাড়ে, ক্ষমা বৃদ্ধি হয়, একথাটা চন্দ্রনাথ বাবু খুব

দক্ষতার সহিত প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু কেবল ঐ একটা দিক্ মাত্র। অন্য দিক্ স্পর্শও করেন নাই। কবির চক্ষে এক দিক্ বই প্রায় কোন কিছুর ছবি পড়ে না, কিন্তু প্রতিফলিত দিকটা যে খুব সুন্দর হয়, তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু দার্শনিক সমালোচকেরা ভাল মন্দ সব দিক্ দেখেন। সকল কথারই খণ্ড খণ্ড করিয়া বিচার করেন। বঙ্গদর্শন পত্রিকাতেই, চন্দ্রনাথ বাবুর অদৃষ্ট প্রকাশের পূর্ব্বে বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় "কারণবাদ ও অদৃষ্টবাদ" নামক প্রবন্ধে (২) এই বিষয়ের আলোচনা করিয়াছিলেন। চন্দ্রনাথ বাবু, অদৃষ্টবাদের যে গুণকে কাব্যময় করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, নগেন্দ্র বাবু, স্বচ্ছ ভাষায় তাহার উল্লেখ করিতে ভুলেন নাই। অধিকন্তু, অদৃষ্টবাদের দোষেরও দক্ষসমালোচনা করিয়াছেন। ওকালতী করেন নাই, সমালোচনা করিয়াছেন। কবির সকল দিক্ দেখিবার ক্ষমতা নাই বলিয়াই বুঝি, চন্দ্রনাথবাবু Survival of the fittest মতকে নৃশংস বলিয়াছেন; ভালবাসা নামক প্রবন্ধটী পরিপক্ক করিতে পারেন নাই, পরলোক প্রমাণে বৈজ্ঞানিক তীক্ষ্ণতার অভাব দর্শাইয়াছেন। 'ফুল ও ফল', আগাগোড়া কবির কল্পনা ভাবিয়া পড়িলে,ভাবের তৃপ্তিসাধন হয়,সুখ হয়। কিন্তু জ্ঞানের দৃষ্টিতে পড়িলে, ফলগুলি মনের চরিতার্থতা সম্পাদন করিতে সক্ষম হয়। যে দোষে তাঁহার 'গুরু রস্কিন' দোষী, সে দোষে চন্দ্রনাথ বাবুতে খুব বর্ত্তিয়াছে। Ruskin যে স্থলে ভাব প্রধান, সেই স্থলেই মধুর। কিন্তু যেখানে সোজা-রকম জ্ঞানের কথা পাড়িয়াছেন, সেইখানেই সেখানেই একটু হারিয়া গিয়াছেন। তিনি সৌন্দর্য্যতত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, দর্শন রাজ্যে তাহার অনেক কথারই মূল্য অতি অল্প। এই জন্যেই বিলাতের Metaphysical society তে তিনি তেমন দক্ষ বিবেচিত হন নাই। গুরু শিষ্য এক দোষে দোষী। যাঁহারা স্পেন্সার বা বেনের ভালবাসার দেহচ্ছেদ দেখিয়াছেন, তাঁহারা চন্দ্রনাথ বাবুর ভালবাসা প্রবন্ধ পাঠে সুখী হইতে পারিবেন না। আমি এ কথা বলি না যে, তাঁহার ঐ প্রবন্ধের সব কথাগুলিই ভ্রম পূর্ণ। "যে ভালবাসা গুণ দর্শনে উৎপন্ন হয়, তাহাই ভালবাসা," "গুণ দর্শন মূলক ভালবাসা কতক পরিমাণে নিজের গুণ দর্শন সাপেক্ষ" প্রভৃতি অনেক কথা আছে, যাহা সার ও সর্ব্ববাদী সম্মত। কিন্তু তিনি আকৃতিগত সৌন্দর্য্যের উপর যতটা খড়্গহস্ত, দার্শনিকেরা ততটা হইবেন না। অকবি ও অদার্শনিক আমরা তো মোটেই নয়। আর একটা কথা এই যে, চন্দ্রনাথ বাবু ভালবাসা কথাটার অর্থ বিষয়ে কিঞ্চিৎ গোল রাখিয়াছেন। সেই কারণে একটু না বুঝিয়াই (চন্দ্রনাথ বাবু আমাকে ক্ষমা করিবেন) নব্য সমাজ সংস্কারকদিগের বিবাহ প্রথার উপর বিষবৃষ্টি করিয়াছেন। চন্দ্রনাথ বাবু ভালবাসাকে একস্থলে দয়া, অন্যত্র দাম্পত্যপ্রেম, ইত্যাদি নানারকম অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। সেই জন্যই লিখিয়াছেন যে,"নব্য সমাজ সংস্কারকেরাও মনের মানুষ খুঁজিয়া বিবাহ না করিলে, বিবাহে ভালবাসা হয় না। এই মতের পক্ষপাতী হইয়া, আমাদের প্রাচীন বিবাহ প্রণালীর উপর খড়্গহস্ত

(২) ঐ প্রবন্ধ নগেন্দ্র বাবুর বিবিধ সন্দর্ভ নামক গ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

হইয়াছেন। কিন্তু ভাবিয়া দেখা উচিত যে, মনের মানুষ খুঁজিয়া বেড়ান, ভালবাসার পাত্র বাছিয়া বেড়ান, অধার্ম্মিক ও অশিক্ষিতের কার্য্য, প্রকৃত ভগবদ্ভক্তের কার্য্য নয়। প্রকৃত ভগবদ্ভক্তের কাছে সকলই ভালবাসিবার জিনিস।" কি আশ্চর্য্য মীমাংসা!! দয়া করিয়া যত্ন করা, সমবেদনায় কাতর হওয়া, আর বিবাহ করা, এ সকলে কি এক ধাতুর ভালবাসা, কোন কালে ছিল, না আছে, না হইবে? ধার্ম্মিক হউন, শিক্ষিত হউন, আর ভগবদ্ভক্তই হউন, তিনি যাহাকে দয়া করেন, তাহাকেই বিবাহ করিতে পারেন না। এজগতে সকলই ভগবানের শিশু, তাই বলিয়া তবে একটা পশুকেও বিবাহ করা যায় কি? কথাটা বোধ হয় বড় তীব্র হইল। আচ্ছা, সহজ-দৃষ্ট বস্তু গ্রহণ করি। রাস্তার পার্শ্বস্থিত গলিত কুষ্ঠরোগী ঐ যে ভিক্ষুক, উহাকে প্রাণভরিয়া দয়া করা যাইতে পারে, কোলে বসাইয়া সুশ্রুষা করা যাইতে পারে; কিন্তু চরিত্র না জানিয়া বন্ধুত্বে বরণ করা যায় কি? যাঁহার কৌঁদলে পাড়া কম্পবান, বিষ-বচনে প্রাণ ম্রিয়মান, ধর্ম্মের নামে যাঁর গুরুতর অরুচি, ব্যবহারে নিদারুণ অশুচি, ভগবদ্ভক্ত তাহাকে ঘৃণা করিবেন না, বরং ভাবপক্ষে খুব দয়া করিবেন, সংশোধনের চেষ্টা করিবেন, কিন্তু কদাপি দাম্পত্যপ্রেমে ভালবাসিবার জিনিস করিতে পারিবেন না। "প্রকৃত ভগবদ্ভক্ত সকলকেই মনের মানুষ করিতে পারেন, যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে বিবাহ করিয়া ভাল বাসিতে পারেন"—ইহা অগভীর কথা। কি জানি, ভগবদ্ভক্তি কেমন তাহা বড় বুঝি না; এরূপ বুঝি হইতেও পারে। কিন্তু সাধারণ লোকে (যাহাদের সংখ্যা জগতে ৬৫/১৭।০), তাহারা কোন প্রকার শিক্ষার প্রভাবেই এ ভগদ্ভক্তি পাইবে না, কোন দিনই এমন রকম বিবাহ করিয়া গৃহধর্ম্ম করিতে পারিবে না।

এখন পরলোক বিষয়ক প্রবন্ধ হইতে কিঞ্চিৎ দার্শনিকতার নমুনা তুলিয়া দেখাইব। অনেক আছে, তবে একটী মাত্র দেখাইব। "শাস্ত্রতে হিন্দুর মতে মানুষ মরিয়া, আপন কর্ম্মফলানুসারে-গ্রহ হইতে গ্রহান্তরে বিচরণ করিয়া থাকে। ইহাই সঙ্গত, ইহাই যুক্তি যুক্ত কথা"। (৭৯ পৃঃ) ভাল, পাঠকগণ একবার এই সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত কথার যুক্তিসঙ্গতি ও প্রমাণ দেখুন,—"মানুষ মরিলে কি অপর কোন গ্রহ নক্ষত্রে বাস করিতে পারে না?" চন্দ্রনাথ বাবু বলেন "পারে।" কেন পারে, না, এই পৃথিবীতেই এক এক ব্যক্তি এক এক ধাতুর, কেহ মঙ্গলের ধাতুর, কেহ শনির ধাতুর। অতএব এখানেই তাহারা সেই সেই গ্রহ দ্বারা শাসিত হয়। একথার প্রমাণ এই যে, ফলিত জ্যোতিষকর্ত্তা একথা বলেন। প্রমাণটা খুব ভাল বটে!! কাজেই তাহারা পরে সেই সেই গ্রহে যাইতে পারে। এ প্রমাণের পরেও যদি কাহারও আপত্তি থাকে, তবে আরও শুনুন; চন্দ্রনাথ বাবু তর্ক করিয়া বুঝাইতেছেন;—"তুমি বলিবে, আমি ফলিত জ্যোতিষ মানি না। আচ্ছা, নাই মান। আকাশে চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র আছে, তাত মান। তবে ঠিক করিয়া বল দেখি, চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র দেখিয়া মানুষ মানুষ হইয়াছে কি না? অন্ধকার রাত্রে নক্ষত্রখচিত আকাশ দেখিয়া মানুষ দেবভাবে ভোর হয় কি না? তবে কেমন করিয়া বল যে, চন্দ্র, সূর্য্য নক্ষত্র দ্বারা

তুমি শাসিত নও? যদি তাহাই হয়, তবে তো স্বীকার করিতে হইতেছে যে, মরিলে পর, চন্দ্র বল, নক্ষত্র বল, যেখানে বল সেই স্থানেই যাওয়া সম্ভব।" হরিবোল হরি। এই প্রমাণের বলে একথাটা এত সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত? "ফলিত জ্যোতিষ মান না, আচ্ছা চন্দ্র সূর্য্য ত মান?" এইত হইল সব কথার মীমাংসা!! এ সকল কথা কবির কল্পনা বলিয়া পড়িয়াছি, মিষ্টও লাগিয়াছে, আরও পড়িতে ইচ্ছা হইয়াছে। কিন্তু ইহা দার্শনিকের যুক্তি নয়, জ্ঞানের বাণী নয়। পাঠকেরা এইটী স্মরণ রাখিয়া চন্দ্রনাথ বাবুর গ্রন্থ পড়িলে সুখী হইতে পারিবেন।

এই সকল কারণে গদ্য হইলেও 'ফুল ও ফল' কবিতা পুস্তক। সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, যদি পাঠকগণ একবার কপট রাজনৈতিক আন্দোলন, বৃথা পরগ্লানিময় সংবাদ পত্র পাঠ পরিত্যাগ করিয়া একবার চন্দ্রনাথ বাবুর "ফুল ও ফল" পড়েন, তবে প্রকৃত পক্ষেই লাভবান হইতে পারিবেন; সৌন্দর্য্যে দৃষ্টি পড়িবে; ভালবাসিবার জন্য হৃদয় উন্নত হইবে, এই কোলাহলময় পৃথিবী ভুলিয়া একবার সৌন্দর্য্যময় পৃথিবীর সহিত অদৃষ্টপূর্ব্ব অপার্থিব অনেক কথা মনে আনিতে পারিবেন। কিন্তু সাবধান, যেন মনে থাকে, এগ্রন্থ কবির লেখা, দার্শনিকের বা তার্কিকের নহে। এই কোলাহলের দিনে চন্দ্রনাথ বাবু এই গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়া আমাদিগকে যথার্থই ঋণী করিয়াছেন।

সমালোচনার উপসংহার কালে, পাঠকদিগকে একটী নমুনা তুলিয়া দেখাইব যে, চন্দ্রনাথ বাবুর সৌন্দর্য্যে দৃষ্টি কত প্রখর; ভাবের গাম্ভীর্য্য কত গভীর, শিক্ষা দিবার ক্ষমতা কত অধিক। যে কোকিলের কুহু রবকে, অসার ভোগবিলাসিতাময় সৌন্দর্য্যের সহিত লোকে সম্বন্ধ করিয়া থাকে, একবার চন্দ্রনাথ বাবুর নিম্নোদ্ধৃত কয়েক ছত্র ভাব যোগে পাঠ করিলে, আর তাহা করিবেনা,—কোকিলের রবে স্বর্গের সংবাদ শুনিবে। চন্দ্রনাথ বাবু লিখিতেছেন;——

"কোকিলের স্বর শুনিলে কেবল বিরহ-কাতরতা বৃদ্ধি হয়, একথা সত্য কিনা, আমি জানি না। কিন্তু কোকিলের স্বরে বিষ বৈ আর কি কিছুই নাই? সেই সুললিত,সুঠাম, সুমধুর, সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর, সতেজ, হোমাগ্নি-রাশির ন্যায়, পূর্ণাবয়ব, স্বতঃ উৎপন্ন স্ফূর্ত্তি-বং কু-উ ধ্বনিতে কি বিষ থাকিতে পারে?" "বসন্তে কাননের কি অপূর্ব্ব বিকাশ হইয়াছে। শীতের কুজ্ঝটিকা ঘুচিয়া গিয়াছে; সূর্য্যের নবীনালোকে চারিদিক ফুট ফুট করিতেছে। বিমল আকাশে কাননটী বেড়িয়া বেড়িয়া ছোট পাখী গুলি উড়িয়া বেড়াইতেছে। পৃথিবী সজীব দুর্ব্বাদলে আবৃত। তদুপরি নানা বর্ণ শোভিত পতঙ্গ আনন্দে লাফাইয়া বেড়াইতেছে। এই সমস্ত হর্ষ—এই সমস্ত উল্লাস—এই সমস্ত স্ফোর্ত্তি—আকাশ এবং পৃথিবীর এই সমস্ত সঙ্গীতময় স্ফূর্ত্তি কিজানি কোথাকার কোকিলের প্রাণে প্রবেশ করিয়া কুউ স্বরে অপূর্ব্বতানে নির্গত হইতেছে। * * * বসন্তের কোকিলের কু-উ ধ্বনি স্ফোর্টের সঙ্গীতাত্মক প্রতিকৃতি। অপূর্ব্ব বিকাশের অপূর্ব্ব বিজ্ঞাপনী। * * প্রস্ফুটিত ফুল,প্রস্ফুটিত শিশু, প্রস্ফুটিত যুবা,হোমরের ইলিয়ড,কালিদাসের কুমার, সেক্সপীয়রের ম্যাক্‌বেথ, শেলীর স্কাইলার্ক, ফিদিয়সের যুপিতর, বীরশ্রেষ্ঠ গর্ডন, দয়াবতার হাউয়ার্ড, প্রেমোন্মত্ত

চৈতন্য, জ্ঞানোন্মত্ত, ব্রহ্মাণ্ডরূপী ব্যাস, সকলই এক অপূর্ব্ব কু-উ ধ্বনি। বসন্তের কোকিল, তুমি বিকাশের গীতগাও, উন্নতির সঙ্গীত শুনাও, তথাপি তোমাকে এপর্য্যন্ত কেহ চিনিলনা!" এইরূপ অনেক আছে; সে সকল পাঠকেরা নিজে নিজে দেখিয়া লইবেন।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

স্নায়বীয় প্রণালী।

(ভেক।)

শরীরের সহিত মনের অতি নিকট সম্বন্ধ, ইহা সকলেই জানেন। শরীরের একটী বিশেষ বিভাগ আছে, তাহার সহিত মনের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নিকট সম্বন্ধ—এই বিভাগের নাম স্নায়বীয় প্রণালী। শরীরের মধ্যে সর্ব্বত্র এক রকম সূক্ষ্ম শাদা সূত্র আছে, তাহাকে স্নায়ু বলে। শরীরস্থ সমুদয় স্নায়ু গুলি, অব্যবহিত ভাবেই হউক, আর ব্যবহিত ভাবেই হউক, পরস্পরের সহিত সংযুক্ত—তাহারা এইরূপ সংযুক্ত বলিয়া তাহাদিগের সমষ্টিকে স্নায়বীয় প্রণালী বলে। ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের নিমিত্ত স্নায়ুর ক্রিয়া আবশ্যক, ইহা অনেকেই জানেন—ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের পক্ষে যাহা সত্য, জীবনবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা তাহা এক্ষণে সমুদয় প্রকার মানসিক ক্রিয়ার পক্ষে সত্য বলেন—অর্থাৎ তাঁহাদিগের মতে মানসিক যে কোন ক্রিয়াই হউক না কেন, তাহার নিমিত্ত একটী স্নায়বীয় ক্রিয়ার প্রয়োজন। মনের পক্ষে যাহা সত্য, শরীরের পক্ষেও তাহা সত্য—শরীরের সমুদয় ক্রিয়ার নিমিত্তই স্নায়বীয় প্রণালীর সাহায্য আবশ্যক। এক্ষণে আমরা বুঝিতে পারিতেছি, স্নায়বীয় প্রণালী আমাদিগের শরীরের একটী কত আবশ্যকীয় বস্তু—সুতরাং শরীরের এই বিভাগ সম্বন্ধে সকলেরই কিছু কিছু জানিয়া রাখা ভাল। স্নায়বীয় প্রণালী সম্বন্ধে আমরা আর একটী সত্য বলিতেছি, যে যেরূপ জন্তু তাহার স্নায়বীয় প্রণালী সেইরূপ—অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর জন্তুদিগের স্নায়বীয় প্রণালীতে সাদৃশ্য থাকিলেও সবিশেষ বিভেদ আছে। আর্শুলার স্নায়বীয় প্রণালী এক প্রকার, মৎস্যের আর এক প্রকার;—মৎস্যের একপ্রকার শূকরের আর একপ্রকার;—শূকরের এক প্রকার, বানরের আর একপ্রকার;—বানরের একপ্রকার, মানুষের আর একপ্রকার। আমরা এস্থলে ভেকের স্নায়বীয় প্রণালী সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি। পরে সুবিধা হইলে অন্যান্য কতকগুলি জন্তুর স্নায়বীয় প্রণালী বর্ণনা করিতে পারি—ভেকের স্নায়বীয় প্রণালীর ধরণ জানা থাকিলে অনেকগুলি জন্তুর স্নায়বীয় প্রণালীর একটী সাধারণ আভাস পাওয়া যায়; ভেকও এই সকল জন্তুদিগকে পৃষ্ঠবংশী জন্তু বলে; কারণ তাঁহাদিগের পৃষ্ঠ দেশে বংশবৎ একটী হাড়ের মালা আছে। মানুষ, বানর, শূকর, মৎস্য, সর্প, ভেক প্রভৃতি অনেকগুলি জন্তু পৃষ্ঠবংশী শ্রেণীর অন্তর্গত।

১=অগ্রবর্ত্তী মস্তিষ্ক।

২=মধ্যবর্ত্তী মস্তিষ্ক।

৩=পরবর্ত্তী মস্তিষ্ক।

রা=রাইনেন্ সেফালন।

প্র=প্রসেন্ সেফ্যালন বা সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ারস্।

থ্যা=থ্যালেমেন্ সেফ্যালন।

মেট=মেটেন্ সেফ্যালন বা সেরিবেলম্।

মাই=মাইয়েলেন্ সেফ্যালন বা মিডলা অব্‌লঙ্গেটা।

মে=মেসেন্ সেফ্যালন বা অপ্‌টিক লোবস্।

একটী ভেক ক্লোরোফর্ম দ্বারা মারিয়া সুরাসারের মধ্যে একটী খোলা পাত্রে রাখিয়া আস্তে আস্তে উহার মাথা ও পৃষ্ঠদেশের হাড়গুলির উপরিভাগ একখানি ছোট কাঁচি দ্বারা কাটিয়া ফেলিলে যাহা দেখা যায়, তাহা ছবিতে দেখান হইয়াছে। আমি এমন বলিতে চাহি না যে, ছবিটী নির্দ্দোষ হইয়াছে, তবে এইমাত্র বলি যে, উহা দেখিয়া পাঠক এখানকার বর্ণনা কতক মনে ধারণা করিতে পারিবেন। ছবিটীর এক অংশ ১, ২, ৩ এই চিহ্ন তিনটী দ্বারা দেখান হইয়াছে—এই অংশটা ভেকের মস্তিষ্ক, উহা মাথায় থাকে—অবশিষ্ট অংশটী পৃষ্ঠবংশে থাকে, ইহাকে আমরা পৃষ্ঠবংশস্থ রজ্জু বলিব, কারণ উহা দেখিতে রজ্জুর মত। পাঠক যদি ইচ্ছা করেন, তবে নোটে লিখিত বৈজ্ঞানিক নাম গুলি শিখিতে পারেন—আর যদি ইচ্ছা না হয়, তাহাতেও আপাতত কিছু ক্ষতি নাই। মস্তিষ্কের তিনটী ভাগ—এই তিনটী ভাগকে অগ্রবর্ত্তী, মধ্যবর্ত্তী, ও পরবর্ত্তী মস্তিষ্ক বলা যাইতে পারে। অগ্রবর্ত্তী মস্তিষ্কের সর্ব্বপ্রথমে দুটী ছোট ছোট অংশ আছে—এই দুইটী অংশ নাসিকার দুই পার্শ্বে চলিয়া গিয়াছে—ইহাদিগকেই ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের স্নায়ু বলে—অর্থাৎ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের কার্য্যের নিমিত্ত ইহাদিগের সাহায্য আবশ্যক; এই দুইটী অংশ মূলদেশে পরস্পরের সহিত সংযুক্ত। এই দুই অংশের পর দুইটী বৃহত্তর অংশ আছে—তাহাদিগের নাম পাঠকের জানিয়া রাখা আবশ্যক—তাহাদিগকে সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ারস্ বলে। ভেকের মস্তিষ্কে এই দুইটী অংশ অন্যান্য অংশের তুলনায় যত বড়, মনুষ্যের মস্তিষ্কে তাহা অপেক্ষা অনেক গুণ অধিক বড়। বস্তুত এই দুই অংশ উচ্চ শ্রেণীর জন্তুর মানসিক ক্রিয়ার প্রধান স্থান, অর্থাৎ মানসিক ক্রিয়ার নিমিত্ত যে সকল প্রধান প্রধান স্নায়বীয় ক্রিয়া আবশ্যক, তাহা এই স্থলে ঘটে। সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার দুইটীর পর যে অংশ, তাহা হইতে দর্শনেন্দ্রিয়ের স্নায়ু দ্বয়ের উৎপত্তি—দর্শনেন্দ্রিয়ের স্নায়ু দুইটী এই অংশের নিম্ন-

প্রণালী দুই প্রকার প্রধান বস্তু হইতে গঠিত—প্রকোষ্ঠ ও সূত্র। সূত্রগুলির কার্য্য ইঙ্গিত বহন করা, আর প্রকোষ্ঠের কার্য্য ইঙ্গিত গ্রহণ করা কিম্বা উৎপাদন করা। ইঙ্গিত শব্দের অর্থ বলিয়া দেওয়া আবশ্যক। ভেকের গাত্র স্পর্শ কর, কিম্বা তাহাকে চিমটি কাট, কিম্বা তাহার গাত্রে তড়িৎ প্রয়োগ কর, অথবা তাহার চক্ষুতে আলোক পতিত হউক, অথবা তাহার জিহ্বায় স্বাদ বিশিষ্ট বস্তু পড়ুক—এই সমুদয় ও অন্যান্য অবস্থায় ভেকের শরীরের বহির্ভাগ হইতে মস্তিষ্কে ইঙ্গিত চলিয়া যাইবে—যাহাদ্বারা সে ঐ সকল ব্যাপার অবগত হইবে—আবার কোন অবস্থায় বিপদ দেখিয়া কিম্বা কোন স্থলে আহার্য্য বস্তু দেখিয়া ভেকের শক্তি প্রয়োগ করিতে ইচ্ছা হইল; এরূপ অবস্থায় ভেকের মস্তিষ্ক হইতে শরীরের বহির্ভাগে ইঙ্গিত চলিয়া আসিবে, আর তদ্দ্বারা তাহার গতি সাধিত হইবে। পাঠক এক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছেন, এস্থলে ইঙ্গিত শব্দের অর্থ কি। গ্যাঙ্‌গ্লিয়নগুলিতে এবং মস্তিষ্ক ও পৃষ্ঠবংশস্থ রজ্জুর ধূসর অংশগুলিতে স্নায়ু প্রকোষ্ঠের সংখ্যা অধিক, আর স্নায়ু গুলিতে এবং মস্তিষ্ক ও পৃষ্ঠবংশস্থ রজ্জুর শ্বেত অংশ গুলিতে স্নায়ু সূত্রের সংখ্যা অধিক। কতক গুলি স্নায়ুসূত্র মস্তিষ্ক কিম্বা পৃষ্ঠবংশস্থরজ্জু কিম্বা গ্যাঙ্গ্লিয়ন মালার অভিমুখে ইঙ্গিত বহন করে—এই সকল সূত্রকে অভিবাহী সূত্র বলে—আর কতকগুলি স্নায়ু সূত্র বিপরীত দিকে ইঙ্গিত বহন করে—ইহাদিগকে বহির্বাহী সূত্র বলে। অভিবাহী সূত্রের কার্য্য দ্বারা ইন্দ্রিয়জ্ঞান জন্মে—এই নিমিত্ত উহার আর এক নাম ঐন্দ্রিয়িক সূত্র; বহির্বাহী সূত্রের কার্য্য দ্বারা অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির গতিসাধন হয়—এই নিমিত্ত উহার আর এক নাম গতিসাধক সূত্র। মস্তিষ্ক দ্বারা সমুদায় মানসিক ক্রিয়া সাধিত হয়—অর্থাৎ মানসিক ক্রিয়ার নিমিত্ত মস্তিষ্কের ক্রিয়া আবশ্যক—মানসিক ক্রিয়ার নিমিত্ত মস্তিষ্কের সমুদয় অংশগুলির মধ্যে সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ারদ্বয় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়;—যে ভেকের সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ারদ্বয় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়,—যে ভেকের সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ারদ্বয় নষ্ট করিয়া দেওয়া হয়—সে আর ইচ্ছা বৃত্তি দ্বারা কার্য্য করিতে সমর্থ হয় না, ফলত তাহার ইচ্ছা বৃত্তি লোপ পাইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। পৃষ্ঠবংশস্থ রজ্জু হইতে উত্থিত স্নায়ু গুলি দ্বারা মস্তক ভিন্ন অন্যান্য অংশের স্পর্শ ক্রিয়া ও গতি ক্রিয়া সাধিত হয়—অর্থাৎ কতকগুলি সূত্র স্পর্শ জ্ঞান সাধক ইঙ্গিত মস্তিষ্ক বহন করে, আর কতকগুলি সূত্র গতিসাধক ইঙ্গিত মস্তিষ্ক হইতে শরীরের ধার ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদিতে বহন করে। পৃষ্ঠবংশস্থরজ্জু হইতে উৎপন্ন স্নায়ুদিগের অভিবাহী সূত্র গুলি উহাদিগকে পরবর্ত্তী মূল, আর বহির্বাহী সূত্র গুলি অগ্রবর্ত্তী মূল দ্বারা উত্থিত হয় অর্থাৎ ঐ ঐ মূল দ্বারা পৃষ্ঠবংশ হইতে স্নায়ুতে প্রবিষ্ট হয়। মস্তকের ভিন্ন ভিন্ন অংশে স্পর্শ ও গতি মস্তিষ্ক হইতে উত্থিত স্নায়ু দ্বারা সাধিত হয়; দর্শন, ঘ্রাণ, শ্রবণ, আস্বাদন এই কয়টী ক্রিয়াও মস্তিষ্কের স্নায়ু দ্বারা সাধিত হয়। ইন্দ্রিয় সম্বন্ধীয় কোন ক্রিয়া সাধিত হইবার নিমিত্ত অভিবাহী সূত্র দ্বারা মস্তিষ্কের স্নায়ু প্রকোষ্ঠ গুলিতে ইঙ্গিত যাওয়ার প্রয়োজন হয়, আর ইচ্ছা দ্বারা শরীরের কোন স্থলে গতি সাধিত হইবার নিমিত্ত প্রতিবাহী সূত্র দ্বারা

সেই স্থলে মস্তিষ্কের স্নায়ু প্রকোষ্ঠ গুলি হইতে ইঙ্গিত আসা আবশ্যক। উপরে লিখিত গ্যাঙ্গ্লিয়ন-মালাদ্বয় তাহাদিগের হইতে উৎপন্ন স্নায়ু দ্বারা শরীরের অভ্যন্তরে পচন রক্ত সঞ্চরণাদি ক্রিয়া সম্পাদন করে; এই সকল ক্রিয়া মনের অজ্ঞাতসারে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে—মস্তিষ্ক ও পৃষ্ঠবংশস্থ রজ্জু ও মনের অজ্ঞাতসারে অনেক কার্য্য করিয়া থাকে। এইরূপ ক্রিয়ার নাম Reflex action বা প্রত্যাবর্ত্তিত ক্রিয়া, কারণ ইহাতে অভিবাহী ইঙ্গিত মস্তিষ্কে যাইয়া মনের উপর কার্য্য না করিয়া, মস্তিষ্ক, পৃষ্ঠবংশস্থরজ্জু কিম্বা গ্যাঙ্গ্লিয়ন মালা, এই তিনের কোন স্থল হইতে প্রতিবাহী ইঙ্গিত আকারে প্রত্যাবর্ত্তিত হয়। স্নায়ু সূত্রগুলি স্নায়ু প্রকোষ্ঠ গুলির সহিত সংযুক্ত—স্নায়ু প্রকোষ্ঠ গুলির তিন প্রকার কার্য্য, ইঙ্গিত গ্রহণ করা, গৃহীত ইঙ্গিত অন্য কোন স্থলে প্রেরণ করা, আর ইঙ্গিত উৎপাদন করা। স্নায়ু প্রকোষ্ঠ দুই প্রকার ইঙ্গিত গ্রহণ করিতে পারে—অভিবাহী সূত্রের ইঙ্গিত, আর প্রতিবাহী সূত্রের ইঙ্গিত। ভেকের প্রতিবাহী স্নায়ু সূত্রে ইঙ্গিত এক সেকেণ্ড সময়ে ৫৬ হাতের কিছু অধিক (২৮ মিটার) দূর চলিতে পারে।

শ্রীফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

আমি-রহস্য।

Our God is an indwelling encompassing reality, present in every force and illumining all space. Not only in contemplation and prayer, but in all the secular details of our daily life, in all our social and domestic duties, yea in our eating and drinking, there is God always speaking to us and showing Himself to us. But unbelievers have ever ascribed to human agency things which belong to God."

"Held fast in His encircling arms I cannot move, but am moved; I cannot speak, but I am made to speak."—*Keshub Chunder Sen.*

আমি কি, আমি কেন?—এ এক গভীর রহস্য। অতি অল্প লোকে এ গভীর রহস্য ভেদ করিতে পারে। অথচ মানুষ যতই সূক্ষ্মদর্শী হইতে বাসনা করে, ততই হৃদয়ের নিভৃত স্থানে,—যেখানে পৃথিবীর কোলাহল বা আন্দোলন পৌঁছে না—পৃথিবীর ফুল ফুটে না, আকাশের চাঁদ হাসে না, সেই অতি নিস্তব্ধ,—অতি নিভৃত স্থানে জাগিয়া উঠে—আমি কি, আমি কেন, আমি কোথায়? এই চিন্তাই ধর্ম্ম সাধনার প্রথম সোপান, এই চিন্তা যখন মানবের হৃদয়কে ব্যতিব্যস্ত করিতে থাকে, তখনই মানুষ স্বর্গের দ্বারে উপস্থিত হয়।

কিন্তু সে দূরের কথা। আমি কি, একথা অতি অল্প লোকেই বুঝিতে পারে। এই গভীর চিন্তাতে বুদ্ধদেব বনবাসী হইয়াছিলেন, খ্রীষ্ট আত্ম-হারা হইয়াছিলেন, মহম্মদ উন্মাদের ন্যায় হইয়াছিলেন। এবং সেদিন আমাদের চক্ষের সম্মুখে কেশবচন্দ্র সেন কত তৃষ্ণা-কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন? এ গভীর রহস্য কেন? আত্মবোধের শেষ নাই কেন?—কূল অকূলে পরিণত কেন? সীমা অসীমে লীন হয় কেন, প্রকৃত রূপে, এ গভীর তত্ত্ব ভেদ করা বড়ই কঠিন। ধরি-ধরি-ধরিতে পারি না, পাই-পাই-পাই-না করিতে করিতেই তন্ময়-

সেবী মানুষের জীবন শেষ হইয়া গিয়াছে। এ গভীর রহস্যের উত্তর কোথায়?

উত্তর পাওয়া যা'ক বা না যা'ক, সৃষ্ট মানুষকে বাধ্য হইয়া কিছু দিন পৃথিবীতে থাকিতেই হইবে। আদি-বোধ নাই;—পরিণাম ধারণা নাই;—অথচ মানুষ রহিয়াছে। কি জন্ত যেন, মানুষ ভূতের ব্যাগার খাটিয়া মরিতেছে। আমিত্ব হইতেই সমাজত্বের উৎপত্তি;—আমিত্ব না থাকিলে বহুত্ব বা সমাজত্ব, কিছুই থাকিত না। আমিত্ব না থাকিলে পৃথিবীর কোলাহল বা জ্বালা যন্ত্রণা কিছুই থাকিত না। যদি তাই হয়, তবে আমিত্বের বিনাশ সাধন না করিয়া মানুষ কেন কষ্ট দুঃখের দাসত্ব স্বীকার করিয়া মরিতেছে? কেন দুঃখ, কেন জ্বালা ভুগিতেছে?—এ কোন কথারই উত্তর নাই;—অথচ মানুষ আসিয়াছে, থাকিতেছে।—থাকিবে, রহিবে! কি এক অবিনাশী শক্তি পশ্চাত হইতে মানুষকে ঠেলিতেছে যে,মানুষ হতবুদ্ধি হইয়া, যে পথ সে জানে না, সেই পথের দিকেই ছুটিতেছে! সে পথ অতি ভীষণ পথ,—সে পথ মৃত্যু!

কিন্তু মানুষ কি? মৃত মানুষের শরীরকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেল,—পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সাহায্যে সমস্ত পৃথক করিয়া ফেল—শিরার পরে শিরা, মাংসের পরে মাংস, অস্থির পরে অস্থি, স্নায়ুর উপরে স্নায়ু—সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম, তাহা হইতে আরো সূক্ষ্মতত্ত্ব বাছিয়া বাহির কর;—কিন্তু এমন কিছুই দেখিতে পাইবে না, যাহাতে আমিত্বের সূক্ষ্ম বীজ—নিহিত। শোণিতই বল, আর মজ্জাই বল, তেজই বল, আর বীর্য্যই বল, সময় তাহাদিগকে রূপান্তরিত করিয়া কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন সাধিতেছে, একবার ভাবিয়া দেখ। মৃত্যুর পরে মানুষকে পৃথিবীর বাজারে অন্বেষণ করিতে যাও;—দেখিবে আর সে মানুষকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। রূপ মিলাইয়া গিয়াছে—শরীর পঞ্চভূতে মিলিয়া কি হইয়া গিয়াছে! হায়, হায়, শ্মশানে ভস্মীভূত মৃত শরীরের পরিণাম কে না দেখিয়াছে? এই ছিল, এই নাই, দেখিতে দেখিতে নিমেষের মধ্যে কি হইয়া গেল! ইহা দেখিয়া দেখিয়াও মানুষ আপনাকে লইয়াই ব্যস্ত! আপনাকে লইয়া থাকাতেই যেন মহত্ব! আমার শরীর আমার চক্ষের সম্মুখে যে পচিয়া গলিয়া ম্লান হইবে, ইহা আমার প্রাণের অসহ্য;—পৃথিবীর রোগগ্রস্ত, জলার্দ্র, রৌদ্র-দগ্ধ শরীরকে রক্ষা করিতে মানুষের কত চেষ্টা! কেবল তাহাই পরিসমাপ্তি নহে। আমি ভাল হইব—দয়া দাক্ষিণ্য প্রভৃতি গুণে ভূষিত হইব—নীতি পরায়ণ হইব—উদার হইব, ক্রমাগত মানবের এই চেষ্টা। এমন লোক পৃথিবীতে নাই—যে উন্নতির জন্য পিপাসিত নয়। এমন লোক জগতে দেখা যায় না, যে অনন্ত উন্নতিকে লক্ষ্য করে নাই। পাপী আর পুণ্যাত্মা, ধনী আর দরিদ্র, মূর্খ আর জ্ঞানী—সকলেরই লক্ষ্য উন্নতি। সে উন্নতি—অনন্ত। অনন্তের পথই মানবের একমাত্র বাসনার পথ! পাইলে আরো পাইতে ইচ্ছা হয়, ধরিলে আরো ধরিতে ইচ্ছা হয়। মানুষ ক্রমাগত অবিশ্রাম উন্নতি হইতে উন্নতিতে যাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। এই যে চেষ্টা—ইহার শেষ নাই। নিশ্চেষ্ট মানুষ এই পৃথিবীতে নাই। খাটিয়া খাটিয়া মানুষ মরিতেছে। মরিবার জন্যই মানুষ ছুটিতেছে।

শত শত ব্যক্তি মরিয়াছেন—চক্ষে দেখিয়াও মানুষ আসক্তি-দড়ি ছিঁড়িতে পারে না। মানুষ চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে মানুষকে চিতায় ভস্মীভূত করে, কিন্তু তবুও আপন পরিণাম ভাবে না। যে জন্মিয়াছে, সেইত মরিবে; কিন্তু তাহা ভাবিয়া, ভাই, তুমি কি জীবন মমতা ছিন্ন করিতে পার?—আপনার উন্নতির চেষ্টা ভুলিতে পার?—তাহা অসম্ভব। তুমিও পার না, আমিও পারি না। নিরাশার স্বপ্ন মানুষকে চিরকাল ভুলাইতে পারে না। মানুষের ক্ষত অঙ্গ পরিপূর্ণ হয়—মানুষ সকল নিরাশা হইতে উদ্ধার পায়। মরিবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত প্রাণের সম্বল—উন্নতির আশা। মৃত্যুর পরের কথা জানি না, বলিতে চাই না, কিন্তু ইহা ঠিক যে, জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত মানুষের প্রাণের সম্বল—উন্নতির পিপাসা-আশা। পিপাসা-আশা এক সঞ্জীবনী শক্তি। চক্ষের জল পড়িতে পড়িতে শুকাইয়া যায়—ভগ্ন হৃদয় দেখিতে দেখিতে ভরিয়া উঠে। শোক তাপ ও বিপদ আপদের ভ্রূকুটী দেখিতে দেখিতে মানুষ ভুলিয়া যায়। অবশেষে হাসিতে হাসিতে মানুষ মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে। মানুষ নিশ্চয় মরিবে, কিন্তু তাহাও তাহার বিশ্বাস-যোগ্য নয়—তাহারও ধারণা নাই। অন্ধকার যে মানুষের পরিণাম, তাহা কে ভাবিতে পারে? ভাবিতে পারিলে কি জীবন-ভার বহন করা যাইত?—কষ্টের পথে হাটা যাইত?—কখনই নহে। এই জন্যই মানুষ তাহা ভাবিতে পারে না। মৃত্যুর ক্রোড়ে এক পা দিয়াও মানুষ পৃথিবীর দিকে আশার চক্ষে তাকায়। এই যে আশা—এই যে দারুণ আশা, ইহা কি মৃত্যুতেই শেষ হইয়া যায়? তাহাও অসম্ভব। এই আশা ছিল, চক্ষের নিমেষের মধ্যে রক্ত যাই নিশ্চল হইল, যাই মৃত্যু ধরিল, অমনি আশা নির্ব্বাণ হইল, ইহা আমি মানি না। আমি মানি না, তুমি কি মানিতে পার? ইহা মানা তোমার পক্ষেও অসম্ভব। পৃথিবীর কেহই ভাবিতে পারে না যে, মৃত্যুই সকল উন্নতি-আশার পরিসমাপ্তি। পুনর্জ্জন্মেই বিশ্বাস কর, বা আত্মার অমরত্বই স্বীকার কর, তোমাকে মানিতেই হইবে যে, উন্নতি-আশার পরিসমাপ্তি নাই। না মানিলে ধর্ম্ম টিকে না।

এই আশাই—বিশ্বাস। কে যেন বাহিরে, সম্মুখে, পশ্চাতে। কে যেন মানুষকে অবিরত টানিতেছে। জরা-মৃত্যু-চিন্তা আসিয়া যখন রাজপুত্র সোণার চাঁদ সিদ্ধার্থের হৃদয়কে মলিন করিয়া ফেলিল, তখন কে যেন নীরব ভাষায় ডাকিয়া বলিল—"সন্তান চাহিয়া দেখ, আমি আছি।"—সিদ্ধার্থ অনশনে অনাহারেও জীবিত রহিলেন। আশার জীবন্ত শক্তিতে মানুষ মরিয়াও জীবিত। মৃত্যু কোথায়?—মৃত্যু একটা অবস্থা মাত্র। মৃত্যুর অস্তিত্ব নাই,—মৃত্যুর ভয় নাই—এই আশার নিকটে! বিশ্বাসীর নিকটে আবার মৃত্যুর ভ্রূকুটী? অনাহারই বল, আর অনিদ্রাই বল,—রোগই বল আর শোকই বল—বিশ্বাসীর নিকটে এ সকলের পরাক্রম নাই। যাহা অবশ্যম্ভাবী ঘটনা, তাহাকে মানুষ কেন ভয় করিবে? বিশ্বাসীর মরণের ভয় নাই। পূর্ব্বে বলিয়াছি, উন্নতির আশা নাই, এমন মানুষ নাই; সুতরাং অবিশ্বাসী মানুষের অস্তিত্ব পৃথিবীতে নাই। সুতরাং মৃত্যুর ভয় করিয়া মানুষ কোন দিন উন্নতিকে

বিস্মৃত হইতে পারিল না। ঈশা অনশনেও মরেন নাই। ঈশা মৃত্যু হইতে পুনরুত্থিত হইয়াছিলেন, তোমরা কি জান না? ইহা কল্পনার কথা নহে, ইহা জীবন্ত সত্য। সকলেই ঈশার ন্যায় মৃত্যুর করালগ্রাস হইতে অবিরত উত্থিত হইতেছে। এই মরিতেছি, এই উঠিতেছি—আমি। উঠি আবার মরি, মরি আবার উঠি। উঠিতে উঠিতে শেষে মৃত্যুঞ্জয় নাম ধারণ করিয়া মানুষ অমরত্ব লাভ করিতেছে। অমরের সন্তান মরিবে, তুমি, আমাকে এবং তাহাকে পড়িতে দেখিয়া ইহা ভাবিতেছ? পড়িয়াছি বলিয়া তুমি উপহাস করিতেছ? ভাই, দেখিতে দেখিতে আবার উঠিব। শিশু একবার পড়ে, আবার উঠে। অনন্তের শিশু মানুষের যদি শতবার পতন হয়, তবে সহস্রবার উত্থান হয়,—তবে সহস্রবার জীবন লাভ হয়। বিশ্বাস-আশা, সঞ্জীবনী শক্তি দ্বারা, মরিতে না মরিতে মানুষকে তুলিতেছে। একবার মরিলে আবার জীবন লাভ। মৃত্যুর হস্ত হইতে কে যেন অবিরত নির্ম্মুক্ত করিয়া দিতেছে। এই জন্যই মানুষ মৃত্যুকে ভয় করে না। কেন করিবে? এমন অমোঘ ঔষধ মানুষের হাতে থাকিতে কেন ভয় করিবে? করিবার সাধ্য কি? আশা—কেবল আশা, কেবল বিশ্বাস। এই যে বিশ্বাস, ইহার অধিকারী সকলেই। ধর্ম্ম কাহারও একচাটিয়া সম্বল নহে। ধর্ম্ম গুরুতে আবদ্ধ নহে, পুস্তকে নিবদ্ধ নহে, সময় ও কালের অধীন নহে। যিনি আমাকে আশার পথ দেখাইতেছেন, তিনিই তোমাকেও আশার পথ দেখাইতেছেন। যিনি আমাকে রাখিয়াছেন, তিনিই তোমাকে রাখিতেছেন! আমি যাহা বুঝি, তুমি তাহা বুঝ না, ইহা আমি স্বীকার করি না। সকলেরই প্রাণের বিশ্বাস—এক অচিন্ত্য অনন্ত শক্তিতে;—তা সাকারই হউক বা নিরাকারই হউক। সাকারও নিরাকার, নিরাকারও সাকার। সাকারও গুণের সমষ্টি, নিরাকারও গুণসমষ্টি। যাহাই যে মানুক না কেন, অবিশ্বাসী থাকিবার যো নাই। অবিশ্বাস লইয়া কেহই জন্মে নাই। আপনার অস্তিত্ব যে মানে, তাহাকেই মায়ের অস্তিত্ব-জঠর স্বীকার করিতে হইবে। মা ভিন্ন সন্তানের আবির্ভাব জগতে অসম্ভব। সকলেই মায়ের সন্তান; সকলেই বিশ্বাসী। মায়ের নিকট সকল সন্তান সমান। আমি বড়, তুমি ছোট, কিম্বা আমি ছোট, তুমি বড়, ইহা তুমিও আমি ভাবি বটে, কিন্তু তাঁহার নিকট তুমি ও আমি সমান। মায়ের সকল সন্তানই সমান। অন্য দিকে বড় আর ছোট কি? তুমি ধনী হইয়াও উন্নত হইতে পার, আমি কাঙ্গাল দরিদ্র হইয়াও হইতে পারি। তোমারও লক্ষ্য—উন্নতি, আমারও লক্ষ্য—এই উন্নতি। তোমাকেও যে পৃথিবীতে থাকিতে হইবে, আমাকেও সেই পৃথিবীতে থাকিতে হইবে, যে বায়ু তোমার জীবন ধারণের কারণ,—তাহাই আমার জীবন ধারণের কারণ হইতেছে। তোমারও পরিণামে মৃত্যু, আমারও তাহাই। ভেদাভেদ, কেবল কূট বুদ্ধি-প্রসূত জঞ্জাল বই আর কিছুই নহে,—কেবল অহঙ্কার হইতে প্রসূত পাপ গরল মাত্র। এ সকল ভেদাভেদে কিছু আসে যায় না। ধনের ভিতরে থাকিয়াও এক জনের উন্নতি হইতে পারে, দরিদ্রতার ভিতরে লালিত পালিত হইয়াও পারে। উন্নতি সকলেরই লক্ষ্য। মৃত্যুর পরে নবজীবন লাভ—

সকলেরই পরিণাম। অবস্থার ভেদাভেদ গণিয়া যে কূটতর্ক করে, সে বড়ই মূর্খ। সূত্রধরের গৃহে ঈশা জন্মগ্রহণ করিয়াও অমরত্ব লাভ করিয়াছেন; আর রাজার গৃহে সিদ্ধার্থ জন্ম গ্রহণ করিয়াও অমর হইয়া গিয়াছেন। সময় ও দেশের মোহ আবরণ ছিন্ন কর, বুঝিতে পারিবে—ঈশা ও বুদ্ধসকল ঘরে ঘরে বিচরণ করিতেছেন। কে সুখী, কে দুঃখী, কে বড়, কে ছোট? এ সকল গণনা নিতান্ত ভ্রমপূর্ণ। যে, যে অবস্থায় পতিত, তাহাই তাহার ভাল। দুঃখে পড়িয়াও লোক উন্নতির দিকে চলে, সুখে ভাসিয়াও লোক ঐ পথে হাটে। লোক হাটে, লোক চলে? ভুল কথা। কে যেন হাটায়, কে যেন চালায়। রাজা ও প্রজা, ধনী ও দরিদ্র—সকলেরই পরিণাম মৃত্যু ও উন্নতি। তুমি ইচ্ছা কর আর না কর, তোমাকে বাঁচিয়া থাকিতেই হইবে। তুমি ইচ্ছা কর আর না কর, তোমাকে মরিতেই হইবে। তুমি ইচ্ছা কর আর না কর, তোমাকে মরণের ভিতর দিয়া নবজীবন লাভ করিতেই হইবে। ইচ্ছা কোথায়? আমিত্ব কোথায়? সকলই তিনিত্ব—সকলই তিনিময়। তুমি ইচ্ছা করিয়াই শ্বাস প্রশ্বাস রোধ করিতে পার না—অনাহারে থাকিতে পার না। তোমাকে কর্ত্তব্য পালন করিতেই হইবে। তোমার শরীর ধারণ করিবার জন্য অন্নের গ্রাস মুখে দিতেই হইবে। লোভ নামে যে একটা কথা আছে, সেটা তুমি আমি সৃষ্টি করি নাই। আহারে স্পৃহা প্রত্যেকেরই আছে—কেবল বাঁচিবার জন্য। শিশুর মুখে অন্ন তুলিয়া দিতেই হইবে; পরিবার প্রতিপালন করিতেই হইবে; অসহায় দরিদ্রের জন্য অশ্রু ফেলিতেই হইবে—পৃথিবীর মঙ্গল চিন্তা করিতেই হইবে। সে কি জন্য? কেবল আপনার উন্নতির জন্য। পৃথিবীর সকল কর্ত্তব্য বোধ আপনার উন্নতির জন্য। কর্ত্তব্য নামক যে একটা কথা আছে, সেটা কেবল আপনার উন্নতির জন্য। তুমি যে চেষ্টা কর, ইহা তুমি ঠিক বলিতে পার না। কি এক অবিনাশী শক্তি পশ্চাত হইতে ঠেলিতেছে, মানুষ অবাক হইয়া আত্ম-হারা হইয়া কেবল চলিতেছে। বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই—মানুষ ক্রমাগতই চলিতেছে। হিন্দুত্ব, মুসলমানত্ব, খ্রীষ্টানত্ব—বৌদ্ধত্ব—সকলত্বই উন্নতির নিম্নতর সোপান হইতে উচ্চতর সোপানে উঠিতেছে। খুব গভীর ভাবে মানুষ যখন চিন্তায় নিমগ্ন হয়, তখনই মানুষ আত্ম-হারা হইয়া যায়, তখনই পিতা পুত্রে সম্মিলন হয়। তখনই পুত্র বলে "Not I, but my father in me." আমি নহি, পিতাই আমাতে বিদ্যমান! কি উচ্চ কথা! পুত্রত্ব ঘুচিয়া কেবল—পিতৃত্ব! কি আত্মত্যাগ—কি স্বার্থত্যাগের জলন্ত দৃষ্টান্ত! পিতৃত্বে ডুবিলে পুত্রত্ব ঘুচিয়া যায়। এ শরীর তাঁহারই শরীর—এ শোণিত তাঁহারই শোণিত। তাঁহারই সব—আমি কিছুই নই। আমিত্বের অস্তিত্ব অহঙ্কার মূলক কথা—প্রকৃত পক্ষে উহা কিছুই নহে। তাঁহারই ইচ্ছাতে আছি, তাঁহারই ইচ্ছাতে যাইব। মঙ্গলময়ের মঙ্গল ইচ্ছারই জয়। মানুষ তাঁহারই হাতের পুত্তলিকা মাত্র। তিনিই যন্ত্র চালাইতেছেন—আমরা কেবল যন্ত্র মাত্র। আমি যে কলম ধরিয়া লিখি, সেই কলম যেমন আমি নহি, তিনি আমাদের দ্বারা তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করিতেছেন বলিয়া—আমরাই তিনি নহেন। মানুষ, তোমরা ভুল বুঝিও না। মানুষে ঈশ্বর নহে;

কিন্তু বস্তুবে ঈশ্বর। বস্তুই ঈশ্বর নহে, কিন্তু বস্তুতে—ঈশ্বর। দ্বৈতবাদের ভিতরে, অতি সূক্ষ্ম স্থানেই অদ্বৈতবাদ লুকায়িত! তন্ময়ত্ব লাভ করিলে, আমি-মমত্ব ঘুচিয়া যায়। স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায়। ছায়া নিবিয়া যায়। মোহ আবরণ ছিন্ন হইয়া যায়। তখনই মানুষ বলে, "হে আশা, হে বিশ্বাস, হে শক্তি, তুমিই সর্ব্বস্ব, আমি কিছুই নই। বলে, আমিই তুমি নও, কিন্তু তুমিই সকল, আমি কিছুই নই। সকল তুমি, সর্ব্বস্ব তুমি, শক্তি তুমি, মুক্তি তুমি, জীবন তুমি, উন্নতি তুমি।" অনন্ত অপার চক্রে পড়িয়া মানুষের অস্থি তখন চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়। তখনই ঈশা সন্তান বেশে পুনরুত্থিত হইয়া পুত্রত্ব প্রচারের জন্য বিনয়াবতার ধারণ করে—বুদ্ধ তখন নির্ব্বাণ-পদ লাভ করে। তখন প্রকারগত বা মতগত বা সম্প্রদায়গত ভেদাভেদ আর থাকে না। পৃথিবী তখন স্বর্গ হইয়া যায়। অনন্তের সন্তানগণ অনন্ত কণ্ঠে তখন কেবল মায়ের নামই গান করে। তখন পিতৃত্ব এবং মাতৃত্বই সর্ব্বস্ব বলিয়া সন্তানের নিকট বোধ হয়। অবোধ অনন্তের শিশু সন্তান তখন পিতা মাতা বই আর কিছুই জানে না। তখন মানুষ দেখে, তিনি যেন সকল গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছেন। অস্থিতে তিনি, মাংসে তিনি, মজ্জায় তিনি, প্রতি লোমকূপে তিনি, শোণিত বিন্দুতে বিন্দুতে তিনি—সব যেন তিনিময়, আকাশ—চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র তিনিময়, বন উপবন তিনিময়—ফুল ফল—নদী সাগর—পাহাড় পর্ব্বত—সব তিনিময়। একই শক্তি সকলে, একই প্রাণ সকল বস্তুতে। প্রাণের প্রাণ, জীবনের জীবন। আপন সত্তা তখন বিশ্বসত্তায় নিমগ্ন। ক্ষুদ্র বারিবিন্দু অগাধ অতলস্পর্শ সাগরে তখন মিশিয়া গিয়াছে। পৃথকত্ব, বৈচিত্র্য, বৈষম্য, সকল ঘুচিয়া, একত্ব, এবং সাম্য সকল ঘটে বিদ্যমান। একরূপ ভাঙ্গিয়াই বিভিন্ন, এক হইতেই বহুত্বের উৎপত্তি। বিভিন্ন মিশিয়া একত্বে পরিণত। এই প্রকার যখন মানুষ তিনিময় হইয়া যায়, তখন শান্তিপুরের শান্তিঘাটে বসিয়া একতারা লইয়া গগন কাঁপাইয়া মায়ের সন্তান কেবল মায়ের নাম গান করিতে থাকে। সকল সুখ—সকল সম্পদ তখন তাহার জীবনে অবতীর্ণ হয়। অভেদাত্মক হইয়া সে তখন সোপাতনী তত্ত্ব লাভ করে। মানুষ তখন দেবত্ব লাভ করে। পশুত্ব ঘুচিয়া দেবত্ব হয়। মৃতব্যক্তি পুনর্জীবিত হয়। সংসার-ঘোর হইতে ক্রুশবিদ্ধ মানব-তনয় তখন পুনরুত্থিত হয়। বিশ্বাস যখন যাঁহার প্রাণের সম্বল হয়, তখন তাঁহাকে এই প্রকারে আমি-রহস্যের মীমাংসা করিতেই হইবে। মঙ্গলময়ের মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

বিলাপ।

১

প্রাণের ভিতরে কেন,
তুমুল ঝটিকা কেন,
আলোড়িত এ হৃদয় চলোর্ম্মি আঘাতে
শূন্য মরুভূমি মত,
হুহু করে অবিরত,
ভাসিতেছে হৃদি সদা নিরাশার স্রোতে।

২

জানিতাম এ সংসার সুখের স্বপন,
স্বপন বালিকা সনে করিতাম খেলা,
হৃদি মাঝে পরিতাম স্বপনেরমালা ;
কোথায় সে নন্দন কানন ?
মিশাইল কাল বক্ষে জলবিম্ব হেন !

৩

জানিতাম এ সংসার সুখের আগার ;
তরল জোছনা মেখে
জোছনায় বুক ঢেকে
শ্যামল তৃণের পরে রাখিতাম এভাঙ্গা দেতার,
জোছনা মদিরা ধারা ঝরিত গো নয়নে
আমার।
অকস্মাৎ কেন হায় এ ঝঞ্ঝা প্রবল
আলোড়িত করিতেছে হৃদি মণ্ডল।
কোথায় সে কৌমুদী তরল !
দিশাহারা অন্ধকার উগারিছে দারুণ গরল !!

৪

অন্তরের নিভৃত বেলায়,
নিরাশা পিশাচী
ফেলিতেছে অবিরল দারুণ নিশ্বাস ;
এ ভাঙ্গা হৃদয়ে মোর হইতেছে প্রতিধ্বনি তার।

৫

ওই যে ওখানে,
বকুলের শাখে,
মাতায়ে ভুবন,
কুহরিল পিকবর সুমোহন স্বরে,
আমার হৃদয়ে হেন,
নিরাশা বসিয়া কেন
অবিরল—অবিরত হায় হায় করে !
বনের বিহঙ্গ কেন কাঁদায় আমারে !

৬

এই যে এ স্রোতস্বিনী
কুলু কুলু কুলু ধ্বনি,
অবিরল কাঁদিতেছে পরের বেদনে,
আমি যদি যাই ওই তটিনীর পাশে
জানাতে গো প্রাণের বেদনা ;
আঘাতি উভয় তটে
অমনি চলিয়া যায় উচ্চহাসি হেসে !

৭

যদি কভু যাই,
বারিধির ঠাঁই,
নিবাতে এ হৃদয়ের প্রচণ্ড দাহন
আমারে হেরিয়া
অনন্ত সে সিন্ধুনীর যায় শুকাইয়া !

৮

তুমিও কি মহীধর তাহার মতন
বুঝ নাই পরের বেদন ?
পাষাণ অন্তর তব দ্রবেনি কখন ?
অথবা তা' কভু নয়,
তা' হ'লে যে ভেদি ওই পাষাণ হৃদয়
ঝর ঝর ঝরে,
নির্ঝরের ধারে
অবিরল নেত্রাসার হ'তোনা পতন !

৯

তুমি হে পবন
জগৎ জীবন,
কি কহিছ মৃদুস্বনে কুসুমের কানে ?
নিরাশার স্রোত কি হে তোমারও জীবনে ?
তুমিও কি আমার মতন,
প্রাণের যাতনা তব
জানাতেছ তটিনীরে মৃদুল নিস্বনে !

১০

ওহে স্রোতস্বিনি,
হেসোনা হেসোনা ওই মর্ম্মভেদী হাসি।
আজি যেন যৌবনের গরবে মাতিয়া
তরঙ্গে তরঙ্গে সখি নাচিয়া নাচিয়া

চলেছিস্ সাগর উদ্দেশে
বুকভরা ভালবাসা দিতে লো প্রাণেশে।
দেখেছি তোমায়, যবে
দুরন্ত ঝটিকা সনে
প্রেমোন্মত্ত পারাবার নিজে মেতে বয়,
পাষাণে চাপিয়া বক্ষ অবিরল করেছ রোদন,
শুনেছি তোমার সেই মর্ম্মভেদী কাতর ক্রন্দন।

১১

যাও সিন্ধু বহি যাও অনন্ত প্রবাহে;
কলুষিত করিব না নয়নের জলে
পবিত্র বালুকাময় তোমারও কূলে।
কিন্তু দেব,
অনন্ত ও মরুময় তোমার বেলায়
দিও স্থান দিও দেব কাতর জনায়!

শ্রীঅটলবিহারী সিংহ।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। সারধর্ম্ম বা তত্ত্বসার।—বগুড়া আধ্যাত্মিক বিদ্যালয় হইতে প্রচারিত—বিনামূল্যে বিতরিত। আধ্যাত্মিক বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ কর্ত্তৃক বিবৃত প্রবন্ধ সকল ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছে। সাধারণের চাঁদাতে ইহা প্রচারিত হইয়াছে। উদ্দেশ্য অতি মহৎ, কিন্তু প্রবন্ধগুলি কিছু বাছিয়া বাছিয়া প্রকাশ করিলে ভাল হইত।

২। হিন্দুশাস্ত্র—জ্ঞান কাণ্ড ও কর্ম্ম কাণ্ড, শ্রীবিপিন বিহারী ঘোষাল কর্ত্তৃক সঙ্কলিত; মূল্য ১৷৹। এই বিপিন বাবু কয়েক বৎসর পূর্ব্বে "মুক্তি এবং তাহার সাধন সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রের উপদেশ" নামক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া সর্ব্বসাধারণের কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন। এবার তিনি নানা শাস্ত্র হইতে অসংখ্য শ্লোক সংগ্রহ করিয়া হিন্দুশাস্ত্রের জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ড কিরূপ ছিল, তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। এই জন্য তাঁহাকে যথেষ্ট যত্ন এবং পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছে। বিপিন বাবুর অধ্যবসায়কে প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। তাঁহার সঙ্কলিত এই উপাদেয় গ্রন্থখানি এই বাহ্যাড়ম্বর পূর্ণ ধর্ম্মান্দোলনের সময়ে যিনি পড়িবেন, তিনিই হিন্দুধর্ম্মের গভীর মর্ম্ম অবগত হইতে পারিবেন।

৩। কবিতা-হার।—শ্রীগঙ্গানারায়ণ সেনগুপ্ত প্রণীত, মূল্য ৵৹। গঙ্গানারায়ণ বাবুর কবিতায় অনেক নূতন ভাব, অনেক নূতন কথা দেখিলাম। অনুকরণপ্রিয় বঙ্গে তিনি যে আপন পথে আপন মনে চলিতে পারিয়াছেন, এজন্য তাঁহাকে প্রশংসা করি। চেষ্টা, যত্ন, এবং অধ্যবসায় থাকিলে ভবিষ্যতে গ্রন্থকারকে আরো উন্নতদরের কবিতা লিখিতে দেখিব, আশা আছে।

৪। বনফুল—শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী, এম, এ, প্রণীত; মূল্য ৷৹ মাত্র। এই পুস্তকে যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার কয়েকটী নব্যভারতে প্রকাশিত হইয়াছিল, সুতরাং সে সম্বন্ধে আমাদের মতামত প্রকাশ করা ভাল দেখায় না। অবশিষ্ট প্রবন্ধ গুলি সুপাঠ্য, চিন্তা ও গবেষণা পূর্ণ। ক্ষীরোদ বাবু এক জন কৃতবিদ্য লোক—তাঁহার দ্বারা বাঙ্গালা ভাষার অনেক উপকার হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে আরো হইবে। এই পুস্তক খানি যিনি পাঠ করিবেন, তিনিই সুখী হইবেন।

৫। ফরিদপুর সুহৃদ সভার পঞ্চম বার্ষিক কার্য্য বিবরণ। এই সভার কার্য্যক্ষেত্র দিন দিন বিস্তৃত হইতেছে। সভা নীতিশিক্ষা এবং ব্যায়াম শিক্ষার ভার গ্রহণ

করিয়াছেন। অধিকন্তু এবৎসর হইতে সভা রজনী বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়া সাধারণ শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করিতেছেন। সভার মঙ্গল উদ্দেশ্য সকল পূর্ণ হউক, আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

৬। শ্রীহট্ট সম্মিলনীর অষ্টম বার্ষিক কার্য্য বিবরণ। সভার কার্য্য সুচারু রূপে নির্ব্বাহিত হইতেছে দেখিয়া আমরা অত্যন্ত সুখী হইলাম। কলিকাতাতে পূর্ব্ব বঙ্গের যত গুলি সভা আছে, তন্মধ্যে শ্রীহট্ট সম্মিলনীর আয় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। গত বৎসর ১৩৫৯৵১৫ আয় হইয়াছে এবং ৬২০৸৶০ ব্যয় হইয়া ৭৩৮৸৵১৫ স্থিত আছে। সভ্যগণের উৎসাহের বিশেষ পরিচয় ইহাতেই পাওয়া যায়। উৎসাহ সম্বন্ধে শ্রীহট্ট সম্মিলনী সকল সম্মিলনীর আদর্শ স্থল। সভ্যগণের এই উৎসাহ স্থায়ী হইলে শ্রীহট্টের অনেক অভাব দূর হইবে।

৭। বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন বৃত্তান্ত— শ্রীমহেন্দ্র নাথ রায় কর্ত্তৃক প্রণীত; মূল্য ৸০। শ্রদ্ধেয় অক্ষয় বাবু জীবিত থাকিতে থাকিতেই তাঁহার জীবনচরিত প্রকাশিত হইল, ইহা অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয়, সন্দেহ নাই। আমাদিগের দেশের প্রধান অভাব এই—আমরা মহৎ লোকের সম্মান করিতে আজও শিখি নাই। লোকের মহত্ব দেখিতে যে না জানে, তাহার উন্নতিলাভ অসম্ভব। কিন্তু আমাদের এমনি প্রকৃতি হইয়া উঠিয়াছে যে, আমরা লোকের দোষ ভিন্ন গুণ দেখিতে পারি না। অন্য লোকের মহত্ব আছে, ইহা স্বীকার করিতে আমাদের প্রাণ অহঙ্কারে স্ফীত হয়। এই কারণে আমাদের দেশে প্রকৃত মহৎলোক অতি অল্পই জন্ম গ্রহণ করিতেছেন। যাঁহারা আছেন, তাঁহাদেরও আদর নাই। আদান প্রদানের স্রোত স্থগিত হইয়াছে। এই জন্য আমাদের অন্তরে সর্ব্বদা দারুণ দুঃখ জাগিতেছে। এই সময়ে মহেন্দ্র বাবু আমাদের দেশের একজন প্রকৃত মহৎ লোকের জীবনী প্রকাশ করিয়া সর্ব্ব সাধারণের যে বিশেষ কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন, সে সম্বন্ধে আর সন্দেহ নাই। এই কার্য্যে ব্রতী হওয়ায় মহেন্দ্র বাবুর জীবন সার্থক হইয়াছে। এই পুস্তকে প্রকাশিত ঘটনা সকল লইয়া কোন কোন সহযোগী কিছু আন্দোলন করিয়াছেন। সে সকল ঘটনা সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা নিতান্ত অল্প। এ সম্বন্ধে এই মাত্র বলিতে পারি, সাম্প্রদায়িক তর্ক বিতর্ক সম্বন্ধে মহেন্দ্র বাবুর মতামত না দিলেই ভাল হইত। স্থানে স্থানে এ সম্বন্ধে তাঁহার কিছু অনুদারতা প্রকাশ পাইয়াছে। সে যাহাই হউক, মহেন্দ্র বাবুর ভাষা পরিপাটী এবং জীবন চরিত লিখিবার তাঁহার ক্ষমতা যথেষ্ট আছে।

৮। সাধক সঙ্গীত—শ্যামা বিষয়ক পদাবলী, প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ—শ্রীকৈলাস চন্দ্র সিংহ কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত; মূল্য ।০। এই ধর্ম্মান্দোলনের যুগে এরূপ ভক্তিভাব পূর্ণ সঙ্গীত পুস্তক সকলেরই আদরের জিনিস। এই পুস্তক খানি সকল শ্রেণীর ভক্তি শিক্ষার্থীর পক্ষেই উপকারী হইবে। কৈলাস বাবু যাহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন, তাহা যৎসামান্য নহে। এজন্য তাঁহাকে যে যথেষ্ট পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছে, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। এই পুস্তকের বহুল প্রচার হইলে দেশের প্রভূত উপকার হইবে।

৯। ভারতরহস্য—প্রথমভাগ, শ্রীরাম

দাস সেন প্রণীত ; মূল্য এক টাকা। মানুষ যতই বিজ্ঞ এবং প্রবীণ হউক না কেন, অতীত মানব সমাজের ইতিবৃত্ত পাঠে তাঁহাকে পরিতুষ্ট হইতে হইবেই হইবে। নব্যভারত পাশ্চাত্য জ্ঞানালোকের ধান্দায় পড়িয়া প্রাচীন ভারতের কীর্ত্তিকলাপের প্রতি কিছুকাল বড়ই বীতশ্রদ্ধ ছিলেন, কিন্তু পরম সৌভাগ্যের বিষয়, ভারতের সে দিন ক্রমে ক্রমে অপসারিত হইয়া যাইতেছে। নবীনত্ব ও প্রাচীনত্বের সংযোগে ভারতের ক্রমেই এক অপরূপ বেশ হইতেছে। যাঁহারা নবীন বিজ্ঞান-প্রধান-যুগে প্রাচীন জ্ঞান সংযোগ করিতেছেন, তাহারা যে ভারতের কি মহৎ উপকার সাধন করিতেছেন, ভাবী বংশধরেরা সে বিচার করিবে। আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, তাঁহারা স্বদেশের প্রিয় সন্তান—মাতৃ ভূমির সংপুত্র, তাঁহাদের নিকট আমরা বড়ই ঋণী। রামদাস বাবু প্রাচীন ভারতের নানা প্রকার তত্ত্ব সাধারণের নিকট প্রচার করিয়া বড়ই কৃতজ্ঞতার পাত্র হইতেছেন। তাঁহার যত্ন, অধ্যবসায় ও চেষ্টা দেখিলে অবাক হইতে হয়। এই গ্রন্থে সমযোগ, আর্য্যজাতির যুদ্ধাস্ত্র, ধনুর্ব্বেদ, অসি, সেবযান, রাজসূয়যজ্ঞ, অশ্বমেধ যজ্ঞ, পুরুষমেধ যজ্ঞ, রাজ্যাভিষেক, যুদ্ধরহস্য ও যুদ্ধধর্ম্ম প্রভৃতি বিষয় কয়েকটী সন্নিবেশিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি গবেষণা পূর্ণ। এই গ্রন্থ প্রাচীন তত্ত্বান্বেষী ব্যক্তিগণের নিকট যে বিশেষ রূপে আদৃত হইবে, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই।

১০। মানব প্রকৃতি—দ্বিতীয়খণ্ড—শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী, এম, এ প্রণীত ; মূল্য দুই টাকা মাত্র। অষ্ট পল্লবে এই গ্রন্থ খানি শেষ হইয়াছে। বিবর্ত্তবাদ অল্প সময়ের মধ্যে যেরূপ আদৃত হইতেছে, তাহাতে এ সন্দেহ আর কাহারও মনে নাই যে, বিবর্ত্তবাদ অসম্ভব। জগতের সকলেরই লক্ষ্য—উন্নতি। উন্নতি লাভ করিতে করিতে মানব পূর্ব্ব প্রকৃতি ও স্বভাব হইতে যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জীবের ন্যায় হইয়াছেন, ইহাতে আর কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের মতই—ক্রম উন্নতি। ক্ষীরোদ বাবু বিবিধ গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া বিবর্ত্তবাদের সমস্ত মত গুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে জাতীয় ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি মৌলিকতার ভাগ করেন নাই। বড় বড় বিখ্যাত পণ্ডিতগণের মত সকলকে একত্রে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। আমরা জানি, তাঁহার প্রতি এক শ্রেণীর লোকের বিজাতীয় ঘৃণা আছে। সে শ্রেণীকে কখনই উদার বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। কারণ পৃথিবীতে যত আবিষ্কৃত হইয়াছে, সে সকলই বিচার করিয়া দেখা উচিত।—অন্যের কথা শুনিব না, অন্যের মত পড়িব না, এ মত নিতান্ত অনুদার। এই মত কখনই জগতে স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারিবে না। ক্ষীরোদ বাবু সম্প্রদায় বিশেষ বা ব্যক্তি বিশেষের অশ্রদ্ধার পাত্র হইয়া থাকিলেও কখনই সর্ব্বসাধারণের নিকট অশ্রদ্ধা পাইবেন না। আজ হউক, কাল হউক, ক্ষীরোদ বাবুর এই উদ্যমের, এই অধ্যবসায়ের প্রশংসা করিতে এদেশে সহস্র তত্ত্বান্বেষী যুবক জন্ম গ্রহণ করিবে। আমরা এরূপ চিন্তা পূর্ণ গ্রন্থের বড়ই পক্ষপাতী। এগ্রন্থ কল্পনার বৃথা ক্রীড়া নহে ;—ইহাতে অনেক গভীর তত্ত্ব কথা আছে ; তাহা পড়িলে জীবন সম্বন্ধে এক গভীর রহস্য বাহির হইয়া পড়ে। সে সকল কথার উল্লেখ করিবার স্থান নাই বলিয়া আমরা দুঃখিত হইতেছি। এ গ্রন্থ ক্রমেই ইংরাজীভাষানভিজ্ঞ স্বদেশীয় পাঠকগণের নিকট আদৃত হইবে ; এবং ক্ষীরোদবাবুর পরিশ্রম সফল হইবে।

চৈতন্যচরিত ও চৈতন্য ধর্ম্ম (৩য়)।

চৈতন্যের সমসাময়িক ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক ঘটনা।

চৈতন্য জীবনের শেষ অষ্টাদশবর্ষের ঘটনাবলী উড়িষ্যার নীলাদ্রিতে সংঘটিত হইয়াছিল; এবং উৎকল রাজ ও তাঁহার প্রধান সভাসদগণ চৈতন্যের প্রিয়ভক্ত ছিলেন, সুতরাং সে দেশের সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক ঘটনা এ প্রস্তাবের নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক বিষয় নহে। চৈতন্য জন্মিবার বহু পূর্ব্ব হইতে বঙ্গদেশ যেরূপ স্বাধীনতা হইতে বিচ্যুত হইয়া যবন করতলগত হইয়াছিল সৌভাগ্য ক্রমে উড়িষ্যার অবস্থা তখন সেরূপ ছিল না। তখনও নীলাচলের রাজপ্রসাদে হিন্দুস্বাধীনতার বিজয় পতাকা উড়িতেছিল এবং সমস্ত উৎকল দেশবাসী স্বাধীনভাবে কালযাপন করিতেছিল। অধিক সৌভাগ্যের বিষয় এই যে চৈতন্যদেবের সময়ে বাঙ্গালীবংশীয় রাজাগণ উড়িষ্যার নৃপাসনে আসীন ছিলেন।

ইতিহাসের পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন যে ৪৭৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১১৩১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উৎকলের সিংহাসনে কেশরীবংশীয় নৃপতিগণ রাজত্ব করিয়াছিলেন। শেষোক্ত বৎসরে কেশরীবংশ ধ্বংশ করতঃ গঙ্গাবংশের জনৈক রাজকুমার উৎকল সিংহাসন অধিকার করিয়া লইলেন। সেই হইতে ১৫৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গঙ্গাবংশীয় নৃপতিগণ একাদিক্রমে উড়িষ্যায় রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। এই বংশের শেষ রাজাগণের সময়ে কেবল কয়েক বৎসর সিংহাসন লইয়া গোলযোগ বাধিয়াছিল। সে যাহা হউক চৈতন্যের সময়ে গঙ্গাবংশীয় প্রতাপরুদ্র নামে নরপতি উড়িষ্যার রাজাসনে আসীন ছিলেন। অধ্যাপক উইলসন সাহেব সাব্যস্ত করিয়াছেন যে মেদিনীপুর ও তমলুকের মধ্যবর্ত্তী স্থান বিশেষ হইতে গঙ্গাবংশের আদিপুরুষ প্রথমে উৎকলে গমন করিয়াছিলেন। সুতরাং এই রাজাগণ যে জাতীতে বাঙ্গালীছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। বৈষ্ণব দিগের গ্রন্থে রাজা প্রতাপরুদ্রের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতেও উইলসন সাহেবের কথাই দৃঢ়ীভূত হয়। কারণ এই রাজা অতিশয় বাঙ্গালীর পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার প্রধান সভা পণ্ডিত ও প্রধান প্রধান অমাত্যবর্গ সকলেই বাঙ্গালী ছিলেন। প্রধান সভা পণ্ডিত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ক্ষমতা অদ্বিতীয় ছিল।

রাজা প্রতাপ রুদ্র চৈতন্যদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়াছিলেন। তাঁহার মনোগত ইচ্ছা পত্রের দ্বারা সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে জানাইলে ভট্টাচার্য্য প্রসঙ্গতঃ ঐ কথা চৈতন্যকে জানাইলেন। স্ত্রী ও রাজদর্শন সন্ন্যাসীর পক্ষে নিষিদ্ধ; সুতরাং সন্ন্যাসী চূড়ামণি চৈতন্য এই কথা শ্রবণমাত্রে (বিষ্ণু) (বিষ্ণু) বলিয়া কর্ণে অঙ্গুলি দিলেন ও সার্ব্বভৌমকে বলিলেন যে যদি তিনি পুনরায় ঐরূপ কথার প্রসঙ্গ করেন তবে আর তাঁহাকে নীলাদ্রিতে দেখিতে পাইবেন না। সার্ব্বভৌম গত্যন্ত মানিয়া অগত্যা ঐ কথা রাজাকে জানাইতে বাধ্য হইলেন। প্রতাপ রুদ্র

গৌরাঙ্গের প্রতি এত অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে ঐ কথা শ্রবণে মর্ম্মাহত হইলেন এবং চৈতন্যের সাক্ষাৎকার না পাইলে রাজ্যাদি সমস্ত বিষয়বৈভব পরিত্যাগ করতঃ বৈরাগ্যাশ্রম গ্রহণ করিবেন প্রতিজ্ঞা করিলেন। ভগবৎপ্রেমিক রামানন্দ রায় নর্ম্মদা প্রদেশে প্রতাপ রুদ্রের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। দাক্ষিণাত্য পরিভ্রমণ কালে গোদাবরী তীরে চৈতন্যের সহিত তাঁহার মিলন হওয়ার পর রামানন্দ রায় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে বিষয় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া জীবনের অবশিষ্টকাল চৈতন্যের সহবাসে কাটাইবেন। এই মনোগত ইচ্ছা তিনি রাজাকে নিবেদন করিলে রাজা প্রতাপরুদ্র আহ্লাদ সহকারে তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন ও তাঁহার নির্দ্ধারিত বেতন তাঁহাকে পেন্‌শন্ স্বরূপ মাসে মাসে দেওয়া হইবে তাহার ও আদেশ করিয়া দিলেন; এবং সেই সঙ্গে তিনি তাঁহার দ্বারায় চৈতন্যের সাক্ষাৎ দর্শনের ইচ্ছা জানাইলেন।

"তোমার যে বর্ত্তন তুমি খাও সে বর্ত্তন;
নিশ্চিন্ত হইয়া ভজ চৈতন্য চরণ।
আমি তার যোগ্য নহি তাঁর দরশনে।
তাঁরে যেই ভজে তাঁর সফল জীবনে।" চৈঃ চঃ

রামানন্দ রায় চৈতন্য সমীপে রাজার এই কাতরোক্তি বিজ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু তাহাতেও কিছু ফলোদয় হইল না। তখন গজপতি প্রতাপরুদ্র আপন রাজধানী কটকনগর হইতে সার্ব্বভৌমকে এই দ্বিতীয় পত্র লিখিলেন যে যদি তিনি গৌরাঙ্গের দর্শন না পান তবে নিশ্চয়ই রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া উদাসীন হইয়া চলিয়া যাইবেন। এই পত্রে তিনি মহাপ্রভুর সমস্ত পার্ষদগণকেও অতি দীন ভাবে আত্মনিবেদন জানাইয়া ছিলেন এবং তাঁহাদিগকে তাঁহার নিমিত্ত চৈতন্যের নিকট অনুরোধ করিবার জন্য বলিয়াছিলেন। এই পত্র পাঠ করিয়া নিত্যানন্দপ্রমুখ সমস্ত ভক্তগণ চৈতন্যকে চটেপটে ধরিলেন; কিন্তু ধর্ম্মবীর চৈতন্য কিছুতেই আপন বিশ্বাস হইতে টলিলেন না। অবশেষে সকলে মিলিয়া এক রফা-বন্দোবস্ত করিলেন যে চৈতন্যের একখানি বহির্বাস রাজসমীপে পাঠান হইবে। চৈতন্যের পরিবর্ত্তে রাজা ঐ বহির্বাসকে আলিঙ্গন করিতে পাইবেন। তাহাই করা হইল। তাহাতে রাজা কতক শান্ত হইলেন বটে; কিন্তু তাঁহার মনের ক্ষোভ মিটিল না। তখন চৈতন্যদেব রাজপুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হইলে রাজা আপন তনয়কে গৌরাঙ্গ সন্নিধানে পাঠাইলেন। গৌরাঙ্গ মহানন্দে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। রাজাও পরে সেই পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া আপনাকে কৃতার্থম্মন্য জ্ঞান করিলেন।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে অর্থাৎ ১৫১০ খৃষ্টাব্দে মহাপ্রভু বঙ্গদেশ দিয়া বৃন্দাবন যাইবার মনস্থ করিয়া কটক নগরে চলিয়া আসিলেন এবং নগরের বহিরুদ্যানে আপন বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিলেন। রামানন্দ রায় মহাপ্রভুর সমভিব্যাহারে ছিলেন; তিনি প্রভুর আগমন বার্ত্তা রাজস্থানে জানাইলে রাজা প্রতাপ রুদ্র যেন স্বর্গের চাঁদ হাতে পাইলেন এবং বহুকাল সঞ্চিত মনের গাঢ় অনুরাগ এখন অনায়াসে চরিতার্থ হইতে পারিবে ভাবিয়া অতি ব্যস্ততার সহিত যাইয়া চৈতন্যের চরণ বন্দনা করিলেন ও প্রণয়বিহ্বলে অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। চৈতন্য তাঁহার ভক্তিতে সন্তুষ্ট

হইয়া তখন তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন।

"তবে আনন্দিত রাজা শীঘ্র আইলা;
প্রভু দেখি দণ্ডবৎ ভূ মতে পড়িলা।
পুনঃ উঠে পুনঃ পড়ে প্রণয় বিহ্বল;
স্তুতি করে পুলকাঙ্গে পড়ে অশ্রুজল।
তাঁর ভক্তি দেখি প্রভুর তুষ্ট হৈল মন;
উঠি মহাপ্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।"
চৈঃ চঃ

যে সময়ের কথা বলা হইতেছে তখন উড়িষ্যারাজ ও বঙ্গেশ্বরে যুদ্ধ হইতেছিল। উৎকল সীমার পর পারে যবন রাজা। পথে দস্যুভয় ও যবনসৈনিকগণের প্রচুর অত্যাচার ছিল। বঙ্গদেশে যাইতে পথি মধ্যে চৈতন্যের কোন অসুবিধা না হয় ও যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে বঙ্গদেশে পৌঁছিতে পারেন এই উদ্দেশে রাজা প্রতাপ রুদ্র প্রদেশস্থ ও বিভাগীয় রাজকর্ম্মচারীগণকে পত্র লিখিয়া দিলেন, এবং পথের দুই পার্শ্বে সামগ্রীসস্তার প্রস্তুত থাকে ও জলপথে নৌকার সুব্যবস্থা হয় এরূপ উপায় করিয়া দিয়া রামানন্দরায় ও আপনার প্রধান অমাত্য শ্রীহরিচন্দন ও মঙ্গরাজকে তাঁহার সমভিব্যাহারে দিয়া পাঠাইলেন। সচিবদ্বয় যাজপুর পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিলেন। কিন্তু রামানন্দ রায় রেমুণা পর্য্যন্ত সঙ্গে আসিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। চৈতন্যের সঙ্গে বহু ভক্ত মণ্ডলী যাইতে লাগিলেন। যেখানে যান রাজকর্ম্মচারীদের সুব্যবস্থায় সেইখানে পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন এই প্রকারে শ্রীগৌরাঙ্গ বহু ভক্ত সমাকীর্ণ হইয়া উৎকলের সীমান্তঃপ্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে উৎকলরাজের শাসনকর্ত্তা তাঁহাকে ৩৪ দিন অপেক্ষা করিতে বলিয়া তাঁহার নিরাপদে বাঙ্গলায় যাইবার জন্য যবন রাজকর্ম্মচারীর সহিত সন্ধিস্থাপনের যত্ন করিতে লাগিলেন।

"দিন কত রহ সন্ধি করি তার সনে;
তবে সুখে নৌকাতে করাইব গমনে।" চৈঃ চঃ

এই সময়ে যবনরাজের এক অনুচর উড়িয়াদিগের কটকে আসিয়া মহাপ্রভুর ভক্তিভাব ও নামসংকীর্ত্তন দেখিয়া গিয়া আপন প্রভুকে জানাইল। যবনাধ্যক্ষ তাহা শুনিয়া চৈতন্যকে দেখিতে ইচ্ছুক হওত আপন বিশ্বাসী অনুচর দ্বারায় আপন অভিলাষ বলিয়া পাঠাইলেন। উৎকল রাজাধ্যক্ষমহাপাত্র প্রত্যুত্তরে এই বলিয়া পাঠাইলেন যে যদি নিরস্ত্র হইয়া কেবল দুই চারি জন ভৃত্য সঙ্গে আসিতে স্বীকৃত হয়েন, তবে আসিয়া মহাপ্রভুকে দর্শন করিতে পারেন; নচেৎ নহে। যবনরাজ সেই প্রকারেই আসিয়া চৈতন্যের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন; এবং তাঁহার স্বর্গীয় প্রেম ভক্তির ভাবাবলোকনে তাঁহার প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন। তখন সেই দাম্ভিক যবন আপন পদমর্য্যাদা বিস্মৃত হইয়া পূর্ব্বকৃত পাপের জন্য অনুতাপ করিতে লাগিলেন, এবং বালকের ন্যায় পরিত্রাণের জন্য ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ফলতঃ সম্পূর্ণরূপে তাঁহার জীবন পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। তখন যবনাধ্যক্ষ চৈতন্যের বঙ্গ গমনের সকল সুবিধা করিয়া দিলেন এবং জলপথায় উত্তম উত্তম নৌকা সজ্জিত করিয়া দিয়া জলদস্যুগণ তাঁহার প্রতি অত্যাচার করিতে না পারে, সেই জন্য পিছলদা পর্য্যন্ত স্বয়ং তাঁহার সঙ্গে আসিলেন। সেখান হইতে তিনি বিদায় হইয়া

গেলে চৈতন্য দেব তাঁহার দত্ত নৌকারোহণে নির্বিঘ্নে পানীহাটী গ্রামে আসিয়া উপনীত হইলেন।

"জল দস্যু ভয়ে সেই যবন চলিল,
দশ নৌকা ভরি সেই সৈন্য সঙ্গে নিল।
মন্ত্রেশ্বর দুষ্ট নদী পার করাইল;
পিছলদা পর্য্যন্ত সেই যবন আইল।
সেকালে তার প্রেম চেষ্টা না পারি বর্ণিতে;
তারে বিদায় দিল প্রভু সেই গ্রাম হৈতে।"

চৈঃ চঃ

এক্ষণে যে জমিদারী প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে, ইহার মূলান্বেষণ করিতে গেলে মুসলমান্ রাজাদিগের অধিকার সময় নির্বাচন করিতে হয়। ইতিহাস পাঠে জানাযায় যে মুসলমান্ রাজগণ বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড সকল উৎপন্ন শস্যের অংশের গড় পড়তা ধরিয়া করাবধারণ করত ভূম্যধিকারীগণকে বিলী করিয়া দিতেন; ও তাঁহাদের নিকট হইতে ঐ কর আদায় করিয়া লইতেন। ভূম্যধিকারীগণ করাদায়ে অশক্ত হইলে বা দুষ্টামি করিলে সরকার হইতে ক্রোক সাঁজোয়াল নিযুক্ত করিয়া আদায়ের চেষ্টা হইত। ইংরেজাধিকারের প্রথমাবস্থাতেও এই প্রথা প্রবর্ত্তিত ছিল। লর্ড কর্ণওয়ালিস্ সাহেবের শাসন কালে ঐ নির্দ্দিষ্ট করে জমিদারী সকল চিরকালের জন্য বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল; এবং অদ্যাবধি তদনুসারে করাদায় হইয়া আসিতেছে। জমিদার, তালুকদার, মকররীদারে প্রভৃতি উচ্চ উচ্চ পদ হইতে কর্ষণকারী কৃষক পর্য্যন্ত এক্ষণে বহুবিধ স্বত্বের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারও অঙ্কুর মুসলমানদিগের আমলে সমুদ্ভূত হইয়াছিল। বৈষ্ণব গ্রন্থের অনেক স্থানে এইরূপ ভূম্যধিকারীর উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে এস্থানে যে ঘটনাটী লিপিবদ্ধ করাযাইতেছে, তাহা হইতেই পাঠক মহাশয় তৎকালের রাজস্ব সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা কিরূপ ছিল তাহার আভাস পাইতে পারিবেন।

চৈতন্যের সময়ে হিরণ্যদাস ও গোবর্দ্ধন দাস নামে দুই সহোদর সপ্তগ্রাম জমিদারীর ভূম্যধিকারী ছিলেন। এই জমিদারীর বার্ষিক আয় বার লক্ষ টাকা ছিল। হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন অতিশয় বদান্য, সদাচার নিষ্ঠ ধার্ম্মিক এবং ব্রাহ্মণ ভক্ত ভূম্যধিকারী ছিলেন। কথিত আছে যে নবদ্বীপে এমন ব্রাহ্মণ ছিল না, যাঁহারা তাঁহাদের ব্রহ্মত্তর খাইতেন না বা অর্থে প্রতিপালিত হইতেন না। চৈতন্যের মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী ও পিতা জগন্নাথ মিশ্র ইহাদিগকে উত্তম রূপে জানিতেন; উভয় ভ্রাতা তাঁহাদের সেবায় বিলক্ষণ তৎপর ছিলেন। কালক্রমে গোবর্দ্ধন ও হিরণ্য অনেক টাকার জন্য বাকিদার হইলে একজন মুসলমান্ চৌধুরী হিরণ্য দাসের জমিদারী ডাকিয়া লইল। কিন্তু ভ্রাতৃদ্বয় দখল ছাড়িয়া না দেওয়ায় সে ব্যক্তিও রাজসরকারে বার লক্ষ টাকার দায়ীক হইল। তখন সে অনন্যোপায় হইয়া রাজসরকারে দরখাস্ত করিয়া উজীরকে সরেজমিনে আনাইল। ভ্রাতাদ্বয় এই সংবাদ প্রাপ্তিমাত্রে পলায়ন করিলেন। উজীর আর কাহাকেও না পাইয়া গোবর্দ্ধনের পুত্র রঘুনাথ দাসকে কারারুদ্ধ করিলেন। এই রঘুনাথ দাস পরবর্ত্তী সময়ে সমস্ত বিষয় সংসার পরিত্যাগ করত বৈরাগ্য গ্রহণ করিয়া নীলাচলে চৈতন্যের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, এবং চৈতন্যদেব মর্ত্তালোক

পরিত্যাগ করার পর বৃন্দাবনে যাইয়া অবশিষ্ট জীবন ভগবানের আরাধনায় যাপন করিয়াছিলেন। যাহাহউক রঘুনাথ কারাবদ্ধ হইয়া ম্লেচ্ছচৌধুরীকে পিতৃসম্বোধন করতঃ এরূপ ভাবে বিনয় করিলেন যে যবন ভূম্যধিকারী তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া রঘুনাথের কারামোচন করাইয়া দিলেন। এবং তাঁহার পিতা ও জ্যেষ্ঠতাতের সহিত আপোষে মীমাংসা করত সমস্ত দেনাপাওনার হিসাব পরিষ্কার করিতে পারিলেন।

"রঘুনাথ আসি তবে জেঠা মিলাইল;
ম্লেচ্ছ সহিত বশকৈল, সবশান্ত হৈল।"
চৈঃ চঃ।

যবন কুল তিলক ভক্ত হরিদাসের জন্মস্থান বূঢ়ন গ্রাম। অল্প বয়সে হরিদাস গৃহসংসার ত্যাগ করিয়া নিকটবর্ত্তী কোন বেণা-ঝোপের মধ্যে বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করত হরিনাম সাধন করিতে লাগিলেন। দেশের ভূম্যধিকারী রামচন্দ্রখান একজন দুর্দ্ধর্ষ ও বৈষ্ণবদ্বেষী লোক ছিল। লোকে হরিদাসকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করিত তাহা তাহার পক্ষে অসহ্য হইল। সেজন্য সে হরিদাসের তপস্যা ভঙ্গ করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া রাত্রি যোগে একজন বারাঙ্গনা তাঁহার নিকটে প্রেরণ করিল। ইহাতে ভক্তের তপস্যা ভঙ্গ হওয়া দূরে থাকুক সেই বেশ্যা সাধু ভক্তের ভক্তিভাব ও নিষ্ঠা দেখিয়া কুমতি পরিত্যাগ করতঃ নবজীবন লাভ করিল। স্থানান্তরে এই প্রসঙ্গ বিস্তৃত রূপে ব্যাখ্যাত হইবে; এখানে এই পর্য্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে এই অধার্ম্মিক ও উপদ্রবকারী দেশাধ্যক্ষ শীঘ্রই স্বীয় অনুষ্ঠিত পাপের ফল ভোগ করিল। আর এক সময়ে বহুসংখ্যক লোক সঙ্গে লইয়া নিত্যানন্দপ্রভু হরিনাম কীর্ত্তনের জন্য ইহার বাটীতে গিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করা দূরে থাকুক এই পাষণ্ড তাঁহাদিগকে কুবাক্য বলিয়া বিদায় করিয়া দিয়াছিল এবং বৈষ্ণবদিগের প্রতি তাহার যে আন্তরিক ঘৃণাছিল তাহা দেখাইবার জন্য নিত্যানন্দ তাহার চণ্ডীমণ্ডপের যেস্থানে বসিয়াছিলেন, সেই স্থানের ও সমস্ত আঙ্গনার মৃত্তিকা খনন করিয়া ফেলাইয়া দিল ও ঐ স্থান গোময় দ্বারা লেপাইল।

"তবে রামচন্দ্র খান সেবকে আজ্ঞাদিল;
গোঁসাই যাঁহা বসিলা তার মাটী খোদাইল।
গোময় জলে লেপিল সব মন্দির প্রাঙ্গন।"
চৈঃ চঃ।

এই রামচন্দ্র খান সুবিধা পাইলেই দস্যুবৃত্তি করিতে ছাড়িত না এবং জমিদারীর দেয় রাজস্ব আদায়ে পরাঙ্মুখ ছিল। ইহাতে রাজাজ্ঞায় উজীর আসিয়া তাহাকে গেপ্তার করার জন্য তাহার বহির্বাটীর চণ্ডীমণ্ডপে বাসা করিয়া থাকিল; এবং ভক্তসমাবেশ হইয়াছে বলিয়া যেস্থানের মাটী ইত্যগ্রে সে খনন করিয়া ফেলাইয়াছিল, সেই স্থানে অবধ্যবধ ও গোমাংসাদি রন্ধন করিতে লাগিল। পরে সপরিবারে রামচন্দ্রকে বন্ধন পূর্ব্বক লইয়া গেল এবং বহুদিন পর্য্যন্ত সেই গ্রাম উজাড় করিয়াছিল। এইরূপে সাধুর অপমানের জন্য সমস্ত গ্রাম দণ্ডনীয় হইল। রামচন্দ্র খানের বিবরণ নিম্নলিখিত রূপে বর্ণিত হইয়াছে।

"দস্যুবৃত্তি রামচন্দ্র রাজায় না দেয় কর।
ক্রোধ হয়ে ম্লেচ্ছ উজীর আইল তার ঘর;
আসি সেই দুর্গামণ্ডপে বাসা কৈল;
অবধ্য বধ করি ঘরে মাংস রাঁধিল।

স্ত্রী পুত্র সহিত রামচন্দ্রেরে বাঁধিয়া
তার ঘর গ্রাম লুটে তিন দিন রহিয়া।

*   *   *   *

মহন্তের অপমান যে দেশ গ্রামে হয়।
এক জনের দোষে সব দেশ উজাড়য় ॥”

চৈঃ চঃ।

একণে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে সুসভ্য ইংরাজাধিকারে বাস করিয়াও যখন ভূম্যধিকারীগণের নানা প্রকার অত্যাচার উপদ্রবের কথা নিতান্ত অবিরল দেখা যায় না, তখন যে রামচন্দ্র খানের ন্যায় অত্যাচারী ও পাষণ্ড জমিদার পঞ্চদশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়া অশেষ প্রকারে সমাজকে দূষিত করিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? তবে তখন মুসলমানের আমলদারী; সে সময়ে তাহার প্রতি যেরূপ দণ্ড হইয়াছিল, একালে সেরূপ দণ্ড দিবার নিয়ম নাই। স্ত্রী পুত্র সহিত বাঁধিয়া লইয়া যাওয়া ও ঘরবাড়ী লুটপাট করিয়া লওয়ার পরিবর্ত্তে একণে রাজকীয় দণ্ডবিধি ও শাসনবিধি অনুসারে কার্য্য হইয়া থাকে।

তখনকার সময়ে নামে মাত্র মুসলমান দিগের ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত ব্যবস্থাশাস্ত্র দেশের রাজকীয় আইন রূপে নির্দ্দিষ্টছিল; কিন্তু কার্য্যেতে তাহার কিছুই হইত না। একণে যেমন দেওয়ানী, ফৌজদারী, কালেক্টরী প্রভৃতি বিভাগ সকল শ্রেণীবদ্ধ হইয়া পৃথক পৃথক রূপে কার্য্য শৃঙ্খলা সংগঠিত হইয়াছে তখন সেরূপ কিছুই ছিল না। রাজধানীতে রাজাই সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। কিন্তু রাজার সানুকূল আদেশ লাভ তাঁহার প্রিয়পাত্রদিগকে উৎকোচের দ্বারাই সম্পাদিত হইত। প্রিয়মন্ত্রী বা অনুচর যেরূপ বুঝাইয়া দিতেন রাজা তদনুযায়ী কার্য্য করিতেন। রাজা ব্যতীত রাজধানীতে এক জন কাজী ও একজন সহর কোতয়াল থাকিতেন। তাঁহারা সামান্য সামান্য অভিযোগ শ্রবণ করিতেন। রাজধানী ব্যতীত প্রধান প্রধান নগরেও এক এক জন কাজী থাকিত। এই সব কাজীগণের ক্ষমতা অদ্বিতীয় ছিল। তাঁহারা দেওয়ানী, ফৌজদারী প্রভৃতি সকল বিষয়েরই শাসন কর্ত্তা ছিলেন; এবং আপনাদের ইচ্ছানুসারে দণ্ড পুরস্কার দিতে পারিতেন। চৈতন্যের সময়ে এইরূপ একজন কাজী নবদ্বীপে নিযুক্ত ছিলেন।

চৈতন্যচন্দ্রের জন্মের পূর্ব্বে ভক্তিপথাবলম্বী যে সকল বৈষ্ণবগণ নবদ্বীপে বাস করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে গঙ্গাদাসপণ্ডিত নামে একজন ছিলেন। কোন কারণ বশতঃ তিনি এক সময়ে যবনের কোপে পড়িয়াছিলেন। যবন প্রতিনিধি কাজী এই আদেশ দিয়াছিলেন যে রাত্রি প্রভাতে সপরিবারে তাঁহাকে ধরিয়া আনিতে হইবে ও তাঁহার বাটীঘর কাটিয়া গঙ্গাজলে ফেলাইয়া দিতে হইবে। গঙ্গাদাস কোন বিশ্বস্ত সূত্রে এই বিপদপূর্ণ সংবাদ জানিতে পারিয়া সেই গভীর রজনীযোগে সপরিবারে বাটী হইতে বহির্গত হইলেন এবং কোন মতে গঙ্গাতীরে আসিয়া পারে যাইবার সুবিধা দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার দুর্ভাগ্য ক্রমে তত্রাত্রে খেয়াঘাটে নৌকা পাওয়া গেল না; এবং চারিদিক অন্বেষণ করিয়াও কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না। এদিকে রাত্রিপ্রভাত হইবার উপক্রম হইল দেখিয়া গঙ্গাদাস অতিশয় কাতর স্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহার সাক্ষাতে যবনে তাঁহার পরিবারবর্গকে স্পর্শ

করিবে এই ভাবনায় আকুল হইয়া অবশেষে গঙ্গার ঝাঁপ দিয়া আত্মহত্যা করিবেন স্থির করিলেন। এই সময়ে তাঁহার নয়ন গোচর হইল যে একজন নাবিক একখানি ক্ষুদ্র তরণী লইয়া মধ্য গঙ্গা দিয়া বাহিয়া চলিয়া যাইতেছে। তদ্দৃষ্টে তিনি তাহাকে আহ্বান করত একটী টাকা ও একজোড়া বস্ত্র দিতে অঙ্গীকার করিয়া তাঁহার নৌকারোহণে গঙ্গা পার হইয়া আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বৈষ্ণবেরা বলেন যে স্বয়ং ভগবান্ খেয়ারীর রূপধারণ করিয়া গঙ্গাদাসের পরিত্রাতা হইয়াছিলেন। কাজী দিগের এরূপ দৌরাত্ম্যের কথা তৎকালে বিরল ছিল না। যখন চৈতন্যের আদেশে নবদ্বীপের ঘরে ঘরে মৃদঙ্গকরতালের ধ্বনির সহিত হরিনাম সংকীর্ত্তনের ধুন পড়িয়া গেল, তখন যবন ও অন্যান্য নাগরিক লোক কাজীর নিকট ঐ কথা জানাইলে, কাজী স্বয়ং গৃহে গৃহে যাইয়া খোলকরতাল ভাঙ্গিয়া দিলেন ও নাম সংকীর্ত্তন করিতে নিষেধ করিয়া দিয়া সর্ব্বসাধারণকে সতর্ক করিয়া দিলেন।

"শুনিয়া যে ক্রুদ্ধ হৈল সকল যবন;
কাজী পাশে আসি সবে কৈল নিবেদন।
ক্রোধে সন্ধ্যাকালে কাজী একঘরে আইল;
মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া লোকে কহিতে লাগিল।
এতকাল প্রকটে কেহ না কৈল হিন্দুয়ানি;
এবে উদ্যম চালাও সবে কার বল জানি?
কেহ কীর্ত্তন না করিহ সকল নগরে;
আজি আমি ক্ষমা করি যাইতেছি ঘরে।"

চৈঃ চঃ

এই সম্বাদ চৈতন্যের কর্ণ গোচর হইলে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া সমস্ত নগর প্রতিধ্বনিত করিয়া এক মহাসংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। সহস্র সহস্র লোকে মৃদঙ্গ, করতাল, শঙ্খ, কাঁশর ইত্যাদি লইয়া তাঁহার দলে যোগ দিল; এবং সহস্র সহস্র মশালের আলোকে নগর দিবালোকের ন্যায় প্রতিভাত হইতে লাগিল। চৈতন্যের প্রকাশ্য সংকীর্ত্তনের এই আরম্ভ। সে রাত্রের সংকীর্ত্তনের প্রতাপে কাজী লুক্কায়িত হইতে বাধ্য হইয়া পলায়ন পর হইলেন। তৎপরে যখন তিনি চৈতন্যের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ও ঈশ্বর প্রেমের জলন্ত প্রতিমূর্ত্তি রূপে তাঁহাকে অনুভব করিতে লাগিলেন তখন তাঁহার বিদ্বেষ ভাব কোথায় চলিয়া গেল। তদবধি তিনি একজন বিশ্বাসী ভক্ত মধ্যে পরিগণিত হইলেন; এবং নানা প্রকারে চৈতন্যদেবের সংকীর্ত্তনবিলাসের সুবিধা করিয়া দিলেন।

বঙ্গে মুসলমানাধিকারের কিছু কম তিনশত বৎসর পরে চৈতন্যদেব অবতীর্ণ হয়েন। এই দীর্ঘকাল জেতা ও জিতগণ এক দেশে বাস ও এক ভাষায় কথোপকথন করা ও পরস্পর সংযুক্ত থাকা হেতু পরস্পরের মধ্যে এক প্রকার সৌহৃদ্য ভাব জন্মিয়াছিল। উভয় জাতীয় লোকের মধ্যে সম্পর্ক পাতাইয়া পরস্পরকে সম্বোধন করা হইত, ইহাতেই সে ভাব সুস্পষ্ট রূপে প্রতীয়মান হইতেছে। নবদ্বীপের কাজী চৈতন্যকে ভাগিনেয় বলিয়া সম্বোধন করিতে কিছুমাত্র অপমান বোধ করেন নাই।

"গ্রাম সম্বন্ধে চক্রবর্ত্তী হয় আমার চাচা;
দেহ সম্বন্ধ হৈতে গ্রাম সম্বন্ধ সাচা।
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী হয় তোমার নানা;
সে সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা।
ভাগিনার ক্রোধ মামা অবশ্য সহয়;
মাতুলের অপরাধ ভাগিনা নালয়।" চৈঃ চঃ

নদীয়া জেলার জজ কি মেজেষ্টর সাহেবের পক্ষে নবদ্বীপ নগরবাসী সামান্য এক জন ব্রাহ্মণ সন্তানের সহিত এইরূপে কথোপকথন করা সামান্য মহত্ত্বের পরিচায়ক নহে। এক্ষণে কি আমাদের রাজপুরুষগণ আমাদের সহিত এরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন? অবশ্য মুসলমানগণের অধিকার সময়ে নানা প্রকারে প্রজাগণের উপর অত্যাচার হইত সত্য! কিন্তু তথাচ বাঙ্গালী মুসলমানের নিকট যে সকল অধিকার পাইয়াছিল, সুসভ্য ইংরাজগণের নিকট তাহা পাওয়া যাইবে কি না জানি না।

সামাজিক অবস্থা।

চৈতন্যের সময়ের সামাজিক রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার বর্ত্তমান সময়ের আচার আচরণ হইতে যে অনেক পরিমাণে ভিন্ন ছিল তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। প্রথমতঃ পরিচ্ছদ সম্বন্ধে বাঙ্গালীর জাতীয়ভাব ও রুচি যে এক্ষণে ভয়ানক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। এমন কি সে সময়ের যদি কোন অত্যতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ পুনর্জীবিত হইয়া মর্ত্ত্য লোকে ফিরিয়া আসিতে পারিতেন, তবে তাঁহার অধস্তনবংশীয়কে দেখিলে তাঁহার বংশ সম্ভূত বলিয়া বিশ্বাস করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িত। কোথায় এক্ষণকার সার্টকোট, মোজা, পেণ্টুলেন, বিলাতী জুতা চশমাধারী ছোট বড় কর্ত্তিতকেশ ইয়ং বেঙ্গল, আর কোথায় তখনকার থরবাটা শূন্যপদ, শূন্যগাত্র, জানুর্দ্ধ পরিধেয়ী বঙ্গীয় যুবা! কিন্তু স্ত্রীলোকদিগের পরিচ্ছদাদি যে বিশেষ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে তাহা বলা যায় না। সহর বাজারে এক্ষণে মেয়েদের জুতা, মোজা ও বডী পরিতে দেখা যায় বটে, কিন্তু পল্লীগ্রামে এক্ষণেও সেকালকার ভাব অনেক পরিমাণে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে তাহা স্বীকার করিতে হয়। তবে গহনা সম্বন্ধে এক্ষণে সেকালের ন্যায় রুচি নাই। যাহা হউক এক বিষয়ে কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীর মহিলার পরিচ্ছদ এক্ষণ হইতে অনেক পরিমাণে উৎকৃষ্ট ছিল তাহা স্বীকার করিতে হইবে। পাঠক শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন না যে তখনকার সম্ভ্রান্তভদ্রমহিলাগণ কেবল সাটীকে ভদ্রোচিত পোষাক মনে করিতেন না; সাটী। উপরে তাঁহারা ওড়নার ন্যায় বস্ত্র ব্যবহার করিতেন। ঐ বস্ত্রকে তখন ভুনি দোগজা বলিত। চৈতন্যের জন্ম হইলে অদ্বৈতের স্ত্রী সীতাদেবী কি রূপ পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া শিশুকে দেখিতে যাইতেছেন দেখুন।

"অদ্বৈত আচার্য্য ভার্য্যা, জগত বন্দিতা আর্য্যা।
নাম তাঁর সীতা ঠাকুরাণী।
আচার্য্যের আজ্ঞা পেয়ে, চলে উপহার লয়ে,
দেখিতে বালক শিরোমণি।
সুবর্ণের কড়ি বউলি, রজতের পাশুলি,
সুবর্ণের অঙ্গদ কঙ্কন।
দুবাহুতে দিব্য শঙ্খ, রজতের মল বঙ্ক,
স্বর্ণ মুদ্রা নানা হার গণ।
ব্যাঘ্রনখ হেমজড়ি, কটি পট্টে সূত্র ডোরি,
হস্ত পদের যত আভরণ।
চিত্র বর্ণের পট্টসাড়ী, ভুনি দোগজা পট্টপাড়ি
স্বর্ণ রৌপ্য মুদ্রা বহু ধন।
দুর্ব্বা ধান্য গোরচন, হরিদ্রা কুঙ্কুম চন্দন,
মঙ্গল দ্রব্য পাত্র ভরিয়া।
বস্ত্র গুপ্ত দোলাচরি, সঙ্গে লয়ে দাসী চেড়ি,
বস্ত্রালঙ্কারে পেটরা ভরিয়া।

ভক্ষ্য যোগ্য উপহার, সঙ্গে লইল বহুভার
শচী গৃহে হইল উপনীত।' চৈঃ চঃ।

আহারাদি ও খাদ্য দ্রব্য সম্বন্ধে যে, সেকালে ও একালে বিশেষ কিছু ব্যত্যয় হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। তখনও ডাল, ভাত, তরকারী, শাক সবজী, ঘৃত, দধি, দুগ্ধ মৎস্য প্রধান খাদ্যের মধ্যে পরিগণিত ছিল; এক্ষণেও তাহাই আছে। তবে এখন যে কালিয়া পোলাও ও হোটেলে খাওয়ার রীতি কোন কোন শিক্ষিত দলে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তখন সেরূপ ছিল না। এতদ্ভিন্ন শাক্ত ও বামাচারীগণ ছাগমাংস আহার করিতেন। দধি ও ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধের সহিত চিপীটক ও রম্ভা চিনি সংযোগে ফলাহারের ঘটাটাও বিলক্ষণ ছিল। পাণিহাটীতে নিত্যানন্দ যে চিড়া মহোৎসব দেন, তাহাতে এ বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। এখনকার মত নানা প্রকার মিষ্টান্ন ও মিষ্টকাদিও তখন প্রস্তুত হইত; কিন্তু সর্ব্বত্রেই রন্ধনের ভার স্ত্রীলোকগণের উপর অর্পিত থাকিত। আচার্য্য-পত্নী সীতাদেবী চৈতন্যের নিকট কিরূপ দক্ষতার সহিত পাক বিদ্যার পরিচয় দিয়াছিলেন, একবার দেখা যাউক।

"মধ্যে পীত ঘৃত সিক্ত শাল্যন্নের স্তূপ;
চারি দিকে ব্যঞ্জন দোনা আর মুদ্গ সূপ।
বাস্তুক শাক পাক করি বিবিধ প্রকার;
পটোল কুষ্মাণ্ড বড়ি মানকচু আর।
চৈ মরিচ সুক্তা দিয়া আর মূল ফলে
অমৃত নিন্দুক পঞ্চবিধ তিক্ত ঝালে।
কোমল নিম্ব পত্র সহ ভাজা বার্ত্তকী;
পটোল ফুলবড়ী ভাজা কুষ্মাণ্ড মানচাকী।
নারিকেল শস্য ছানা সর্করা মধুর।
মোচাঘণ্ট, দুগ্ধ কুষ্মাণ্ড সকল প্রচুর।
মধুরাম্ল, বড় অম্ল, অম্ল পাঁচ ছয়;
সকল ব্যঞ্জন কৈল লোকে যত হয়।
মুদ্গ বড়া, মাস বড়া কলাবড়া মিষ্ট;
ক্ষীরপুলি, নারিকেলপুলি, যত পিঠা ইষ্ট।
সঘৃত পায়স মৃৎ কুণ্ডিকা ভরিয়া।
তিন পাত্রে ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধরাশেত ধরিয়া।
দুগ্ধ চিতাই, দুগ্ধ লকলকী কুণ্ডিভরি;
চাঁপাকলা দধি সন্দেশ কহিতে না পারি।"
চৈঃ চঃ।

লুচি কচুরির প্রথা বোধ হয় বড় একটা চলিত ছিল না। কারণ ঐ রূপ খাদ্যের বর্ণনা কি চৈতন্য চরিতামৃত, কি চৈতন্য ভাগবত, কি কোন কড়চা গ্রন্থে কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না।

প্রচলিত ধর্ম্মের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে; তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। সাধারণ ভদ্র সকল লোকই ভূত, প্রেত উপদেবতার অস্তিত্বে বিশ্বাস করিত; এবং সাপের মন্ত্র, ডাইনের মন্ত্র প্রভৃতি মন্ত্রের বলবীর্য্য দৃঢ় রূপে মানিত।

"কেহ রক্ষা বাঁধে, কেহ পড়ে স্তুতিবাণী।
কেহ বিষ্ণু পাদোদক অঙ্গে দেয় আনি।"
চৈঃ ভাঃ।

"ডাকিনী শাকিনী হৈতে, শঙ্কা উপজিল চিতে
ডরে নাম থুইল নিমাই।" চৈঃ চঃ।

আমোদ প্রমোদের মধ্যে মঙ্গলচণ্ডী, হরির গীতাদি শ্রবণ, ঢোল ঢক্কাদির বাদ্য শ্রবণ, কুস্তি মালামো করা প্রধান ছিল। বিবাহ, শ্রাদ্ধ, অন্নপ্রাশনাদি নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মের প্রথা এক্ষণেও যেরূপ তখনও সেই রূপ ছিল। শ্রীগৌরাঙ্গের অন্নপ্রাশন, উপবীত ধারণ ও বিবাহের যে বর্ণনা আছে, তাহা এক্ষণকার ব্রাহ্মণ বালকের তত্তদনুষ্ঠানের সহিত কোন অংশে বিভিন্ন বোধ হয়

না। বাহুল্য ভয়ে সে সকলের কোন প্রমাণ উদ্ধার করা গেল না।

শিক্ষা সম্বন্ধে তখনকার তুলনায় এক্ষণে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে বলিতে হইবে। তখন সাধারণ লোকের কোন শিক্ষা হইত না। ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যাঁহারা শাস্ত্র ব্যবসা করিতেন, তাঁহারা ভিন্ন অপরে ভালরূপ সংস্কৃত শিখিতেন না। সাধারণ ভদ্রলোকে আপন আপন বালকদিগকে প্রথমে পাঠশালায় ও পরে মৌলবীর নিকট উর্দ্ধপার্শী শিক্ষা দিতেন। তখন বাঙ্গলা ভাষায় কোন পুস্তকাদি ছিল না। ঐ রূপ পুস্তকাদি রচনা করা চৈতন্যের সময়েই প্রবর্ত্তন হইয়াছিল। সুতরাং তখনকার লোক কেহই মাতৃভাষায় সুশিক্ষিত হইতে পারিতেন না। চলিত কথাবার্ত্তা ও পত্রাদি লেখা বাঙ্গালাতে হইত বটে, কিন্তু তাহাকে শিক্ষা বলা যায় না। এক্ষনকার মত তখনও বিদ্যারম্ভের দিন হাতে খড়ি দেওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল; এবং ফলা বানানাদি বঙ্গ ভাষার মূল শিক্ষাও দেওয়া হইত।

"শুভ দিনে শুভক্ষণে মিশ্র সুন্দর
হাতে খড়ি পুত্রের দিলেন বিপ্রবর॥
দিন দুই তিনে শিখিলেন বার ফলা।
নিরন্তর লেখেন কৃষ্ণের নাম মালা॥
চৈঃ চঃ।

যাঁহারা শাস্ত্র ব্যবসায়ী হইতেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ ধর্ম্ম শাস্ত্র, কেহ দর্শন শাস্ত্র, কেহ বেদ বেদান্তাদি আপন আপন রুচি ও সুবিধা অনুযায়ী শিক্ষা করিতেন। স্ত্রী শিক্ষার প্রথা তখন আদৌ চলিত ছিল না। চৈতন্যের সময়েই যে স্ত্রীশিক্ষার দ্বার প্রথম উদ্ঘাটিত হয়, তাহা একরূপে বলা যাইতে পারে। ব্রাহ্মণেরা শূদ্র ও স্ত্রীদিগকে ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে একেবারে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিলেন; যখন চৈতন্যদেব ঐ প্রথার বিরুদ্ধে হস্তোত্তলন করিয়া আচণ্ডাল সকলেই হরিনামের অধিকারী, এই উদার মত প্রচার করিলেন, সেই দিন হইতেই বঙ্গীয় মহিলা ধর্ম্ম শাস্ত্র পাঠে অধিকার লাভ করিলেন। এবং শিখি মাইতির ভগিনী ও করমাবাই প্রভৃতি অনেক অনেক ভদ্র মহিলা উত্তর কালে বিদ্যাবতী রমণী বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

মুসলমানদিগের আমল দারীর কাল হইতে এদেশে অবরোধ প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। চৈতন্য দেবের সময়েও বঙ্গীয় মহিলাগণ অবরোধে অবরুদ্ধা ছিল। সেই জন্যই আমরা দেখিতে পাই যে অদ্বৈত পত্নী "বস্ত্রগুপ্ত-দোলা" আরোহণে জগন্নাথ মিশ্রের বাটীতে আসিয়া ছিলেন। তখনকার কুলকামিনীগণ কিরূপে কাল যাপন করিতেন ও তাঁহাদের পতিভক্তি ও গুরুজনের প্রতি ভক্তি কি রূপ ছিল তাহা পশ্চাদুদ্ধৃত আদর্শ চিত্র পাঠে বুঝা যাইতে পারিবে;

"একেশ্বরী লক্ষ্মীদেবী করেন রন্ধন;
তথাপিও পরম আনন্দ যুক্তমন।
উষাকাল হৈতে লক্ষ্মী যত গৃহকর্ম্ম
আপনে করেন সব এই তার ধর্ম্ম॥
দেব গৃহে করেন যত স্বস্তিকমণ্ডলী;
শঙ্খচক্র লিখেন হইয়া কুতুহলী।
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ সুবাসিত জল।
ঈশ্বর পূজার সজ্জা করেন সকল॥
নিরবধি তুলসীর করেন সেবন।
ততোধিক শচীর সেবনে তাঁর মন॥
কোন দিন লই লক্ষ্মী পতির চরণ
বসিয়া থাকেন পদযুগে অনুক্ষণ॥ চৈঃ ভাঃ

স্বভাব চরিত্রের বিষয় দেখিতে গেলে

বৈষ্ণবীয় গ্রন্থ হইতে আমরা এই নির্ব্বাচন করিতে পারি যে, তখনকার লোক অধিক সরল প্রকৃতি, সত্যপ্রিয় ও ধর্ম্মভীরু ছিল। এক্ষণে যেমন কপটতা, কলহপ্রিয়তা ও বঞ্চনার ভাব বৃদ্ধি হইয়াছে, তখন ততদূর ছিল না। প্রায় সকল লোকেই আপনার অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিত এবং শান্তভাবাবলম্বনে, কাল যাপন করিতে ভালবাসিত। বিলাস পরায়ণতা তখন বঙ্গসমাজকে এখনকার ন্যায় কলুষিত করে নাই। যাঁহারা ধনী ও সম্ভ্রান্ত ছিলেন, তাঁহারা যে একবারেই বিলাসী ছিলেন না এরূপ নহে, তবে তখনকার বিলাসে আর এক্ষণকার বিলাসে প্রকৃতিগত অনেক বিভিন্নতা আছে। আর এক্ষণে যেমন সমাজ শুদ্ধ সকলেই বিলাসী, তখন সেরূপ ছিল না। তখনকার বিলাসিতার চিত্র দেখিলেই, পাঠক ইহার মীমাংসা আপনা আপনি করিতে পারিবেন।

"দিব্য খট্টা হিঙ্গুলে পিতলে শোভা করে;
দিব্য তিন চন্দ্রাতপ তাহার উপরে।
তঁহি দিব্য শয্যা শোভে অতি সূক্ষ্মাকাশে;
পট্টনেতে বালিস শোভয়ে চারিপাশে।
বড় ঝারি ছোটঝারি গুটি পাঁচ সাতে।
দিব্য পিতলের বাটা; পাকা পান তাতে।
দিব্য আলবাটী দুই শোভে দুই পাশে।

*   *   *

দিব্য ময়ূরের পাখা লই দুই জনে;
বাতাস করিতে আছে দেখে সর্ব্বক্ষণে।
কি কহিব সেবা কেশভারের সংস্কার।
দিব্যগন্ধ আমলকি বহি নাই আর।
সমুখে বিচিত্র এক দোলা সাহেবানা;
বিষয়ীর প্রায় যেন সকল শোভনা।" চৈঃ ভাঃ

ইহা অতি উচ্চবংশীয় ধনীর আসবাব। সুতরাং সাধারণ লোকের নওয়াজিমা কিরূপ ছিল, তাহা অনায়াসেই অনুমান করা যাইতে পারে।

হিন্দু জাতি স্বভাবতই অতিথি প্রিয়। এখন হইতে সেকালের লোক অধিক পরিমাণে আতিথ্য করিত। চৈতন্যের সময়ে অতিথি সৎকার গৃহস্থের পক্ষে অবশ্য করণীয় ছিল; না করিলে মহা প্রত্যবায় হইত। বৈষ্ণবদিগের মধ্যেও এই ধর্ম্মের প্রতি বিশেষ অনুরাগ দেখা যায়; তখনকার অতিথি সেবার এই মূল মন্ত্র ছিল।

"অকৈতবে চিত্ত সুখে যার যেন শক্তি;
তাহা করিলেই বলি অতিথিরে ভক্তি।"
চৈঃ ভাঃ

পক্ষান্তরে মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, জাল জুয়াচুরি, ব্যভিচার সমাজ মধ্যে বহু পরিমাণে সংঘটিত হইত, সন্দেহ নাই। তাহা না থাকিলে আর জগাই মাধাই, চাপাল গোপালের উপাখ্যান বিবৃত হইবে কেন? তবে তখন এই সকল পাপাচারীর প্রতি সামাজিক দণ্ড প্রয়োগ করা হইত এবং শাস্ত্রমত প্রায়শ্চিত্তাদি করিলেই, সে সকল পাপ হইতে মুক্তি দেওয়া হইত। এক্ষণে সমাজ বন্ধন ও ধর্ম্মবন্ধন কিছু শিথিল হইয়াছে, এইমাত্র প্রভেদ; তাহা ছাড়া সেকাল ও একালে এরূপ পাপ সম্বন্ধে যে বিশেষ কিছু বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে তাহা বোধ হয় না।

যে সকল ভীষণ পাপের স্রোত বঙ্গ সমাজের অন্তস্তরে স্তরে এক্ষণেও প্রবাহিত হইতেছে, চারিশত বৎসর পূর্ব্বেও সেইরূপ হইতেছিল। কেবল চৈতন্য হৃদয়ের প্রবলতর প্রেমভক্তির তরঙ্গে কিছুকালের জন্য ঐ সকল দুর্গন্ধময় আবর্জ্জনা কতক পরিমাণে বিধৌত হইয়াছিল মাত্র।

কিন্তু অচির কাল মধ্যেই তাঁহার ধর্ম্ম লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া মলিন ও কলঙ্কিত হইল। তখন ঐ সকল পাপরাশি পুনরায় এই দুর্ভাগ্য সমাজকে পঙ্গপালের ন্যায় সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। পুনরায় যুগধর্ম্মের প্রচণ্ড অগ্নিশিখা ব্যতিত তাহা নির্ম্মূলিত হইবার নহে। তাই বঙ্গবাসী! আবার কি সেই যুগধর্ম্ম আসিয়াছে? বিশ্বাসচক্ষু উন্মীলন কর দেখিতে পাইবে।

শ্রীজগদীশ্বর গুপ্ত।

একতা।

(দ্বিতীয় প্রস্তাব)

আমরা পূর্ব্ব প্রস্তাবে, হিন্দুত্বের যাহা কিছু সার আছে, তাহা সংগ্রহ করিয়া হিন্দু সমাজ দৃঢ়ীভূত করাকেই জাতীয় একতা সাধনের একটী উপায় স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছি। ধর্ম্ম দ্বারা যে অখণ্ড একতা সিদ্ধ হইতে পারে, তাহা প্রশস্ত নীতি হইলেও আমরা তাহা ত্যাগ করিয়া জাতীয় একতা রূপ সঙ্কীর্ণ নীতির অবতারণা করিতে কেন প্রস্তুত হইয়াছি, তাহা অনেকের জিজ্ঞাস্য হইতে পারে। তদুত্তরে যাহা বলা আবশ্যক আমরা ক্রমে বলিয়া যাইতেছি।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সার্ব্বভৌম একতা হইতে সমাজের কেন্দ্র স্বরূপ গৃহস্থাশ্রমে পৌছিতে ক্রমান্বয়ে জাতীয়, সামাজিক ও পারিবারিক একতার প্রয়োজন। বুদ্ধদেব গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া একবারে সার্ব্বভৌম একতায় যোগ দিয়াছিলেন। চৈতন্যদেবও তাহাই। কিন্তু আমরা সন্যাসী নহি গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়াই একতা সিদ্ধ করিতে চাই। একতার উদ্দেশ্য আছে, তাহা কেবল নিবৃত্তির জন্য নহে, প্রবৃত্তিরও উদ্দীপক হইবে, এরূপ আশা করিয়া থাকি। এ বড় উৎকট সমস্যা। আপনার অস্তিত্ব ও স্বার্থ ভুলিতে পারিলেই অন্যের সহিত একীভূত হওয়া যায়। প্রবৃত্তির লোপ অথবা নিবৃত্তির দ্বারা আপনার স্বার্থ ভুলিতে পারা যায়। কিন্তু আপনার স্বার্থ ভুলিলেই যে অন্যের স্বার্থে স্বার্থ বোধ হইবে, তাহার সম্ভাবনা কি? যোগী ব্যক্তি সংসার সংস্রব শূন্য হইয়া যোগে বসিলে তাঁহার দ্বারা সংসারী ব্যক্তির কোন উপকারের সম্ভাবনা নাই। বস্তুতঃ, সংসারের উপকার ও অন্যের হিত সাধন করিতে হইলে, আমাদের প্রবৃত্তির প্রয়োজন; প্রবৃত্তি ব্যতীত কার্য্যের উৎপত্তি হয় না। কার্য্য নহিলেই বা উপকার কোথায়? সেই জন্যই বলি যে স্বার্থ ধ্বংস করাই যে একতা সিদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয়, সে একতা আমরা চাইনা; দশ জনে মিলিতে চাই, ঐক্য সাধন করিতে চাই, কেবল আমাদের স্বার্থের নির্ব্বিরোধ সম্পাদন জন্য। কেন না, স্বার্থের নির্ব্বিরোধেই আমাদের দুঃখ হ্রাস, অভাব পূরণ ও সুখ সাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা। মনুষ্যের জ্ঞানোন্নতি দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। আমরা এ তথ্য এখন বুঝিয়াছি, কিন্তু কার্য্যে পরিণত করিতে পারিতেছিনা। তজ্জন্য যাহার প্রয়োজন, তাহার নামই প্রেম। প্রেমে প্রবৃত্তি ধ্বংস হয় না, বৃদ্ধি করে। ইহা মুক্তি নহে, বন্ধন।

এখন বিবেচনা করা যাউক, এই বন্ধন দ্বারা কি প্রকারে একতা সিদ্ধ হইতে পারে। আমরা জ্ঞানের লক্ষ্যকে সত্য বলিয়া থাকি। সত্য আবিষ্কার এবং সত্য নির্ণয় করাই জ্ঞান লাভের প্রথম উদ্দেশ্য। সত্য স্থিরীকৃত হইলে তদ্দ্বারা জ্ঞানের অন্যান্য উদ্দেশ্য সফল হইয়া থাকে। প্রেমের ঐ প্রকার একটী স্থির লক্ষ্য আছে। মিলনই সেই লক্ষ্য। যেখানে প্রেম আছে, সেখানেই মিলনের আকাঙ্ক্ষা। মিলন সুসাধ্য হইলেই একতা সাধনের উপায় বিহিত হয়।

আদৌ আমাদিগের মধ্যে পারিবারিক একতা এই প্রকারে সিদ্ধ হইয়াছিল। স্ত্রীহৃদয়ই মনুষ্য প্রেমের প্রধান আধার, এই নিমিত্তই মনুষ্যে মনুষ্যে প্রথম মিলন স্ত্রী-পুরুষে। এই মিলনই গৃহাস্থাশ্রমের এবং পারিবারিক ধর্ম্মের উৎপাদক, এবং সেই জন্যই খ্রীষ্টানেরা বলিয়া থাকেন, Charity begins at home, অর্থাৎ সমুদায় দয়া ধর্ম্মের মূলই গৃহাশ্রম। ত্যাগ স্বীকার এখান হইতেই আরম্ভ হইয়া থাকে। কি শরীর ও কি মন, আর কি সম্পত্তি ও কি ধন, সকল বিষয়েই পরিবারের জন্য আমরা ক্ষতি স্বীকার করিতে সহজে প্রবৃত্ত হইয়া থাকি। এই প্রবৃত্তির মূলই নারীপ্রেম, নারীপ্রেম হইতেই বাৎসল্য ও দয়া মায়ার উৎপত্তি। সমুদায় হিংসা প্রবৃত্তি ও কঠোর স্বার্থপরতা নাশের প্রথম ও আদিম উপায়ই এই। ইহা যিনি অস্বীকার করিবেন, তিনি মনুষ্যত্বও অস্বীকার করিতে পারেন। কিন্তু কোন বিষয়েরই আতিশয্য শুভদায়ক নহে। নারীপ্রেম ভববন্ধনের ও পারিবারিক একতা সাধনের মূল হইলেও কেবল তাহাতেই মানবহৃদয়ের মাহাত্ম্য প্রকাশ পায় না। নারীপ্রেমই মনুষ্যের হৃদয়দ্বার উন্মোচনের প্রথম উপায় বটে, কিন্তু তাহাতেই হৃদয় আবদ্ধ হইয়া থাকিলে, সে হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা অবশ্য অনুভূত হয়। হৃদয়-মণ্ডপের প্রধান দুর্গোৎসবই রমণীপ্রেম লইয়া; কিন্তু হৃদয়পুত্তলি বিসর্জ্জন দিবারও সময় আছে। প্রকৃতি সে সময় নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন। তখন একটী পুত্তলিকার পরিবর্ত্তে হৃদয়ে অনেক পুত্তলিকা প্রবেশ করে, যথা পুত্র কন্যা আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব ইত্যাদি। এইরূপে হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা দূর হইয়া ক্রমে বিস্তৃতি উৎপন্ন হয়। সেই বিস্তৃতির প্রথম ফল সামাজিক একতা। তদ্দ্বারা কেবল স্বীয় পরিবারের সুখ সাচ্ছন্দ্য নহে, আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব ও স্বদেশবাসীর সুখ সাচ্ছন্দ্যও আমাদের মনোযোগের বিষয় হইয়া থাকে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সমস্ত মানবজাতির সুখসাচ্ছন্দ্যই আমাদিগের ভাবনার বিষয় হয়। সেইরূপ ভাবনার আধুনিক সাক্ষী জনষ্টুয়ার্ট মিল, বেন্থাম, স্পেন্সার, ম্যালথস প্রভৃতি। কেবল স্বজাতির জন্যই ইহাদিগের মস্তিষ্ক পীড়িত হয় নাই, সমগ্র মানবজাতির নিমিত্তই ইহারা ভাবিয়াছেন। তাহার ফলেই সমাজতত্ব, হিতবাদ মত যৌন নির্ব্বাচন, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন ইত্যাদি মতের সৃষ্টি।

প্রেম হইতে মতের সৃষ্টি, একথা সহজে বুঝিয়া উঠা যায় না। বরং জ্ঞান হইতে মতের সৃষ্টি এ কথা অনেকে বিশ্বাস করিতে পারেন। নিউটন যে জ্ঞানের বলে মাধ্যাকর্ষণ স্থির করিয়াছিলেন, সে জ্ঞান সহসা অন্য নিরপেক্ষ জ্ঞান বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে। সেই জ্ঞানের ফলে মানবজাতির প্রকৃত উপকার সিদ্ধ হইয়া থাকিলেও

তাহার মূলে যে মনুষ্য-প্রেম ছিল, ইহা বুঝিয়া উঠা যায় না। নিউটন স্ত্রী পুত্র লইয়া তখনও বিব্রত ছিলেন না। স্ত্রীহারা তাঁহার হৃদয় কখনও আকৃষ্ট হইয়াছিল কি না, বলা যায় না। তথাপি তাঁহার কার্য্য দ্বারা যে ফল উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাতে কত গভীর মানব প্রেমের পরিচয় দেয়। তাঁহার প্রেম মনুষ্যে আবদ্ধ ছিল না, মনুষ্য জাতির সঙ্কীর্ণ সীমা অতিক্রম করিয়াও অগ্রসর হইয়াছিল, এবং প্রকৃতি রাজ্যের অন্তস্তলে প্রবেশ করিয়াছিল। কিসের জন্য তিনি কোন্ স্বার্থ সাধন জন্য লালায়িত হইয়া ছিলেন? যে জন্য লালায়িত হইয়াছিলেন তাহাতে কি তাঁহার আসক্তি ছিল না? যদি আসক্তি ছিল, তবে তদ্দ্বারা কি প্রেমের অস্তিত্বও অনুভূত হয় না? বস্তুতঃ এখানে জ্ঞান মাহাত্ম্য ও প্রেম মাহাত্ম্য উভয়ই একীভূত হইয়া গিয়াছে। ইহাই জ্ঞান ও প্রেমের পরিণয়। ফলও আশ্চর্য্য জনক। হৃদয় শূন্য জ্ঞান দ্বারা কখনই এরূপ কৃতার্থতা সিদ্ধ হইতে পারে না। হৃদয়শূন্য জ্ঞানের ফল সমগ্র মানবজাতি ভোগ করিতে পায় না। জ্ঞানের লক্ষ্য সত্য ও হৃদয়ের লক্ষ্য মিলন। কিন্তু সত্য ও মিলন কিসের জন্য? যাহাতে সমগ্র মানবজাতির উপকার এবং যদ্দ্বারা প্রাণী মাত্রই প্রীত হয়, তাহাই কি সত্য ও মিলনের উদ্দেশ্য নয়? এই উদ্দেশ্য বুঝাইবার জন্যই ঈশ্বরের মহিমা আমাদের দেশে বুদ্ধদেবে এবং পশ্চিম দেশে যিশু খ্রীষ্টে উদ্ভাসিত হইয়াছিল।

যাঁহারা জ্ঞান ও ধর্ম্মের পরিণয় সাধন করিতে পারেন, তাঁহারা মহাপুরুষ এবং ঈশ্বরের অবতার। তাঁহাদিগের দ্বারা সকল সমাজ ও সকল জাতিই সমান উপকৃত হয়। কিন্তু অখণ্ড একতা ঐ পর্য্যন্ত। খ্রীষ্টের প্রচারিত ধর্ম্মনীতি এবং বুদ্ধদেবের প্রচারিত সত্য, কোন হৃদয়বান্ লোকই অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। কিন্তু কোন গৃহাশ্রমী ব্যক্তিই সম্পূর্ণরূপে আপনাকে ভুলিয়া তাঁহাদের ন্যায় একত্ব সাধনে সক্ষম নহেন। সে শক্তি সকলের সম্ভবে না। সকলের সহিত পার্থক্য দেখাইয়া ধর্ম্মের মাহাত্ম্য পরিস্ফুট করিবার জন্যই তাঁহাদের আবির্ভাব হইয়াছিল। তাঁহারা মন প্রাণে সকলের সহিত এক হইলেও শক্তিতে সকল হইতে পৃথক ছিলেন। এই নিমিত্তই খ্রীষ্টানেরা যিশুখ্রীষ্টের অলৌকিকত্ব প্রমাণ জন্য এত চেষ্টা করিয়া থাকেন। বস্তুতঃও বুদ্ধ ও যিশুখ্রীষ্ট নরাকারে মনুষ্য সমাজে অবতীর্ণ হইয়া থাকিলেও তাঁহারা ঈশ্বরের অবতারের ন্যায় পূজিত। আমরা তাঁহাদিগের আদর্শ দেখিয়া দূর হইতে নমস্কার করিতে পারি, কিন্তু নিকটবর্ত্তী হওয়া আমাদিগের সাধ্যাতীত।

যাহা হউক, উক্ত উভয় আদর্শকে আমাদের অখণ্ড একতা শিক্ষা স্থলে রাখিয়া আমাদের সাংসারিক প্রয়োজনার্থ পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় একতা সাধনের উপায় বিচার করা আবশ্যক। সে সাধনের মূল মন্ত্রই মানবপ্রেম। মানবপ্রেম আছে বলিয়াই পারিবারিক একতা এখনও বর্ত্তমান আছে। এখনও বর্ত্তমান আছে, একথা এরূপ ভাবে বলিবার কারণ এই যে ক্রমে ক্রমে সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যেরূপ হৃদয়শূন্য জ্ঞানের প্রচার আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে যে এক সময়ে পারিবারিক একতা ভঙ্গ হইয়া মনুষ্যজাতি পুনর্ব্বার আদিম

অবস্থায় নিপতিত হইবে না, এরূপ ভরসা করা যায় না। ইয়ুরোপ ও আমেরিকার সভ্যতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই একথা হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। জ্ঞানবৃদ্ধির প্রভাবে মনুষ্য জড় প্রকৃতির উপর যতই শাসন বিস্তার করিতেছে, তাহার অন্তঃপ্রকৃতি শাসনের ক্ষমতা ততই কমিয়া আসিতেছে। ভোগ বিলাসই বাহ্য সম্পদ বৃদ্ধির একমাত্র সহচর, হৃদয়ের মাহাত্ম্য তাহার নিকটে অতি তুচ্ছ বিষয়। এই জন্ম কল্পনা ও প্রেমের ক্ষমতা ক্রমেই সকল সমাজে হ্রাস হইয়া, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ক্ষমতাই বাড়িতেছে। এ উভয়ের মিলন না হইলে পৃথিবী ত্বরায় মরুভূমিতে পরিণত হইবে। বোধ হয় সেই বিপদ নিবারণ জন্মই ত্বরায় আবার কোন মহাপুরুষের আবির্ভাব হওয়া সম্ভবপর। যে সময় নিউটন ইয়ুরোপ-খণ্ডে আলোক বিকীর্ণ করিয়াছিলেন সে সময় ইয়ুরোপের যে অবস্থাছিল এখন সে অবস্থা নাই। সকলেই বলে সভ্যতা ও জ্ঞানের বৃদ্ধি হইয়াছে, কিন্তু নিউটনের ন্যায় মহাপুরুষ আর দেখা গেল না। পাঠক ইহা দ্বারাই স্থির করুন, জ্ঞানজ্যোতিঃ নিউটনের সময়ে অধিক কি এখন অধিক। ইংলণ্ডের সে নিউটন নাই, সে সেক্সপিয়ার নাই, ভারতের সে গোতম নাই, কালীদাস নাই; তথাপি ইংলণ্ড বর্ত্তমান জ্ঞান গরিমার সৃষ্টিকায় পদক্ষেপ করিতেছেন না, আবার আমরাও দেখা দেখি বর্ত্তমান যুগকেই শ্রেষ্ঠ যুগ ভাবিতে শিখিয়াছি। বর্ত্তমান যুগাপেক্ষা পূর্ব্বযুগ জ্ঞান ও সভ্যতায় অধিক উন্নত ছিল, একথা বলিলে কোন উন্নতিশীল লোকেরই তাহা সহ্য হয় না। অহঙ্কারের ও সাধারণতঃ সমস্ত রিপুরই এইরূপ প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠিয়াছে। ইংরাজের কথা যাউক, আমরা যে আজ ইংরাজের পদদলিত দাসের জাতি, আমাদের কাছেও যদি বর্ত্তমান যুগাপেক্ষা অন্য কোন যুগের প্রশংসার কথা হয়, তবে তখনই বক্তাকে বাতুল মনে করি। অধঃপতন এতই বেগবান্ হইয়া দাঁড়াইয়াছে!

ইংরাজ আমাদিগের দেশে পশ্চাত্য সভ্যতা আনিয়াছেন। আমরা কৃতার্থ হইয়াছি। পূর্ব্ব পুরুষেরা অসভ্য ছিলেন, বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিতে জানিতেন না, খাদ্য নির্দ্ধারণ করিতে পারিতেন না, বায়ু সেবনের প্রয়োজন বুঝিতেন না, বস্ত্রাদি ব্যবহারের নিয়ম জানিতেন না, ইত্যাদি গার্হস্থ্য সকল বিষয়েই তাঁহারা ইয়ুরোপীয় জাতি অপেক্ষা অজ্ঞ ছিলেন। ইয়ুরোপীয় জ্ঞানালোকে এখন আমরা পদে পদে তাঁহাদিগের দোষ ধরিতে শিখিয়াছি। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এত দোষ ধরিয়া ও গুণের অনুকরণ করিয়া আমরা কি আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষাপেক্ষা কিঞ্চিন্মাত্রও অধিক সুখী হইতে পারিয়াছি? যিনি যত দূর পারেন, এক একবার বাল্যকালের কথা স্মরণ করিয়া দেখিবেন, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবেন, আমাদের পল্লী-সমাজ কি ছিল, আর এখন কি হইয়া উঠিয়াছে। একতা সাধন জন্য আমরা চাই মনুষ্যপ্রেম; কিন্তু দেখিতেছি, পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণে ও পাশ্চাত্য বিদ্যার প্রভাবে আমাদিগের সেই মনুষ্যপ্রেম ক্রমেই তিরোহিত হইয়া যাইতেছে। একান্নবর্ত্তী পরিবারের অস্তিত্ব ক্রমেই লোপ হইয়া আসিতেছে। কত লেখকই কত প্রকারে তাহার দোষ কীর্ত্তন করিতেছেন।

লোকের প্রবৃত্তি ও সময়ানুসারে ভিন্ন রূপ হইয়া উঠিয়াছে। সময়েই সকল পরিবর্ত্তন সংঘটন করায় সত্য, কিন্তু পরিবর্ত্তনে যে কেবলই নিরবচ্ছিন্ন হিত সিদ্ধ হইতেছে, ইহা বুঝিবার তাৎপর্য্য কি? ভাই ভগিতে, পিতা পুত্রে, মাতা কন্যায় এখন প্রায়ই অসদ্ভাব দেখা যায়। স্বচিন্তা ও স্বাবলম্বনের নীতি অনুকরণ করিতে যাইয়া আমরা সুন্দর পারিবারিক একতা হারাইতেছি। এখন সকলেরই স্ব স্ব প্রধান হইবার বাসনা কিন্তু তাহাতে একান্নবর্ত্তী পরিবারের যে দোষ মর্শ্মান হইয়াছিল, তাহার কিছুই প্রতীকার দেখা যাইতেছে না। দশজনে একত্র হইয়া থাকিলে যে স্বচিন্তা ও স্বাবলম্বন হয় না, তাহার অর্থ নাই। যাহারা সমাজের গলগ্রহ স্বরূপ তাহারা একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রণালী ধ্বংস হইলেও থাকিবে। কেবল লাভ এই যে এক দোষের প্রতিবিধান করিতে যাইয়া, অপর দোষের পথ প্রসারিত করা হইতেছে। ভদ্র পরিবারে স্ত্রীলোকেরা সকল সমাজেই গলগ্রহ স্বরূপ। এ অবস্থায় যদি কেহ আপন বৃদ্ধা মাতা, পীড়িত বা অন্য কারণে অকর্ম্মণ্য ভ্রাতা বা ভগিকে পরিত্যাগ করে, তাহার নৃশংসতা কি সমাজে উপেক্ষার বিষয় হইতে পারে?

আমরা পাশ্চাত্য জ্ঞানালোকে একতার সৌন্দর্য্য ও মাহাত্ম্য দেখিতে পাইতেছি। ইউরোপীয় ধর্ম্ম জ্ঞান হইতে মনুষ্যের ভ্রাতৃত্ব শিক্ষা করিতেছি এবং কাগজে লিখিয়া ও বক্তৃতা করিয়া একতার মাহাত্ম্য সকলকে বুঝাইতে যত্নবান হইতেছি? কিন্তু আমাদের এ সকল উদ্যমের ফল কি হইতেছে? ক্রমেই দেখিতে পাইতেছি যে, বিচ্ছেদ বাড়িতেছে। ঘরে ঘরে গৃহ বিচ্ছেদ ও আত্ম বিচ্ছেদ, পাড়ায় পাড়ায় সামাজিক বিচ্ছেদ, নগরে নগরে অসংখ্য বিচ্ছেদ। এত বিচ্ছেদে কি একতা থাকিতে পারে? আবার তাহাতে স্বচিন্তা ও স্বাবলম্বনের ছল পাইয়াছি, সুতরাং সেই ব্যপদেশে সমস্ত নিয়মের মস্তকে পদার্পণ করিয়া প্রত্যেকেই এক এক জন নিয়ন্তা হইয়া বসিয়াছি। কিন্তু এ দিকে দিন দিন স্বাস্থ্য হারাইতেছি, সচ্ছন্দতা হারাইতেছি। বিলাসের দ্রব্য অনেক পাইয়াছি বটে, কিন্তু বিলাসে ত স্বাস্থ্য রক্ষা হয় না সচ্ছন্দতাও বাড়ে না। ইহা প্রত্যেকেরই প্রত্যক্ষীভূত বিষয়। তথাপি বলিতে পারিবে না, যে, তোমার পূর্ব্ব পুরুষেরা তোমা অপেক্ষা অধিক সুখ ও সচ্ছন্দতা ভোগ করিতে পাইতেন; কেন না তাহা হইলে ব্রিটিস সভ্যতার ও পাশ্চাত্য জ্ঞানের অবমাননা করা হইবে। তাহা কোমল হৃদয় হিন্দুর প্রাণে কি প্রকারে সহ্য হইতে পারে? নৃশংস ও দুরাচার মুসলমানের স্বেচ্ছাচার শাসন প্রণালীর ফলেও আমাদের পূর্ব্ব পুরুষদিগের অধোগতি আমাদের ন্যায় হইয়াছিল না। প্রত্যেক বঙ্গবাসীই তাঁহার আপন আপন পিতামহকে স্মরণ করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন যে তাঁহারা মোটা ভাত ও মোটা কাপড়ে আমাদের অপেক্ষা কত সবলকায় ও সুস্থ শরীরে জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন। আর আমরা যে, শরীর সবল করিবার এবং স্বাস্থ্য রক্ষার এত প্রকৃষ্ট উপায় সমন্বিত হইয়াছি, তথাপি আমাদিগের স্বাস্থ্য নাই কেন? শরীর দুর্ব্বল হইতেছে কেন? এ সকল প্রশ্নের মীমাংসা করিতে যাওয়া কি বাতুলতার কার্য্য?

এখন, আমরা দেখিতে পাই, আমরাও দ্বিবিধ ভাবাপন্ন জীব। আমরাও সৃষ্টির দুই বিরুদ্ধ শক্তিদ্বারা চালিত। আমরা ধর্ম্মভাবের অনুগামীও বটে, বিরোধীও বটে। বুদ্ধদেব দেখিয়াছিলেন, সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হইতে না পারিলে ধর্ম্মভাব স্থির রাখা যায় না। তাঁহার নির্ব্বাণ মুক্তির তাৎপর্য্যই এই। দেহে ও মনে সকলের সহিত এক হওয়া নির্ব্বাণ মুক্তি ব্যতীত আর কিছুতেই ঘটিতে পারে না। এই একতাকেই সার্ব্বভৌম একতা বলা যায়। ইহাতে প্রাণীর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না, অস্তিত্বের লোপও হয় না। ইহাতে অন্যের অস্তিত্বের সহিত আপন অস্তিত্ব এক ভাবাপন্ন হয়। এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইলে অন্যের জন্য জীবন বিসর্জ্জন কিছুমাত্র কষ্টদায়ক বোধ হয় না। মানবজাতির ধর্ম্ম শিক্ষা ও ঈশ্বরের মাহাত্ম্য প্রচার জন্য এইরূপে যুগযুগান্তে এক এক জন মহাপুরুষ এক এক দেশে প্রাদুর্ভূত হইয়া এক এক প্রকার পদচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন। জ্ঞান গরিমায় সত্য ভক্তি বিচলিত হওয়ায় এই সকল পদচিহ্ন ক্রমে দুর্লক্ষ্য হইয়া উঠিয়াছে। এই জন্যই মনে হয়, যদি ত্বরায় মহাপ্রলয় না হয়, তাহা হইলে মানবের শিক্ষার জন্য পুনর্ব্বার কোন মহাপুরুষ প্রাদুর্ভূত হওয়া সম্ভব। ঈশ্বর সর্ব্বভূতে সকল সময়ে সমান বর্ত্তমান হইলেও আমরা তাঁহারই ইচ্ছায় তাঁহাকে সকল সময়ে দেখিতে পাই না, দেখিলেও বুঝিতে পারি না, বুঝিলেও ধারণা ঠিক রাখিতে পারি না। সেই জন্যই মহাদেব আপন ইচ্ছা ক্রমে মহাপুরুষ রূপে অবতীর্ণ হইয়া কিছু সময়ের জন্য আমাদিগকে চকিত, স্তম্ভিত, ও ধর্ম্মাধীন করিয়া রাখিয়া আবার অন্তর্হিত হইয়া থাকেন। তাঁহার ক্রিয়াই এইরূপ। তিনি উন্নতি হইতে অবনতি, এবং অবনতি হইতে উন্নতি উভয়ই সিদ্ধ করিয়া থাকেন। যাহারা বলেন জগতে কেবলই উন্নতি হইতেছে, তাঁহাদের মত অভ্রান্ত নহে। বস্তুতঃ আলোক হইতেই আঁধার এবং আঁধার হইতেই আবার আলোকের সৃষ্টি হইয়া থাকে। এই প্রকারে অস্তিত্ব হইতে নাস্তিত্ব এবং নাস্তিত্ব হইতে অস্তিত্বের নবজন্ম হয়।

বস্তুতঃ যেমন একত্ব হইতে দ্বিত্ব, ত্রিত্ব প্রভৃতি অসংখ্যত্বের উৎপত্তি, সেইরূপ অসংখ্যত্ব হইতে আবার একত্বের অভ্যুদয় হইয়া থাকে। মানব সমাজে এই প্রকার একতা ও ভিন্নতা চিরদিনই বর্ত্তমান থাকিবে, ইহা নিবারণের কোন উপায়ই সাধারণ মনুষ্যের আয়ত্তাধীন নহে। মনুষ্য মাত্রেই মনুষ্যের ভ্রাতৃবৎ হইলেও মনুষ্য মাত্রেই মনুষ্যের শত্রু; তাহা না হইলে মানব বুদ্ধির এত কুটিলতা ও কপটতা কেন? সভ্যতা কি প্রকারান্তরে এই কুটিলতা ও কপটতার বৃদ্ধি করিতেছে না? অথচ আমরা সকলেই মনের প্রকৃত ভাব গোপন করিয়া স্বার্থসাধনে সদা বিব্রত। মুখে উত্তম বাগ্বিন্যাস ও লেখনীতে উত্তম লিপি কৌশলের পরিচয় প্রদান যত সহজ, বস্তুতঃ সত্যানুসরণ তত সহজ নহে। আবার একতার মাহাত্ম্য বুদ্ধিতে গ্রহণ করা যত সহজ, কার্য্যত প্রকাশ করা তত সহজ নহে। আপনার স্থির সময়ে অন্যকে সহোদর বৎ জ্ঞান করিতে পারি, কিন্তু যে সময়ে প্রকৃতি প্রতিবাদী হন, অর্থাৎ রিপুর প্রাবল্য উপস্থিত হয়, তখন আর আমাদিগের সে জ্ঞান থাকে না। তখন অন্যের কথা দূরে থাকুক,

আপনার সহোদরকেও শত্রুবৎ জ্ঞান হইয়া থাকে। ইহা কি আমাদিগের জীবনের প্রতিদিনের ঘটনা নহে? অথচ আমরা ইহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি, কেন না আমরা সভ্য হইয়াছি। সভ্যতার গুণে সৌভ্রাত্রে জলাঞ্জলি দিয়া থাকিলেও, আমরা সকলের ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধ বুঝিয়াছি ও তাহা প্রতিপালন করিতেছি এ অভিমান করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত নহি।

সেই জন্যই বলি এ কপটতা কেন? যদি একতার প্রয়োজন থাকে, তবে সর্ব্বত্রে কপটতার বিনাশ ও সরলতার আবির্ভাব সাধন আবশ্যক। সরলতা ব্যতীত সত্যানুরাগ থাকিতে পারে না, সত্যানুরাগ ব্যতীত প্রেম ও জ্ঞানের মিলন অসম্ভব। সরল হওয়া আবশ্যক, এজন্য আমাদের প্রথমেই দেখা উচিত, আমাদের পারিবারিক একতা প্রাচীন সমাজে কতদূর সিদ্ধ হইয়াছিল, এবং আমরাই বা এখন তাহার কত দূর উন্নতি করিয়া তুলিয়াছি। প্রায় সকলেই জানেন, ভারতবর্ষ বিশেষতঃ বঙ্গদেশ একান্নবর্ত্তী পরিবারের জন্য বিখ্যাত। এই একান্নবর্ত্তী পরিবারের উৎপত্তির মূলই সৌহৃদ্য ও স্নেহ মমতা। এই জন্যই গৃহ বাঙ্গালীর পক্ষে অতি প্রিয় পদার্থ। সহস্র কষ্ট উপস্থিত হইলেও বাঙ্গালীর গৃহত্যাগের প্রবৃত্তি জন্মে না। গৃহই বাঙ্গালীর ইহজীবনের স্বর্গ স্বরূপ। যত দিন পরিবারের মধ্যে সরলতা ও কর্ত্তার দৃষ্টি সকলের প্রতি সমান ছিল, তত দিন এই পারিবারিক একতা যথার্থই স্বর্গ স্বরূপ ছিল। কর্ত্তার পদস্খলনের সঙ্গে সঙ্গেই এরূপ একতা নানা অসন্তোষের মূলীভূত হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং আর একতা নাই। কর্ত্তার এরূপ পদস্খলনের প্রধান কারণ দেশে শাসনপ্রণালীর পরিবর্ত্তন ও বিজাতীয় ভাব সংযোগে আত্মসংযম ও সরলতার অভাব। শাসনপ্রণালী পরিবর্ত্তনের ফলে, দেশের স্বচ্ছলতা দূর হওয়ায়, লোকের নানাপ্রকার অভাব-পীড়ার উৎপত্তি এবং বিলাসের আবির্ভাব হওয়ায় নানাপ্রকার কাল্পনিক অভাবের সৃষ্টি ও তদ্ধেতু স্বার্থপরতার বৃদ্ধি হইয়াছে। এই কারণেই আমাদিগের পারিবারিক কর্ত্তারা আর এখন ঠিক থাকিতে পারেন না। ইহার উপর আবার ধর্ম্মভাবের পরিবর্ত্তন দ্বারা সামাজিক বন্ধন শিথিল হওয়ায় পারিবারিক একতায় ও বিশেষ অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছে। সুতরাং একান্নবর্ত্তী পরিবারের প্রণালী যাহা বহু কাল হইতে নির্ব্বিবাদে চলিয়া আসিতেছিল, তাহা আর এখন চলিতে পারে না, স্থিরীকৃত হইয়াছে। পারিবারিক একতা ভঙ্গ হইয়াছে, ক্রমে দম্পতি মিলনও ভঙ্গ হইতে পারে। কেন না, স্ত্রী পুরুষ এতদুভয়ের মধ্যে কে কাহার অধীন থাকিবে, যখন এ প্রশ্নের উদয় হইবে, তখন উভয়ে পৃথক হওয়া সম্ভব। স্বাধীন মত দ্বারা ও এ প্রকার বিচ্ছেদ ঘটনা হইতে পারে। জ্ঞানের উত্তরোত্তর উন্নতিতে মত পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী, সুতরাং যতই মতভেদ, ততই গৃহ বিচ্ছেদ। ক্রমে মনুষ্যজাতি আবার আদিম অসভ্যাবস্থার ন্যায় স্ত্রীপুরুষ উভয়েই যাহার যে দিকে ইচ্ছা সে সেই দিকে বিচরণ করিতে থাকিবে। ইচ্ছা হয় স্ত্রী স্বামীর সহিত একত্র বাস করিবে, না হয় অন্যের সহিত মিলিত হইবে, অথবা একাকিনী কালযাপন করিবে। কোন বন্ধনই আর মনুষ্যকে পরস্পর স্থায়ীরূপে বাঁধিয়া রাখিতে পারিবে

না। এইরূপে পারিবারিক একতার চরমোৎকর্ষ কোথায় যাইয়া দাঁড়াইবে আমেরিকা ও ইয়ুরোপের সমাজপতি পরীক্ষা করিলে তাহা কতক কতক বুঝা যায়। বস্তুতঃ প্রেমশূন্য জ্ঞান প্রভাবে আমাদিগকে ক্রমেই এই বিচ্ছেদের পথে লইয়া যাইবে, সন্দেহ নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় আমরা যে, দিন দিনই বর্তমান সভ্যতার প্রভাবে আত্মশাসনের ক্ষমতা হারাইতেছি, ভ্রমক্রমেও কাহারও তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত হইতেছে না।

পারিবারিক একতা এইরূপেত শেষ হইয়া আসিতেছে। ক্রমে আমরা প্রত্যেকেই, কি স্ত্রী, কি পুরুষ, সকলেই সংসার-সমাজের এক একটী পৃথক্ একক স্বরূপ হইয়া মানব-মহত্ব প্রকাশ করিতে থাকিব, তাহার সূচনা হইয়া উঠিতেছে। পারিবারিক একতা ভাঙ্গিয়া এই সকল একক লইয়া আমাদের সামাজিক একতার বিচার করিতে হইবে। সমাজ কি জন্য? পরস্পরের ব্যক্তিগত বিরোধ মিটাইবার জন্য না বাড়াইবার জন্য? এত কাল আমাদের পারিবারিক একতা ছিল, সামাজিক একতাও ছিল, কেন না পরিবার শাসনের জন্য আত্মসংযমী কর্ত্তা ছিল ও সমাজ শাসনের জন্য শাস্ত্র ছিল। শাস্ত্রে যুক্তি ও বিবেচনার অনেক ভুল থাকিতে পারে, কিন্তু তথাপি তাহার মান্য ছিল; নিয়ম যতই ভ্রান্ত হউক না কেন, মান্য হইলেই তদ্দ্বারা একতা সিদ্ধ হয়। সুতরাং সামাজিক একতা সিদ্ধ হইয়াছিল। একতার উদ্দেশ্য কি? বোধ হয় সমাজের ও সে উদ্দেশ্য, একতার ও তাহাই। পরস্পরের ব্যক্তিগত বিরোধ দূর করিয়া সাচ্ছন্দ্যের নিমিত্ত এক নিয়মাধীন হওয়াই বোধ হয় সমাজের উদ্দেশ্য। সামাজিক একতা হইতেই জাতীয় একতার উৎপত্তি। এক দেশে এক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইলেই তাহা এক জাতি রূপে প্রতীয়মান হয়। এইরূপ এক জাতি অন্য জাতি হইতে পৃথক থাকে। কেননা দেশের জল বায়ু ও বাহ্য প্রকৃতি দ্বারা মানব প্রকৃতি গঠিত হয়, বিজ্ঞানের এই উক্তি যদি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে হয়, তাহা হইলে, পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানের জল বায়ুর পার্থক্য বিবেচনায়, জাতীয় পার্থক্য অবশ্যম্ভাবী স্বীকার করিতে হইবে।

এখন আমাদিগকে আর একটী তর্কে উপস্থিত হইতে হইতেছে। জাতীয় পার্থক্য প্রকৃতির নিয়মাধীন। যে নিয়মে ইংরেজেরা এতকাল ভারতে আসা যাওয়া করিয়াও অদ্যাপি আমেরিকা অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি স্থানের ন্যায় তথাকার স্থায়ী অধিবাসী রূপে পরিণত হইতে পারিতেছেন না, সে নিয়ম প্রকৃতির নিয়ম। জলবায়ু সহ্য করিতে না পারিলে ইংরাজেরা কখনও এখানকার অধিবাসী হইতে পারিবেন না। যদি হন, তবে আর ইংরেজ থাকিবেন না, আর এক প্রকৃতি লাভ করিতে হইবে, ইহা প্রকৃতির অব্যর্থ নিয়ম। ইংরেজ এখনও ভারতীয় প্রকৃতিকে সে প্রকার করিতে সমর্থ হন নাই, সুতরাং মুসলমানের ন্যায় ইংরেজ অদ্যাপি আমাদিগের দেশের সাধারণ অধিবাসীতে পরিণত হইতে পারেন নাই। সে ঘটনা আমাদের পক্ষে ভাল কি মন্দ, তাহার বিষয়ে প্রবৃত্ত না হইয়া আমরা রাজকীয় একতার বিষয় উত্থাপন করিতেছি।

এক সময়ে ভারতে সকল প্রকার এক

তাই ছিল। যন্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন অংশের ন্যায় সকল প্রকার একতার মধ্যেই সামঞ্জস্য ছিল। পারিবারিক, জাতীয় পর্য্যন্ত সকল প্রকার একতাই ভারতে বিদ্যমান ছিল। এই একতা বন্ধনের প্রধান রজ্জুই ধর্ম্মশাস্ত্র। ভারতবর্ষ প্রধানতঃ হিন্দুজাতি দ্বারা অধিবাসিত ও হিন্দুধর্ম্ম দ্বারা শাসিত হইয়াছিল, কিন্তু রাজকীয় শাসন একজনের অথবা এক সমিতির হস্তে ছিল না। ইহাতে অনেকেরই মনে হয় যে, ভারতে রাজকীয় একতা ছিল না। কিন্তু বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে ভারতে রাজকীয় একতা থাকাও প্রতিপন্ন হইতে পারে। ভিন্ন ভিন্ন রাজা ভিন্ন স্থানে রাজত্ব করিতেন, রাজ্য শাসন ও প্রজাপালন সম্বন্ধে সকলেই আপন আপন মন্ত্রীর উপদেশানুসারে কার্য্য করিতেন, কিন্তু শাস্ত্র কাহারই উপেক্ষণীয় ছিল না। সুতরাং সূক্ষ্ম বিষয়ে প্রণালীর প্রভেদ থাকিলেও স্থূল বিষয়ে একই নিয়ম ছিল। শাস্ত্রই হিন্দুজাতির সামাজিক আইন, শাস্ত্রই হিন্দু জাতির রাজকীয় আইন। রাজ্যে রাজার আইন যেমন খাটে, হিন্দু সমাজে ও রাজ্যে শাস্ত্রও তেমনি খাটিত। আইন মনুষ্য কৃত, সুতরাং সর্ব্বদাই ভ্রম ও দোষ যুক্ত; এই নিমিত্ত আইনের পরিবর্ত্তন সময়ে সময়ে আবশ্যক বোধ হইয়া থাকে। শাস্ত্র সম্বন্ধেও একই কথা। কিন্তু একেবারে আইন শূন্য শাসন অপেক্ষা, ভ্রম পূর্ণ আইন দ্বারাও শাসন কার্য্য অপেক্ষাকৃত সহনীয় ভাবে চলিয়া থাকে, আমাদের দেশে শাস্ত্র সকল ভ্রম পূর্ণ হইলেও তদ্দ্বারা প্রাচীন কালে সামাজিক শৃঙ্খলা সেই রূপ রক্ষিত হইত। দেশ শাসন জন্য সকল দেশেই আইন আছে, কিন্তু সমাজ শাসন জন্য হিন্দুর দেশ ছাড়া আর কোথাও যে কোন শাস্ত্রের আধিপত্য আছে, এমত কথা আমরা এ পর্য্যন্ত শুনিতে পাই নাই। দেশ শাসনের জন্য যেরূপ আইনের প্রয়োজন, সমাজ শাসনের জন্য সেই রূপ শাস্ত্রের প্রয়োজন আছে কি না, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই বিবেচ্য বিষয়। আমরা এখন বুঝিতে পারিতেছি যে, প্রাচীন ভারতে বহু সংখ্যক হিন্দু রাজা বর্ত্তমান থাকিলেও কেবল শাস্ত্রের প্রসাদাৎ দেশে রাজকীয় একতা যথেষ্ট রূপে বর্ত্তমান ছিল। যথেষ্ট রূপ কেন না সাধারণের সাচ্ছন্দ্য জন্য যত দূর একতার প্রয়োজন তাহা এক প্রকার ছিল। আবার সামাজিক ও পারিবারিক একতাও উহার বিরোধী ছিল না। বস্তুতঃ সর্ব্ব প্রকার একতার মধ্যেই একটা সামঞ্জস্য ছিল, তাহা প্রত্যেক ব্যক্তিরই কল্যাণের নিমিত্ত বলিতে হইবে।

এখন কথা এই যে, আমাদের দেশের পূর্ব্ব কাহিনী লইয়া আমরা যতই স্পর্দ্ধা করি না কেন, তাহাতে আমাদের বিশেষ কোন লাভ নাই। স্বদেশের প্রতি মমতা সকল লোকেরই স্বভাবতঃ হইয়া থাকে। যাহার হয় না, সে ব্যতিক্রম স্থল। আমরা এক্ষণে যত কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহা কেবল দেশ-ভক্তির পরিচয় দিবার উদ্দেশ্যে নহে। বস্তুতঃ যে দেশে পারিবারিক সামাজিক ও জাতীয় একতা পরস্পর সামঞ্জস্য লাভ করিয়া সাধারণ একতার প্রয়োজন সাধন করিতে উপযুক্ত না হইয়াছে সে দেশ অদ্যাপি সভ্যতার উচ্চ সোপানে আরোহন করিতে পারে নাই, ইহা আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস। যে সভ্যতা

মনুষ্যকে বিলাসী করে, কিন্তু সাচ্ছন্দ্য দেয় না, গর্ব্বিত করে, কিন্তু বিনয় শিখায় না, স্বাধীন করে, কিন্তু নিয়ম রাখে না, অভাব জন্মায়, কিন্তু পূরণ করে না ; যাহাতে পূর্ত্তি আছে, তৃপ্তি নাই, সুখ আছে স্বস্তি নাই, বিশ্বাস আছে, ভক্তি নাই, সে সভ্যতা যতই বিজ্ঞান গর্ব্বিত হউক না না কেন, তাহাতে মনুষ্যজাতির স্থায়ী উপকার সিদ্ধ হয় না। আমাদের দেশে এক্ষণে ইয়ুরোপীয় সভ্যতা এই প্রকার অপ্রার্থনীয় হইয়া উঠিয়াছে। ইয়ুরোপীয় বিজ্ঞানে যাহাদিগের সমধিক আদর ও ভক্তি আছে, তাঁহারাও অদ্যাপি ইহার সম্যক আলোচনা করিতেছেন না। বস্তুতঃ আমরা সুবিজ্ঞ বাকল সাহেবের প্রণীত সভ্যতার ইতিহাস পাঠ করিয়াও কি বলিব না যে, আমাদের দেশে ইয়ুরোপীয় সভ্যতা আনার চেষ্টা সম্পূর্ণ অন্যায়। দেশীয় প্রকৃতি, আমাদের জাতীয় প্রকৃতি ইয়ুরোপীয় প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ রূপে গঠিত করিয়াছেন। এখানকার জল বায়ু ইয়ুরোপের জল বায়ু নহে। ইয়ুরোপের সভ্যতা এখানে চলিবে কেন? সেই জন্যই বলি যে, এক্ষণে আমাদিগের কিঞ্চিৎ স্থির হইয়া বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। ইয়ুরোপীয় সমাজের আদর্শ দেখিয়া আমাদের নব্যভারত বাসী যেরূপ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন, সে চাঞ্চল্য দূর করা একান্ত আবশ্যক। ইয়ুরোপীয় সমাজের রীতিনীতি আমাদিগের সমাজে কখনই খাটিতে পারে না। যিনি সে চেষ্টায় বদ্ধ পরিকর হন, তিনি নিতান্ত মূর্খ। আমরা বিজ্ঞানে পণ্ডিত না হইলেও সচ্ছন্দে তাঁহাকে মূর্খ বলিয়া স্বাভিমান প্রবল করিতে পারি।

আমরা জানি আমরা হিন্দু সন্তান। হিন্দুর বিলাস-প্রিয়তা অতি প্রধান দোষ। হিন্দু রাজত্বের প্রাদুর্ভাব কালে, হিন্দুশাস্ত্রের শাসনে এই বিলাস প্রিয়তা বিশেষ সংযমিত হইয়াছিল। প্রকৃতির রত্ন ভাণ্ডারে থাকিয়াও ভারতবাসী আত্মশাসন করিতে শিখিয়াছিল। বিষয় থাকিতেও নির্ব্বিষয়ী, সুখের সামগ্রী অসংখ্য বর্ত্তমান থাকিতেও তৎপ্রতি স্পৃহাশূন্য উদাসীন, এমন জাতি পৃথিবীর আর কুত্রাপি দৃষ্ট হইত না। এমন বিলাস বিরোধী জাতি, যে জাতির লোকে কিছু কাল পূর্ব্বে এক পরিধেয় ও উত্তরীয় লইয়াই সকল সভায় গমনাগমন করিতে লজ্জা বোধ করিতেন না, সেই সরল আত্মশাসনরত হিন্দুজাতির সন্তান আজ কি না পোষাক পরিচ্ছদে বহুরূপীর বেশ ধরিয়াছে! ইহা কি বস্তুতই দোষ নহে, বিলাস নহে? কেন এই গ্রীষ্ম প্রধান দেশে এত পরিচ্ছদ বাহুল্যের প্রয়োজন? শরীর উলঙ্গ থাকিলে লজ্জা বোধ হয়? এ শিক্ষা কে দিয়াছে? অবশ্যই বলিতে হইবে, শীত প্রধান দেশীয় ইংরাজজাতি। কিন্তু ইংরাজ জাতি যে জল বায়ুতে গঠন করিয়াছে, ভারতবাসী সে বায়ুর শাসনাধীন নহে। সুতরাং ভারতবাসীর সাচ্ছন্দ্যের জন্য পরিচ্ছদের বাহুল্য কোন অংশেই প্রয়োজনীয় নহে। তবে কেন এ রীতির অনুকরণ? যদি ধুতি চাদরে স্বাস্থ্য রক্ষা হয়, তবে তাহা ত্যাগ করিয়া কোট পেণ্টালুন, ইজার চাপকান, পিরান চোগার প্রয়োজন কি? তন্নিমিত্ত অর্থ ব্যয়ই বা কেন? ইহা কি বস্তুতঃ সাচ্ছন্দ্যের অন্তরায় নহে?

আবার খাদ্য বিষয়েও বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক। পৃথিবীর অন্য কোন দেশে

যাহার কল্পনাও কোন লোকের মনে কোন কালে উদিত হয় নাই, তাহা ভারতবাসীর জাতীয় গৌরবের বিষয়। ইহাতে আমরা দুঃখিত হইব কি না, ভাবিয়া স্থির করিতে পারি নাই। ফলতঃ তাহার প্রয়োজন ক্রমে উপলব্ধি করিতে পারিতেছি। আমরা যাহার কথা বলিতে উদ্যত হইয়াছি সে খাদ্য বিচার। অনেক খাদ্য সামগ্রী যাহা ভিন্ন২ জাতির সুখাদ্য,ভারতবাসীর তাহা অখাদ্য। খাদ্য বিষয়ে অন্য কোন দেশের কোন জাতিই এরূপ কঠোর নিয়মাধীন নহে। ইহাকে কি আমরা সভ্যতার হীনতা বলিব? কখনই না। কোন্ খাদ্যে মনুষ্যকে পশুভাব হইতে বিমুক্ত করিয়া দেবভাবের সমীপবর্ত্তী করে, তাহা হিন্দুরা যেরূপ নিরূপণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, বোধ হয়, পৃথিবীর অন্য কোন জাতিই সেরূপ পারে নাই। সে কথা প্রতিপন্ন করিতে হইলে এক খানি পৃথক্ গ্রন্থ লিখিতে হয়। ভরসা করি, আমাদের মধ্যে যিনি ক্ষমতাবান্ হন, তিনি সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া জাতীয় গৌরব সম্বর্দ্ধন করিবেন।

বস্তুতঃ বিদেশীয় জাতি সংস্রবে আসিয়া আমাদিগেরউন্নতি হইতেছে, ইহা যিনি মনে করেন, তাহার প্রকৃতি বুঝিতে আমরা অক্ষম। যে সময়ে আমরা রোগে শোকে অভাবে ও পীড়নে সদা জর্জ্জরিত, কেবল চুরি ডাকাইতি, নরবলি, সতীদাহ, গঙ্গায় পুত্র বিসর্জ্জন ইত্যাদি দুর্নীতির লোপ হইয়াছে, বলিয়া যদি সে সময়কে উন্নতির সময় বলিতে হয়, তবে অবনতির সময় কাহাকে বলিতে হইবে জানিনা। নরবলি, সতীদাহ, ইত্যাদি দ্বারা কত লোক ইহ জীবনের সুখ বিসর্জ্জন দিয়া ছিল, জানি না, কিন্তু বোধ হয়, ম্যালেরিয়া, ওলাউঠা, ডেঙ্গু, ব্লাক্ ফিভার ইত্যাদিতে যত লোক ইহ জীবনের সুখে জলাঞ্জলি দিতে বাধ্য হইয়াছে, তাহার সংখ্যা কোন মতেই ন্যূন নহে। আর যাহারা পরিবর্ত্তনের কালে মৃতবৎ ভাবে দুর্ব্বহ জীবন ভার কষ্টে সৃষ্টে বহন করিতেছে, তাহাদের সময় সংখ্যা কে গণনা করে।

যাহা হউক, আমরা পরিবর্ত্তনমাত্রকেই দূষণীয় বলিতেছি না। পরিবর্ত্তন ব্যতীত জীবন নির্ণীত হয় না। যে জাতির পরিবর্ত্তন নাই, সে জাতি সম্পূর্ণ নির্জীব সন্দেহ নাই। কিন্তু এই পরিবর্ত্তন দেশীয় রীত্যনুসারে হইলেই প্রকৃতি বিরোধের ফল প্রাপ্ত হয় না। বিদেশীয় সভ্যতার অনুকরণে আমরা পরিবর্ত্তন সংঘটন করিতে যাইয়া এই প্রকারে প্রকৃতি বিরোধের ফল প্রাপ্ত হইতেছি। আমাদের শরীরে বল নাই, মনে তেজ নাই স্বাতন্ত্র্য বোধ নাই, ধর্ম্মে ভক্তি নাই, প্রীতিতে সরলতা নাই, কেবল বিদেশীয় অনুকরণের দোষে। এই অযথা অনুকরণ ত্যাগ করিয়া যে অনুকরণে আমাদের প্রকৃতি বিরোধ উৎপন্ন ও স্বাভাবিক সরলতার লোপ না হয়, তাহার অনুসরণ করিলেই আমাদের উন্নতির সম্ভাবনা। সেই নিমিত্তই বলিয়াছি। হিন্দুদের যাহা কিছু সত্য আছে, তাহা সংগ্রহ করিয়া অগ্রে সমাজ দৃঢ়ীভূত করা হউক। সারগ্রাহীতা অভ্যাস সিদ্ধ হইয়া উঠিলে অসার বস্তু ত্যাগ সহজ ও সুসাধ্য হইয়া উঠিবে। তখন আমরা আমাদিগের আত্ম-মর্য্যাদা বুঝিতে পারিব। ইহা বলা বাহুল্য যে, আত্মমর্য্যাদা বোধ ব্যতীত কোন সুনীতি দৃঢ়রূপে জাতীয় চরিত্রে সংলগ্ন হইয়া থাকিতে

পারে না। একতা একটী প্রধান সুনীতি। এই সুনীতি জাতীয় ভাবে পরিচালিত হয়, ইহাই একান্ত বাঞ্ছনীয়। আর ইহাও বুঝিতে হইবে, জাতীয় বল, সার্ব্বভৌম একতা যাহা কেবল ধর্ম্ম দ্বারাই সিদ্ধ হইতে পারে, তাহার জন্য প্রয়োজনীয় না হইলেও, সামঞ্জস্য ও স্বাতন্ত্র্য এবং তন্নিবন্ধন সাচ্ছন্দ্য ও সচ্ছলতা রক্ষার পক্ষে একান্ত আবশ্যক।

শ্রীরামগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

অনন্ত তুষানল।

পীড়িতের আর্ত্তনাদ।

সংসার দুঃখময়। হাহাকার ঘরেঘরে, জলধারা চোখে চোখে, বৈরাগ্যের নিশ্বাস, বিরহের বেদনা, শোকের ক্রন্দন, রোগের যাতনা, শত্রুর অত্যাচার, দ্রোহীর অবিশ্বাস, প্রণয়ীর বিড়ম্বনা, হতাশের বিষাদ-আক্ষেপে সংসার জর জর। মাথার ঘাম ফুটিয়া পায়ে ঝরে, তবু উদর পুরে না। উষ্ণ শোণিত শীতল হয়, তবু অভাব মিলে না। কাল কেশ সাদা হয়, তবু পিয়াস মিটেনা। হা হতাশ, দীর্ঘশ্বাস, হৃদয় বেদনা নিত্য নিরন্তর, তবু লোকে বলে সংসার সুখের, আমার সোণার ঘর কন্না। এ রহস্যের অর্থ কি? সহস্র সহস্র বৎসর হইতে সহস্র সহস্র পণ্ডিত ও সাধুগণ, বিরাগী ও সন্ন্যাসীগণ, শাস্ত্রকার ও সমাজ-বেত্তা বলিয়া আসিলেন, সংসার অনিত্য, সংসার মায়া এখনি আছে, এখনি যাইবে, মায়ায় মুগ্ধ হইয়া, অনিত্য অসার পদার্থকে আমরা নিত্য সারাৎসার বলিয়া গণনা করিতেছি। কত লোক কত ভাবে কত কথায় আমাদিগকে বুঝাইল। আনন্দ কোলাহলের বাসরে সহসা "হরিবোল হরি" বলিয়া চিৎকার, আমার চমক ভাঙ্গিয়া ক্ষণকালের জন্য চৈতন্য জন্মাইল, স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় আবার ইচ্ছাপূর্ব্বক আমি গায়ের বস্ত্র টানিয়া নিদ্রা নিদ্রার আবেশে ঢলিয়া পড়িলাম। স্বপ্নই আমার ভাল লাগে, নিদ্রার অজ্ঞানতা, আমার বড় প্রিয়, চৈতন্য, আলোক, জ্ঞান, সুস্থতা আমাকে আকর্ষণ করে না। লোকে এত বুঝায়, তবু যাহা জড়, যাহা অনিত্য, যাহা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য, যাহা অন্ধকার, যাহা স্থূল আমি তাহাই ভালবাসি।

সংসার যে জন্য শোভনীয় বলিয়া লোকে আমাকে বুঝাইত, দেখিয়া ঠেকিয়া শিখিয়াছি, সে সকলই ভুল। যাহা পর্ব্বত বলিয়া ভিত্তি গাঁথিয়া সৌধ নির্ম্মাণ করিয়াছিলাম, চোরা বালির মত আমার বিশ্বাসের সেই ভিত্তি দিন দিন পলে পলে সরিয়া যাইতেছে, ঘর ফাটিয়া চুরিয়া গেল, তথাপি মেরামত করিয়া চক্ষু বুজাইয়া বিপদের কোলে মাথা দিয়া পতনোন্মুখ সেই গৃহে শুইয়া আছি। জীবনের শিক্ষা, সাধুর দৃষ্টান্ত, পণ্ডিতের বেদ সকলই আমাকে শিখাইয়া দেয়, সংসার অসার কণ্টক পূর্ণ, বেত্রাঘাতে পৃষ্ঠ ফাটিয়া গিয়াছে, আঘাত কত পীড়াদায়ক বুঝিয়াছি, তবু যেখানে আঘাত পাইব, সেই খানেই ছুটি, যেখানে যন্ত্রণা সেখানে মস্তক পাতিয়া দেই গরল দেখিলেই অমৃত বলিয়া পান করি, এ রহস্যের মর্ম্ম কি?

যাহা পর্ব্বতের ন্যায় দৃঢ় বলিয়া বুঝিয়াছিলাম, তাহা স্বপ্নের ন্যায় বায়ুতে মিশাইয়া

যাইতে, যাহা আলোকের ন্যায় উজ্জল দেখিয়াছিলাম, তাহা অন্ধ হইতে অন্ধতর অন্ধকারে পরিণত হইতেছে, যাহা বরমালা বলিয়া সোহাগ করিয়া গলায় পরিয়াছিলাম, তাহাই সর্প হইয়া বক্ষে দংশন করিতেছে, তথাপি সেই মালা আবার খুঁজিতেছি, সেই আলোক আবার চাহিতেছি, সেই স্বপ্নকে সত্য বলিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক ভ্রান্ত হইতেছি, এ স্বেচ্ছাকৃত ভ্রমের কারণ কি? অনিত্যকে নিত্য বলি কেন, অসুখকে সুখ বলি কেন, সাধ করিয়া কণ্টকে দেহ ছিন্ন করি কেন? মরিচিকাকে মরিচিকা বলিয়া বুঝিয়াও তাহার পিছনে দৌড়াই কেন? কে আমাকে বুঝাইবে?

মায়া মোহে কুৎসিত কুরূপকে, সুন্দর সুরূপ বলিয়া কল্পনা করিতেছি। শূন্য হইতে উৎপত্তি, শূন্যের উপাদানে গঠন, বায়ু-ভরে সেই আদিম শূন্যে পরিণত। আদরের পুত্র কন্যা শূন্যের সমষ্টি, প্রেমময়ী দয়িতা শূন্যের ছায়া, স্নেহময়ী ভূদেবী জননী জীবন শূন্য স্বপ্নের আবেশ, সাধ করিয়া যাহাকে কোলে লইয়া বসাইতেছি; সে পূতি-গন্ধময় শব মাত্র, যাহাকে বুকে পুরিয়া বুক জুড়াইতেছি, সেও নাই, আমিও নাই, বুকও নাই, জুড়ায়ও না কেহ, চিন্তা করিতে চক্ষু অবসন্ন হইয়া পড়ে, মস্তিষ্ক মুহ্যমান হয়। এই সুবাসিত সাধের বেল ফুল, এ নাকি ঘেঁটুফুল? এই বায়ু সেবিত, সজ্জিত, শীতল গৃহ, এ নাকি মরুস্থলী, আমার আশার পুত্র, ভরসার পুত্র, ভরসার ভাই, প্রাণময়ী প্রণয়িনী সকলকে দেখিতে দেখিতে ছাড়িতে হইবে, টানিয়া লইয়া যাইবে, হাত বাড়াইলে ধরিতে পারিব না, কল্পনা কল্পনায় মিশাইবে, শূন্য শূন্যে কাটিয়া যাইবে, বুঝিতেছি, দেখিতেছি, তবু কেমন বুঝিতে পারি না, মস্তিষ্কে ধরিতে পারি না, হৃদয় মস্তিষ্কের মাথায় একটা ঘোমটা ফেলিয়া মস্তিষ্ককে চাপিয়া ফেলে, মায়ার একটানা স্রোতে আমার হাত পা অবশ করিয়া টানিয়া লইয়া চলিয়াছে, এ মায়ার ব্যাপারটা কি? কিসে আমাকে এত ভ্রান্ত করে, চিতাবাঘিনীকে কেন কুরঙ্গিনী ভাবিয়া পুষিতেছি? এ জটিল রহস্যের মিমাংসা কে করিবে? কে আমাকে বুঝাইবে?

জগৎ অনন্ত মরুস্থলী, সাইমুনের ঝটিকা দিবানিশি অনন্ত বালু রাশির উপর প্রবাহিত। কি খরস্রোতা নির্ঝরিণী, কি মন্থর গতি প্রভূত পয়ঃ তুষার বাহিনী, সকলেই সেই স্থলে পতিত হইয়া অন্তর্দ্ধান করে। বিশাল জীবন-নদের অবশ্যম্ভাবী এক মাত্র পরিণাম মরুস্থল। প্রারম্ভে খরস্রোত চপলতা, মধ্যে অতলস্পর্শ প্রবীণতা, অন্তে আত্মঘাতিনী স্বরস্বতী মূর্ত্তি, এ জীবনে লাভ কি? আমি জীবন চাহি না, যে জীবনের ইতিবৃত্ত চিন্তা করিলে আত্মহত্যা পুণ্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়, নরক ভোগের তুলনায় স্বর্গ সুখ তুচ্ছ বলিয়া পরিচালিত হয়, আমার অনিচ্ছায় কে আমাকে সে জীবন দান করিয়া উপকৃত করিল?

স্বর্গ, স্বর্গ, স্বর্গ বালকের পুত্তলিকা, বর্ব্বরের প্রলোভন, ইহ জীবনের অসমতা সামঞ্জস্য করিতে প্রতারকের উদ্ভাবনা। ইহজীবনে যাহা হইল না, পৃথিবীর অণুরূপ উপাদানে সৃষ্ট, অণুবীক্ষণের কাচ লইয়া ক্ষুদ্র পৃথিবী মহত্বীকৃত স্বর্গে, পার্থিব নিয়মের বাতায় হইয়া, পার্থিব লাভ লোকসানের হিসাব হইয়া ক্ষতিপূরণ করা হইবে। হৃদয় আশ্বস্ত হও। এখানে তোমার পুণ্যের

পুরস্কার দারিদ্র্য, পাপের দণ্ড ঐশ্বর্য্য ও সম্মান। তুমি পাপ হইতে নিবৃত্ত হও। ইহকালে তোমার পুণ্যের পুরস্কার কুঠার,লৌহশলাকা,জলন্ত চিতা,পাপের দণ্ড রাজপ্রাসাদে। তুমি পাপ হইতে নিবৃত্ত হও,ইহকালে পুণ্যে কিছু লোভনীয় না থাকিলেও পুণ্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হও, পরকালে স্বর্গে ক্ষতি পূর্ণ হইবে। হৃদয়ত আশ্বস্ত হয় না। আমি পাপ করিলাম তোমার বিরুদ্ধে, ক্ষতি করিলাম তোমার, ক্ষমা করিবার ক্ষমতা তোমার, দণ্ড দিতে হয়, তুমি দিবে, তোমার অধিবাসী সমাজ দিবে, সমাজের প্রতিনিধি রাজা দিবে। তৃতীয় ব্যক্তি দণ্ড দিবার কে? ক্ষমা করিবার কে? আমি উপকার করিলাম তোমার, কৃতজ্ঞ হইতে হয়, তুমি হইবে, পুরস্কার দিতে হয় তুমি দিবে। তৃতীয় ব্যক্তির নিকট পুরস্কার লইব কেন? লইলে তাহাতে তৃপ্তি হইবে কেন? আর যদি পুরস্কার দেন, আর তাহাতে তৃপ্তি হয়, সে পুরস্কার অন্যকে সাধু কর্ম্মে প্রণোদিত করিতে, তিনিও তোমার সমাজের একজন সাধারণ তন্ত্রের প্রজা, তোমার সুখ দুঃখে তাঁহার ক্ষতি বৃদ্ধি হয়। স্থানান্তরে, সময়ান্তরে, সমাজের অসাক্ষাতে, গোপনে দণ্ড পুরস্কার, অন্ধকার রাত্রে দস্যুর লগুড় প্রহারের ন্যায় নিরর্থক বা অপরিচিত, অজ্ঞাত দানার উপহারবৎ পরিত্যাজ্য। আমার সুখ দুঃখ তোমাদিগকে লইয়া। জ্ঞাতি মণ্ডলে অপমান, দেশে সুনাম, যাহাদিগকে লইয়া একত্র আছি, যাহাদিগের শ্রেষ্ঠ হইবার জন্য সকলি পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত,, যাহাদিগের একটী টিটকারী, কুঠার অপেক্ষা যন্ত্রণাদায়ক, দণ্ড দিতে হয়, তাহাদিগের সম্মুখে দিবে, পুরস্কার দিতে হয়, তাহাদিগের সমক্ষে দিবে, তবে দণ্ড পুরস্কার সার্থক হইবে।

দণ্ড পুরস্কারের সার্থকতা অস্বীকার করি না। পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে, অস্বীকার করি। যাহা করিয়াছি, তাহার দণ্ড আমাকে ভোগ করিতেই হইবে। কাহারও সাধ্য নাই, আমার কৃত পাপের ফল ভোগ হইতে আমাকে অব্যাহতি দিবেন। কারণ ঘটিলেই কার্য্য হইবে, সে নিয়মের ব্যাঘাত ঘটিতে পারে না, তবে যে সকল কারণে কার্য্য প্রভাবিত হয়, দণ্ড ভয়ে বা পুরস্কারলাভ তাহার অন্যতম হইয়া কার্য্যকে প্রভাবিত করিতে পারে। তুমি আমাকে দণ্ড দাও, ভবিষ্যৎ অসৎ কার্য্য হইতে আমাকে নিবৃত্ত করিতে, অতীত কার্য্য প্রত্যাহৃত করিতে নহে। অতীত প্রত্যাহরণ করিবার ক্ষমতা আমারও নাই, তোমারও নাই, কাহারও নাই। তুমি আমাকে পুরস্কার দাও, ভবিষ্যতে সুকার্য্য করিবার লোভ দেখাইতে। দণ্ড পুরস্কারের অন্য কোন অর্থ নাই। ইহকালের কার্য্যের দণ্ড ইহকালেই হইতে পারে। সমাজের উপকারের জন্য ব্যক্তি গত স্বাধীনতা সঙ্কুচিত করিতে আমরা বাধ্য হই। দণ্ড সমাজের উপকারার্থে, দণ্ডদাতা সমাজ, পুরস্কর্ত্তা সমাজ,গ্রামের মোড়ল দিয়াই হউক, সংবাদ পত্রেই হউক, আর দেশের রাজা দিয়াই হউক। শিক্ষা ও সংসর্গের ন্যায়, অনুবৃত্তি ও অভ্যাসের ন্যায়, যে সহস্র কারণে আমার এক একটী কার্য্য প্রভাবিত করে, দণ্ড পুরস্কার তাহার একটী। শিক্ষা দোষে আচরণ যেমন অন্যায় হইতে পারে, দণ্ড দোষে তেমনি হইতে পারে। সুতরাং দণ্ড পুরস্কারের সার্থকতা অস্বীকার করা যাইতে

পারে না। কিন্তু সে দণ্ড পুরস্কার পরকালে হয়, দণ্ড পুরস্কার তৃতীয় ব্যক্তির হস্তগত। তবে সের সিংহের অপরাধে ডালহৌসী দলিপ সিংহের দণ্ড করিয়া ছিলেন, তাহাও যুক্তি সঙ্গত বলিতে হইবে। আবার তোষা-মোদ করিয়া বিল্বপত্র দিয়া ভোলা-নাথকে ভুলাইয়া নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, ইহা অযুক্তি কবিকল্পনায় সম্ভব, কিন্তু সত্য নহে। জীবনে সুখ দুঃখের অনিয়মিত অন্যায় বিভাগ দেখিয়া কোন কবি কোন দিন স্বর্গের কল্পনা করিয়া ছিলেন। সে কুজ্-ঝটিকা যুক্তির আলোকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে।

দয়াময় ঈশ্বরের রাজ্যে দুঃখ যন্ত্রণার এত প্রাদুর্ভাব কেন? জীবন এত অসার কেন? চিরদিন এই প্রশ্ন চিন্তাশীলের মস্তিষ্ক আলোড়িত করিয়াছে। স্বর্গের ন্যায় আর একটী কবিকল্পনা মানবেচ্ছার স্বাধী-নতা। জগতে দুই জন ঈশ্বর, দুই জন কর্ত্তা, এক জন দিয়া প্রহেলিকার সমস্যা হয় না। তাই, ঈশ্বর ও সয়তান, দেব ও দৈত্য, সুর ও অসুর, আহরিমান ও অহুর মজাদার-কল্পনা বর্ব্বর-যুগে প্রচলিত ছিল। মনুষ্য এখন সভ্য হইয়াছে, মস্তিষ্কে বাগ্মিতি জন্মিয়াছে, তাই সাকার, দৈত্য, দানব, সয়তান ও অসু-রের পরিবর্ত্তে নিরাকার স্বাধীন ইচ্ছাকে তাহাদিগের সিংহাসনে বসাইয়া দিয়াছে। সুখের কর্ত্তা ঈশ্বর, দুঃখের কর্ত্তা মনুষ্যের স্বাধীনতা। দুর্ব্বল ঈশ্বরের অভিপ্রায় ভাল ছিল, তিনি সুখী করিতেই মনুষ্যকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, কেবল না বুঝিতে পারিয়া তাহাকে ইচ্ছার স্বাধীনতা দিয়াছিলেন, সেই স্বাধীনতার দোষে মনুষ্য আপনার পায়ে আপনি কুড়ুল মারিয়াছে। স্বাধীন না হইলে মনুষ্য সুখী হইত, কিন্তু ঈশ্বরের বুদ্ধির দোষেই হউক অথবা হাইকোর্টের জজিয়তি পাইবার লোভেই হউক, ঈশ্বর মনুষ্যকে স্বাধীনতা দিয়াছিলেন। মার্জ্জার হস্তগত মূষিককে স্বাধীনতা দিলে, মূষিক যখন পলায়নপ্রবৃত্ত হয়, আর মার্জ্জার তাহাকে চপেটাঘাত করে, তখন মার্জ্জারের কত আনন্দ হয়, ঈশ্বর কি সে আনন্দ উপেক্ষা করিতে পারেন? অথবা তিনি বুঝিতে পারেন নাই যে, তিনি অমৃত ভ্রমে সন্তানকে বিষপান করাইতেছেন, এখন সন্তানের মৃত্যু হইলে তিনি কি করিবেন? অথবা মনুষ্যকে একটু স্বাধীনতা না দিলে, মনুষ্যের কর্ম্মাকর্ম্মের বিচারপতি হইবার তাঁহার সুবিধা কই ঘটে। সেই জন্যই বা তিনি মনুষ্যকে ইচ্ছার স্বাধীনতা দিয়া-ছিলেন। দয়া-প্রবণ ঈশ্বর স্ত্রীবৎ কোমল হৃদয়। সামরিক যুগে হৃদয়ের কোমলতা তাদৃশ লোভনীয় নহে, কঠোরতাই সে সময়ে গৌরবের প্রস্রবণ। তাই কোমল হৃদয় ঈশ্বরের বিচারে কঠোরতা আরোপ করিবার জন্য লোকে ঈশ্বরকে বিচারকরূপে কল্পনা করিতে চাহিয়াছিল, ঈশ্বরে বিচার-পতিত্ব আরোপ করিবার জন্য এবং জীবনের যন্ত্রণা ব্যাখ্যা করিবার জন্য মানব ইচ্ছার স্বাধীনতা কল্পিত হইয়াছিল।

আমার জন্মান্ধতা, আমার মূকতা, আমার অঙ্গ-বৈকল্য যেমন আমার সাধ্যায়ত্ত নহে, আমার কৃত কোন কর্ম্মই তেমনি আমার সাধ্যায়ত্ত নহে। যাহারা আমার প্রকৃতি গঠিত করিয়াছে, তাহারা আমার সহিত পরামর্শ করে নাই। আমি যন্ত্র, যন্ত্র যেরূপ গঠিত হয়, সে সেইরূপে কার্য্য করে, কার্য্য ভাল হয়, সুখ্যাতি কারিকরের, কার্য্য মন্দ

হয় অখ্যাতি কারুকরের; মন্দ কার্য্যের জন্য, আহাশুখ না হইলে, কি কেহ যন্ত্রটীকে পদাঘাত করে? যন্ত্রে তৈল দাও, দম দাও, সে অন্য রকমে চলিবে। আমাকেও দণ্ড দাও, পুরস্কার দাও, আমি অন্য রকমে চলিব, কিন্তু দায়িত্ব আমার কিছু নাই। আমার জন্ম, আমার শিক্ষা, আমার সংসর্গ, আমার অভ্যাস, দণ্ড, পুরস্কার, প্রতিবেশী, অবস্থান কিছুই আমার করায়ত্ত নহে। সুতরাং কি করিব, কি না করিব, তাহাতে আমার কোন স্বাধীনতা নাই। যে রকমের কারণ প্রবলতর হইবে, সেই রকমের কার্য্য করিতে আমি বাধ্য। তবে আমার দায়িত্ব কোথায়? তুমি যে দণ্ড দাও তাহা আমার দায়িত্ব হেতু নহে, শত কারণের সঙ্গে আর একটী নূতন কারণ যোগ করিয়া দিবার জন্য। বাতুলকে কোন কার্য্যের দায়ী বলিয়া পদাঘাত করিলে, লোকে তোমাকে যেমন উপহাস করিবে, আমাকে দায়ী বলিয়া পদাঘাত করিলেও তেমনি উপহাস করিবে। যাহা কিছু আমি করি তাহা আমার প্রাক্তনগত, ললাট-লিপি বা কর্ম্মফল। আমার ইচ্ছার স্বাধীনতা বিন্দুমাত্র নাই। থাকিলে আমার সুখ দুঃখের কারণ যথার্থ রূপে বুঝিতে পারিতাম বটে, কিন্তু ঈশ্বরকে অনীশ্বর করিয়া ফেলিতাম। আমাকে অমৃত বলিয়া গরল খাইতে দিবার জন্য তাঁহাকে অভিসম্পাৎ করিতাম। তোমার ইচ্ছা তোমার অধীন নহে, তোমার আজ্ঞাবহ গোলাম নহে, এই অর্থে মাত্র ইচ্ছার স্বাধীনতা স্বীকার করা যায়।

জীবনের দুঃখ প্রাবল্য এড়াইবার জন্য দুর্ব্বল প্রকৃতি লোকে আত্মহত্যা করে, ইহা ব্যাখ্যা করিবার জন্য তেমনি পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য নানা দেশীয় দার্শনিকগণ মানসিক আত্মহত্যা ঘটাইয়া ছিলেন। পুত্র শোক নিবারণ করিতে কেহ কেহ সুরাপান করিয়া আত্মবিস্মৃতি ঘটায়, এই দার্শনিকেরা মায়া পান করিয়া ভববিস্মৃতি ঘটাইয়াছিলেন। পূর্ব্বে দ্বৈতবাদীদিগের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। ইহারা সুখের কর্ত্তা এক ঈশ্বর ও দুঃখের কর্ত্তা আর এক ঈশ্বর কল্পনা করিয়াছিলেন। এই মাত্যলেরা অদ্বৈতবাদী। ইয়ুরোপে ফিকটে ও ভারতবর্ষে শঙ্কর মিশ্র ইহাদের আচার্য্য। ইহাদের ভিন্ন প্রকৃতি সন্তান সন্ততি অনেক আছে। কেহ বলেন, জগতে সুখ ভিন্ন দুঃখ নাই। সকল সুখের, চাঁদের জোছনা, ফুলের সুবাস, মেঘের শোভা, শিশুর হাসি, প্রণয়ের সুখ, নানা কথার অনুপ্রাস ঘটাইয়া ক্ষত মুখে ভস্মের প্রলেপ দিতে চাহেন। কেহ বা বলেন, দুঃখ বলিয়া যাহা বুঝিতেছ, তাহা দুঃখ নহে, তাহাও সুখ। তুমি মায়ায় পড়িয়া ভ্রান্ত হইয়াছ, তাই ফুলের আঘাতে বজ্রপাত কল্পনা কর, সোণার হারকে লৌহ শৃঙ্খল অনুমান কর, সুখের বাসর দুঃখের কারাগার বলিয়া প্রতীত হয়। এই দলের অগ্রনীগণ "সোহং" ঘোষণা করেন। "আমিই ঈশ্বর"। কেবল আমার সত্তা ঈশ্বর নহেন, আমি ঈশ্বর কর্ত্তৃক অনুপ্রাণিত নহি, ঈশ্বর "তত্ত্বমসি" You are his manifestation। আর স্রষ্টা নাই, সৃষ্ট নাই, ইহকাল পরকাল নাই, জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, স্বর্গ নাই, পৃথিবী নাই, এক ভিন্ন দুই নাই। মনুষ্যই ঈশ্বর, অনাদি অনন্ত, সর্ব্বজ্ঞ, ঈশ্বরই সব, মনুষ্যই সব। অদ্বৈতবাদীগণ মনুষ্যকে ঈশ্বরত্ব দান করিয়া ঈশ্বরকে অবনত করেন অথচ দুঃখের কারণ ব্যাখ্যাত হয় না। মনুষ্য

ঈশ্বর হইলে পাপ করে কে? দণ্ড পায় কে? ঈশ্বর? মনুষ্য ঈশ্বর হইলেও মনুষ্য ঈশ্বর দুঃখ ভোগ কেন করে, অব্যাখ্যাত রহিয়া যায়। কেহ বা দুঃখের অস্তিত্ব উড়াইবার জন্য জগতের অস্তিত্ব উড়াইয়া দেন, কেহ বা দুঃখভোগীর অস্তিত্ব উড়াইয়া দুঃখের উন্মূলন করিতে চেষ্টা করেন। নির্ব্বোধ শশক পত্র পুঞ্জে মস্তক লুকাইলে কি ব্যাধের বজ্রাঘাত নিবৃত্ত হয়।

নিরীশ্বরবাদী শাক্যসিংহ অন্যান্য প্রাচীন পণ্ডিতের ন্যায় অবিদ্যা হইতে বাসনা ও বাসনা হইতে দুঃখের উৎপত্তি অনুসরণ করিয়া জন্ম মাত্র দুঃখের কারণ বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। দুঃখময় জীবনের সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর, ইহা শাক্য সিংহ বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। জীবের দুঃখ ও ঈশ্বরের দয়ার বিসম্বাদীতা তিনি ঘুচাইতে পারেন নাই, কেহ দুঃখের অস্তিত্ব, কেহ বা জীবের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া অদ্বৈতবাদী হইয়াছিলেন। কেহ বা উভয়ই স্বীকার করিয়া দ্বৈত ঈশ্বরের কল্পনা করিয়াছিলেন। এই দুইটীর কোনটী শাক্যের মনঃপূত হয় নাই; তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া কর্ম্মফল দ্বারা জীবের দুঃখ, ব্যাখ্যা করিয়া ছিলেন এবং জগতকে স্বতঃসৃষ্ট বলিয়া অভিহিত করিতেন। কর্ম্ম ফল বর্ত্তমান দুঃখের কারণ ব্যাখ্যা করিতে পারে। কিন্তু আদিম দুঃখের কারণ ব্যাখ্যা করিতে পারে না। কর্ম্মফল এমন কেন হইল? যাহার পরিণামে আমাদের এত দুঃখ, পূর্ব্ব পুরুষগণ এমন কর্ম্ম কেন করিয়াছিলেন, শাক্য সিংহ তাহার উত্তর দিতে পারেন নাই। হিন্দু ব্যবস্থাপকগণ দুঃখময় জীবন বিদ্বেষের দুঃখ মোচনের জন্য বাসনার সংযমন, নিবৃত্তিমার্গ বা ব্রহ্মচর্য্য ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। শাক্যসিংহ দুঃখময় জীবন জীবমাত্রেরই জন্য সেই ব্রহ্মচর্য্য বা অনন্ত তুষানলের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি সরলভাবে স্বীকার করিয়াছিলেন, জন্ম বা জীবন মাত্র দুঃখময়,—আত্মহত্যা সে দুঃখ নিবারণের একমাত্র উপায়। বিষপানে বা উদ্বন্ধনে একদিন আত্মহত্যা করিবার পরামর্শ দিলে লোকে তাঁহাকে বাতুল বলিত। তাহা না করিয়া তিনি এক একটু করিয়া জীবনের শ্বাস রোধ করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন, রিপু, কামনা, বাসনা, হৃদয়, তিনি এক একটু করিয়া তুষানলে দগ্ধ করিতে, এক একটু করিয়া সমস্ত হৃদয়টা উৎপাটিত করিতে বলিয়াছিলেন। হৃদয় দুঃখের কারণ। মাতাল সুরা মধ্যে হৃদয়কে ডুবাইয়া শোক হইতে ক্ষণকালের জন্য নিষ্কৃতি পায়—সন্ন্যাসী মাদক সেবন করিয়া জীবনের যন্ত্রণার লাঘব করে। সে কিন্তু ক্ষণিক চিকিৎসা। কর্ম্মফল জীবনে দুঃখের কারণ বলিয়া এবং হৃদয় সেই দুঃখের আধার বলিয়া, বুদ্ধদেব জ্ঞান যোগে হৃদয়কে চিরদিনের মত ধ্বংস করিতে পরামর্শ দিয় ছিলেন। হৃদয়হীন জীবন, মৃত্যু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হয় না। শাক্য বলিয়াছিলেন, জীবনে লাভ নাই। যদি ভবিষ্যতে ক্ষতি পূরণের আশা না রহিল, যদি আমার অনায়ত্ত কারণ হেতু সমস্ত জীবন যন্ত্রণাই পাইতে হইল, যদি অমৃতের কটোরা মুখের নিকট পৌঁছিতে পৌঁছিতে হলাহলেই পরিণত হয়, যদি সংসার কেবল নরকময়, প্রণয় কেবল বিরহময়, মিত্রতা শত্রুতাময়, বিশ্বাস অবিশ্বাসময়, উপকার কৃতঘ্নতাময়, শান্তি অশান্তিময়, ধর্ম্ম প্রতারণাময়, পবিত্রতা

ক্রুটিবভ্রমের হয়, যদি জীবন কেবল বিষময় হয়, তবে জীবনে লাভ কি? এত দুঃখ যন্ত্রণা পাইয়া এখনও জীব যখন জীবনের আকাঙ্ক্ষা করে, তখন বুঝিলাম বিষপাত্র এখনও পূর্ণ হয় নাই। যে স্তম্ভে তাঁহার সুখের লতা জড়াইয়াছেন, যে দিন বালকের হস্তে উর্ণনাভের তন্তুর ন্যায় বজ্রাঘাতে তাঁহাদের সে স্তম্ভ চূর্ণিত হইবে, তখন তাঁহারা দেখিবেন পৃথিবীতে সার কেবল বিষাদ, সুখ স্বপ্ন মাত্র।

"It is not Nature" says Fichte "it is Freedom itself, by which the greatest and most tenible disorders, incedent to our race is produced. Man is the cruellest enemy of man."

স্বাধীনতা পাপের কারণ নহে, যেহেতু স্বাধীনতা নাই পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে। কর্ম্ম ফলই পাপের কারণ অর্থাৎ আমার পাপের জন্য দায়ী আমি নহি, অন্যেরা। অন্যের পাপ আমার দ্বারা প্রকাশিত হয় "পুত্রে যশসি তোয়েচ নরানাং পুণ্যলক্ষণং।" দণ্ড পাই আমি। কেন? বলিবে আমার এই দণ্ড অনুমান করিয়া পূর্ব্ব পুরুষেরা পাপ হইতে নিবৃত্ত হইবেন বলিয়া। কৈ তাঁহারাও নিবৃত্ত হন নাই; হইলে আমি পাপ করিতাম না, তোমরাও দণ্ড দিতে না। পক্ষান্তরে দেখ, প্রত্যেক নগরে ওলাউঠা ও বাতশ্লেষ্মা জ্বরের ন্যায় পাপীর নিরন্তর জন্ম হইতেছে। পয়োনালী জাত কীটের ন্যায় নগরের পঙ্কিল ক্ষেত্রে রাশী রাশী পাপীর জন্ম হইতেছে; কোন দণ্ড পুরস্কারে ইহাদের পরিবর্ত্তিত হইবার নহে। ইহাদের জন্মদাতা কে? সুতরাং জীবনের দুঃখ মাত্র পাপ হেতুও নহে, হইলেও অন্যায়। আর যে পাপের জন্য দায়ী আমি নহি, তাহার জনিত দুঃখ আমাকে ভোগ করিতে হইলে তোমরা সুবিচারক বটে! ভাই, যখন কঠোর কুঠারাঘাতে পাপীকে চূর্ণ করিতে উদ্যত হইবে, তাহার যন্ত্রীত চিন্তা করিয়া তাহার দুর্দ্দশায় এক ফোঁটা চোখের জল অর্পণ করিও।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী।

সৌন্দর্য্যতত্ত্ব।

বিজ্ঞান সৌন্দর্য্য চায় না। জ্যোতির্ব্বিদ্ শরতের নির্ম্মল নৈশ আকাশে ফুটন্ত তারার হাসি বা হীরাখচিত ছায়া পথের মাধুর্য্য দেখিতে রাত্রি জাগরণ করেন না। তিনি দৃষ্টি সহায় যন্ত্রযোগে শূন্য পথে কতক গুলি খন্তুর কদাকার বা ভীতি সঞ্চারক জলন্ত জড় পিণ্ডের ছুটাছুটি দেখিয়াই স্তম্ভিত হন। বড় বেশী হয়ত এই সকল মরুতুল্য জড় রাশির গতিবিধির ও পরস্পরের সম্বন্ধাদির নিয়ম শৃঙ্খলে তিনি কখনও কখনও এক আধ টুকু সৌন্দর্য্যের স্বপ্ন মাত্র দেখিয়া থাকেন। কিন্তু তাহাও তাঁহার লক্ষ্যের অতীত। শিশিরে নাইয়া, ফুলে সাজিয়া, প্রভাত জ্যোতির শাড়ী পড়িয়া প্রকৃতি হাসিতেছে। সুন্দর যুবতীর নিশ্বাস প্রবাহের মত মৃদু মৃদু সুগন্ধিবায়ু ধীরে ধীরে বহিতেছে। নিভৃত কুসুমকুঞ্জে কোকিল কুহরিতেছে। নীলিমার স্তব্ধ কোলে পাপিয়া গাইতেছে। তুমি বলিবে "সৌন্দর্য্য জাগিয়াছে।" এক জন কট মট ডারউইন্‌শিষ্যের কাছে ঘণ্টা খানিক বসিলেই বুঝিয়া আসিতে হইবে, এসকলের কিছুই কিছু নয়। তিনি বলিবেন "কতকগুলি ধূলা মাটি কীট পোকার বিকাস বা বিবর্ত্তন ব্যতীত

সৌন্দর্য্য বন্ধুরতা, অপ্রেম, অশান্তি চায় না। সৌন্দর্য্য ফোটে প্রেমে। সৌন্দর্য্য ফোটে স্নেহে, শান্তিতে। সৌন্দর্য্য বলে "এস, এস। কাছে এস। বুকে এস। কোলে এস। প্রাণে এস। হৃদয়ে এস। মর্ম্মের ভিতরে এস। মর্ম্মের মর্ম্মে এস। এস মিলে যাই। মিশিয়া থাকি। এস এক বই দুই নাই। তুমি আমি এক। এক হইয়া দ্বিতীয়ের সমীপে দাঁড়াই। দ্বিতীয় মহৎ, মহিয়ান, শুদ্ধ, বুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ, নির্ম্মল, সুন্দর। দ্বিতীয় সৌন্দর্য্যের পূর্ণ বিকাশ "মা"। মা এর কোলে সন্তান পূর্ণ বিকাশের উপরেও আর কিছু। নির্ব্বাক, গভীর, গম্ভীর, স্তম্ভিত সৌন্দর্য্য। এমন আর নাই।"

বাহিরে যে সৌন্দর্য্য দেখি তাহা ভিতরের শোভা সৌন্দর্য্যের ছায়া মাত্র। কথাটা অবৈজ্ঞানিক নয়। বিজ্ঞান খুঁজিতে খুঁজিতে খেই হারাইয়া শেষটা বলিতে বাধ্য হইয়াছে "বাহিরের যে সৌন্দর্য্য দেখ, তাহা ভিতরের শোভা সৌন্দর্য্যের ছায়ামাত্র।" কথাটা ভাবান্তরেও বলিতে পারা যায়। স্থূল ভাবে দেখা যায়, সূর্য্য কিরণ, অণুর সঞ্চালন, ইথার তরঙ্গ, চক্ষু এই কয়টীর যোগে বর্ণ বৈচিত্র প্রকাশিত হয়। কিন্তু চক্ষুর ক্রিয়া সম্পূর্ণ মানসিক ব্যাপার। অজ্ঞানবস্থায় কত বর্ণের পাখী, ফুল চোকের কাছ দিয়া চলিয়া যায় বা চক্ষুর সম্মুখে অবস্থিত হয়। পরীক্ষা দ্বারা ঠিক করা গিয়াছে, তখন চোক বুজিয়া থাকিলে যাহা ঘটিত, তাহার অতিরিক্ত কিছু ঘটে নাই। মোহের অবস্থায় বা পীড়াজনিত গাঢ় বিকারের সময়েও প্রায় এই রূপ ব্যাপার ঘটে। এই প্রকারে নানা উপায়েই প্রমাণ হয় চক্ষুর ক্রিয়া মানসিক ব্যাপার মাত্র। বর্ণবৈচিত্র সম্বন্ধে আর যে তিনটী কারণ স্বীকার করা হয় তাহা বাহিরের। এ ঘটনাতে চক্ষুই আমাদের প্রধান সহায়। অপর গুলির বিদ্যমানতাতেও চক্ষুর অভাবে সংসার অন্ধকার বোধ হয়। মনের যে বর্ণগ্রাহিকা শক্তি তাহাই আমাদের নিকট বর্ণ বৈচিত্রের সাক্ষাৎ কারণ। মানুষের বয়স্ ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে এই শক্তি যত বিকাশিত হয় বর্ণগত বৈচিত্রও সেই পরিমাণে ফুটিয়া উঠিতে থাকে। সদ্যজাত শিশুর সহিত পরিণত বয়স্ক মানুষের এবিষয়ে যে প্রভেদ তাহা ভাবিয়া অবাক্ হইতে হয়। আবার সাধারণ লোকের অপেক্ষা যে ব্যক্তি বর্ণ বিষয়ে বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়াছে এবং বহুদর্শী হইয়াছে, তাহার চক্ষুতে এই বিচিত্রতা আরও পরিস্ফুতরূপে পরিস্ফুট। পশুদিগের বর্ণজ্ঞান এত অস্ফুট যে, তাহা আছে কি না তদ্বিষয়ে সময়ে সময়ে সন্দেহ উপস্থিত হয়। তাহাদের সৌন্দর্য্যানুভাবকতা আদবেই আছে বলিয়া বোধ হয় না। কেবল কখন কখন আলো দেখিয়া কোন কোন পশু বা পতঙ্গকে আমোদোন্মত্ত প্রায় হইতে দেখা যায়। কিন্তু তাহাদের ভিতরে তখন কোন্ জাতীয় শক্তির প্রভাবে কি প্রকারের ব্যাপার ঘটে তাহা ঠিক করিয়া বলা কঠিন। ইয়ুরোপের কোন কোন পণ্ডিতসমিতি হইতে পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে, বানরবৎ অতি অসভ্য বর্ব্বর প্রকৃতির মানুষও সূর্য্যোদয় এবং নির্ম্মল সলিল বক্ষে চন্দ্রালোক ও চন্দ্র বিম্বের ক্রীড়া দেখিয়া হর্ষোৎফুল্ল এবং গম্ভীর হয়। তখন তাহার মুখচ্ছবি দেখিয়া স্পষ্টই তাহাকে ভাবান্তরিত ও চিন্তান্বিত

বোধ হয়। তাহার ভাব ভঙ্গি দেখিয়া আর এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। বাবু ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী, এম, এ, তাঁহার প্রণীত মানবপ্রকৃতি নামক গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের শেষাংশে এই প্রকারের একটী উদাহরণ দিয়াছেন। বস্তুত, এই সকল বিচার করিয়া স্পষ্টই বোধ হয়, মানুষের মধ্যে কি যেন একটা শক্তি আছে বা বিকশিত হইয়াছে যে, তাহার প্রভাবে মানবের চক্ষুতে এই জগৎ সৌন্দর্য্যময় হইয়া উঠিয়াছে। মানুষ দেখে, এই বিশ্ব সৃষ্টির প্রতি অণুতে অণুতে যেন রাশি রাশি শোভা সৌন্দর্য্য ঢালা রহিয়াছে। কৈ একটী পশুকেও ত দেখা যায় না, যে বর্ষার আকাশে রামধনু আঁকা দেখিয়া, বিজলী চকিত নবীন মেঘের নীচে সবুজ বৃক্ষ শাখায় পেকমধারী ময়ূরের প্রসারিত পুচ্ছ দেখিয়া, বর্ষার উচ্ছ্সিত নদীরবক্ষে নির্ম্মল চন্দ্র কিরণের ক্রীড়া দেখিয়া, প্রভাতের অরুণ দীপ্তি মাখা শিশির-স্নাত ফুল্ল কুসুমোদ্যান দেখিয়া, মলয় অনিলে ফুল বাগানে ফুলের ঢেউ দেখিয়া, এক দৃষ্টে ধ্যান ধরিয়া স্তম্ভিত হইয়া সংসার ভুলিয়া, আপনা পাশরিয়া এক মুহূর্ত্তের জন্যও চাহিয়া আছে? কৈ কখনও ত দেখি না, কোকিলের মধুর কূজন, পাপিয়ার উদাস গান, ভ্রমরের মৃদু গুঞ্জরণ বা বাঁশীর সঙ্গীত, বীণার ঝঙ্কার শুনিয়া একটা ভল্লুক বা ব্যাঘ্র মানুষের মত মোহিত হইয়াছে? সর্পদিগের বংশিরব গ্রহণের শক্তি আছে। হরিণ সম্বন্ধেও এই রূপ প্রবাদ শুনা যায়। কিন্তু সাধারণত পশু-প্রকৃতি এ সম্বন্ধে ঘন নিবিড় অন্ধকারাচ্ছন্ন। কেবল মানুষেরই মধ্যে কি যেন এক জ্যোৎস্নাময়, স্বপ্নময়, মধুময় ভাবের সমুদ্র উচ্ছ্সিত রহিয়াছে। তাহার প্রতি তরঙ্গেই সৌন্দর্য্য ফুটিয়া আছে।

শুধু বর্ণ বা রঙ্ সৌন্দর্য্য নয়। বর্ণ-বৈচিত্র্যে মনোহর সৌন্দর্য্য বিকশিত হয়, ইহা সত্য কথা। সাতটী রঙ্ পৃথক্ পৃথক্ দেখিলেও মনে অসৌন্দর্য্যের বিরক্তি উৎপন্ন হয় না। কিন্তু রামধনু-দেহে ক্রমান্বয়ে সাজান দেখিলে যেমন ভাব হয়, তেমন কিছুতেই হয় না। কোন সুসজ্জিত গৃহে বা মনোহারীর দোকানে জিনিষ গুলি যতক্ষণ এলোমেলো হইয়া পড়িয়া থাকে, ততক্ষণ ভাল দেখা যায় না। যাই জিনিষ গুলি সুরুচি ও শৃঙ্খলার সঙ্গে সাজান হইল, অমনি কোথা হইতে যেন একটা সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিল। কতকগুলি ফুল ছিঁড়িয়া এক খানে ফেলিয়া রাখার অপেক্ষা দশটী সবুজ বা কচি পাতার সঙ্গে একত্র করিয়া গুছিয়া একটী তোড়া বান্ধিলে বা মালা গাঁথিলে সৌন্দর্য্য আরও বাড়ে। নানা হিজি বিজি বন জঙ্গলের মধ্যে দুইটা জবার গাছ, একটা টগরের গাছ, একটা চাঁপার গাছ ফুল ভরে অবনত হইয়া থাকিলেও তেমন ভাল দেখায় না। কিন্তু গাছ গুলি এক খানে করিয়া একটী বাগান করিলে কেমন ভাল দেখা যায়! পরচুলা প্রস্তুতকারীদের দোকানে কত সুদীর্ঘ কৃত্রিম কেশভার দেখিয়াছি। কিন্তু একটী ক্ষুদ্র মস্তক ঢাকা আজ ঘনলম্বিত বিপুল কেশ রাশির সম্মুখে এক খানি কৌমুদী-বিধৌত, কলঙ্কের রেখা শূন্য চাঁদমুখ ফুটিয়া আছে, ইহাও দেখিয়াছি। এই দুইএ কত প্রভেদ তাহা সুরসিক কবি তুমিই বিচার করিয়া বল। কলাপীর বিস্তৃত কলাপ রাশি এত মনোহর কি কেবল বর্ণ বৈচিত্র্যে? না। তাহার

সঙ্গে গঠন-বৈচিত্র্য, বিন্যাস-বৈচিত্র্য, সর্ব্বোপরি সুন্দর লাবণ্য মিশিয়া আছে বলিয়াই এত সুন্দর। এক খানি সোণা দেখিতে কদাকার। মালী তাহা কুড়াইয়া নিয়া কতকগুলি শাদা শাদা ফুল তৈয়ার করিল। এখন দেখত কদাকার সোণা খণ্ড কেমন সুন্দর হইয়াছে! কত শরীরে চাঁপাফুলের মত রঙ দেখিয়াছি। কত গৌর কান্তিতে গোলাপের আভা ছড়াইয়া হাসিতেছে দেখিয়াছি। অথচ বলিয়াছি "ইঃ! কি কুৎসিত!" সেথানে সৌন্দর্য্য যেন কেমন ফোটে নাই। কেমন টিকাল টিকাল নাক! কেমন পটল চেরা চোক দুইটী! কেমন হাতে গড়া মুখখানি! কেমন গোল গাল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলি! কেমন পটের মত দেহ খানি! পশ্চাতে কেমন এক বোঝা কাল মেঘের মত লম্বা চুল! সমস্ত দেহের উপর দিয়া কেমন একটা তেজাল, জমকাল, গৌরবর্ণের স্রোত বহিয়া যাইতেছে! অথচ এই সৌন্দর্য্যের প্রতিমা দেখিয়া একটুকুও মন উঠিল না। ধীরে ধীরে ঘরে ফিরিলাম। দূর হইতে একখানি লাবণ্যের প্রতিমা মুখভরা, প্রাণজোড়া, বুক পোরা হাসি হাসিতে হাসিতে কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। যেন সংসারমরুর বুকে হঠাৎ একটী সহস্র দল পদ্ম ফুল ফুটিল! যেন আঁধার আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ হাসিল। যেন যোগীর তন্দ্রা-নিমীলিত চক্ষুর সম্মুখে স্বপ্নে নন্দনকাননের শোভা জাগিয়া উঠিল! রাশি রাশি পুঞ্জ পুঞ্জ পারিজাত ফুটিল! ফুটন্ত মন্দার বৃক্ষে চির বসন্তের কোকিল ডাকিল! মন্দাকিনী কুসুমের ছায়া বুকে ধরিয়া মলয় প্রবাহ শীতল করিয়া বহিতে লাগিল! চক্ষু জুড়াইল, কর্ণ শীতল হইল, প্রাণ সুধার সাগরে সাঁতরাইতে লাগিল। এবার কি বলিব "আহা! সুন্দর! সুন্দর! সুন্দর!" কেনা বলিবে "বল!" কিন্তু এ সৌন্দর্য্যে পূর্ব্বের মত আস্‌বাবের বেশী আড়ম্বর নাই। তেমন গঠন চাতুর্য্য বা বর্ণের ঢলাঢলি নাই। আছে কি? আছে, আমার বুকের ভালবাসা আর তাঁহার বুকের ভালবাসা মিশিয়া একটী তরঙ্গ। আছে, কতক গুলি বিনম্রতা, কতক গুলি দয়া ও পরের জন্য অশ্রুর ধারা। আছে, এক প্রাণ ভগবদ্‌ভক্তি। আছে, এক বুক পবিত্রতা ও নিষ্ঠা। আছে, স্বর্গের পুঞ্জ পুঞ্জ রাশি রাশি লাবণ্য। আর কিছু নাই; যাহা আছে তাহার ভরেই ধরা টলমল, জগৎ চকিত। আর কি চাও? বল। বলিতে পার বল। যে উত্তর দিতে পার দেও। বল এ স্বপ্ন এ প্রহেলিকা কি? বল "এ সৌন্দর্য্যের কাহিনী কি? যাহা আকাশে নাই, পাতালে নাই, স্বর্গে নাই, মর্ত্তে নাই, জড়ে নাই, অজড়ে নাই, যেখানে খুঁজি সেখানেই যাহা দেখিতে পাইনা, অথচ সর্ব্বস্থানেই ফুটিতে পারে, তাহা কি? একি আশ্চর্য্য ভোজের বাজি নয়?"

অভক্ত, তুমি যেখানে উত্তপ্ত মরু দেখিয়া নিরাশায় কান্দিতে ছিলে, দেখ ভগবানের ভক্ত সন্তান সেখানেই স্বর্গরাজ্যের সুবর্ণ পারিজাত রাশি ফুটন্ত দেখিয়া প্রেমাশ্রু ঢালিতেছেন। দেখ ইহা সত্য, ধ্রুব, নিশ্চিত কথা। পাপীর নরকের আঁধারে ঢাকা বিশ্বেই সাধু ভগবদ্ ভক্তের কৈবল্য ধাম, বৈকুণ্ঠ ভবন, স্বর্গের নন্দনকানন। এখন শুনিবে, সৌন্দর্য্য কি? সৌন্দর্য্য ভগবানের ধাম দরবারের কিছু। ভগবানের নিজের একটী স্বরূপ। ইহা পশুর দেখি-

বার অধিকার নাই। অজ্ঞানীর দেখিবার অধিকার নাই। অভক্তের দেখিবার অধিকার নাই। বাহিরের কবিরা ইহার একটা ছায়া মাত্র দেখিয়াই উন্মত্ত হন। শুধু ভগবদ্‌ভক্ত কবি প্রাণ ভরিয়া দেখিতে পান। সেই সৌন্দর্য্যের পূর্ণ বিকাশ দেখিবার একমাত্র অধিকার তাঁহারই। যাঁহার ভিতর সুন্দর, তিনিই দেখেন বাহির সুন্দর। সৌন্দর্য্য দেখিতে চাও, ভিতর সুন্দর করিতে হইবে। সৌন্দর্য্য না দেখিলে জন্ম বৃথা, জীবন বৃথা। যে ইহা দেখে নাই, সে স্বর্গ দেখে নাই। সে ভগবানের সৃষ্টিতে নরক দেখে, আপনি নরকে থাকে। সৌন্দর্য্য মানব প্রাণের বড় আকাঙ্ক্ষার জিনিষ। ইহা যখন চক্ষুর অঞ্জন হয়, তখন শত্রুকে মিত্র বোধ হয়, দস্যুকে বন্ধু বোধ হয়, ঘাতককে সোদর জ্ঞান হয়। সৌন্দর্য্য অনন্ত জীবন পথের পথিকদিগের মহা পুণ্যতীর্থ। সুন্দর স্বয়ং ভগবান্‌।

শ্রীবিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায়।

তুকারাম ও রামপ্রসাদ। (২য়)

আমরা তুকারামের জীবন বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছি। এখন তুকারামের ও রামপ্রসাদ সেনের জীবনে কি কি সৌসাদৃশ্য প্রতীয়মান হয়, তাহার আলোচনা করিব।

উভয়েই নিজ নিজ মনের ভাব সংগীতের দ্বারায় ব্যক্ত করিতেন। সামান্য সাংসারিক ঘটনা হইতে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় উচ্চ ভাব পর্য্যন্ত, সংগীতের দ্বারায় প্রকাশ হইত। তুকারামের "অভঙ্গ" যেমন দাক্ষিণাত্যে আদরিত, রামপ্রসাদের "পদাবলী"ও সেই প্রকার বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধ। উভয়েই এক ঈশ্বরের উপাসক ছিলেন। প্রভেদের মধ্যে এই যে, তুকারাম ভগবানকে পিতৃভাবে দেখিতেন, রামপ্রসাদ তাঁহার মাতৃভাব উপলব্ধি করিতেন। উভয়েই ঈশ্বরের নিরাকার ভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। তবে, সাধনার জন্য একটা মূর্ত্তি অবলম্বন করা যে আবশ্যক, তাহা উভয়েই দেখাইয়াছেন। তুকারাম বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি বিঠোবার প্রতিমার সমক্ষে ভজন কীর্ত্তনাদি করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতেন। রামপ্রসাদ শাক্ত ছিলেন। কালী পূজা ও কীর্ত্তনাদি করিয়া তিনি তাঁহার জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিতেন। কিন্তু ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, এই আকারের মধ্যে, উভয়েই ঈশ্বরের নিরাকার ভাব দেখিতেন। এই সাধুদ্বয়ের পবিত্র জীবন আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, উভয়েই অতি অল্প বয়স হইতে সংসারের প্রতি বীতরাগ ছিলেন। উভয়েরই মন ভগবানের দিকে প্রধাবিত হইয়াছিল। প্রভেদের মধ্যে এই যে, সাংসারিক জ্বালা যন্ত্রণা ও নানা প্রকার দৈববিড়ম্বনা তুকারামের বৈরাগ্য অবলম্বন পক্ষে সহায়তা করিয়াছিল। ইহার উপর, তাঁহার মুখরা স্ত্রীর অত্যাচার তাহাকে সংসার ত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছিল। রামপ্রসাদ সম্বন্ধে যতদূর জানা গিয়াছে, তাহাতে বোধ হয় যে, তাঁহার সহধর্ম্মিনী কর্ত্তৃক তিনি লাঞ্ছিত হয়েন নাই। কিন্তু তিনি অতি অল্প বয়স হইতেই সংসারকে অতি অসার বিবেচনা করিয়া জগৎ জননীর প্রতি মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। তুকারাম, ভিক্ষাবৃত্তি কিম্বা কোন প্রকার চাকরী অবলম্বন

করিয়া যাহা কিছু পাইতেন, তাহা তাঁহার বাটীতে আনিয়া দিতেন। কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি মন সর্ব্বদাই নিযুক্ত থাকাতে, তুকারাম কোন স্থায়ী বৃত্তি অবলম্বন করিতে সক্ষম হয়েন নাই। তিনি একবার ক্ষেত্র-রক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া, ক্ষেত্র স্বামীর বিরক্তি ভাজন হইয়াছিলেন। পক্ষী সকল শস্য খাইয়া যাইতেছে, তৎ প্রতি তাঁহার লক্ষ্য নাই। ক্ষেত্রস্বামী তাঁহাকে তজ্জন্য ভৎর্সনা করিল। তিনি অমনি তেজের সহিত বলিয়া উঠিলেন, "কেন, পক্ষীগণও কৃষ্ণের জীব, তাহারা কেন তাহাদের খাদ্য হইতে বঞ্চিত হইবে।" পিতৃ বিয়োগ হইলে যখন সংসারের ভার রামপ্রসাদের উপর ন্যস্ত হইল, তাঁহাকে বিষয় কার্য্য করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল। তিনি মুহুরীর কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু মানুষ কি রামপ্রসাদকে সামান্য চাকরীতে আবদ্ধ রাখিতে পারে? তিনি কি সাংসারিক ব্যাপারে জড়িত থাকিতে পারেন? তিনি খাতা লিখিতে যান, জগৎ মাতা তাঁহার সমক্ষে দেখা দেন। একবার অঙ্কপাৎ করেন, আবার মায়ের নাম খাতায় লেখেন। অবশেষে, মানুষের চাকরী করা বিড়ম্বনা বিবেচনা করিয়া, ব্রহ্মময়ীর ভাবে বিভোর হইয়া তিনি তাঁহার হিসাবের খাতার এক পৃষ্ঠায় লিখিলেন।

আমায় দেও মা তবিলদারী।
আমি নিমক্ হারাম নই শঙ্করী।
পদ-রত্ন ভাণ্ডার সবাই লুটে, ইহা আমি সইতে নারি * * *
আমি বিনা মাইনের চাকর, কেবল চরণ ধূলার অধিকারী॥

তুকারাম শস্য রক্ষা করিবার ভার লইলেন। কিন্তু ব্রহ্মের ভাবে বিভোর হইয়া তিনি সকল জীবে ঈশ্বরের সত্তা অনুভব করিলেন। তাঁহার প্রতি যে একটা ভার অর্পিত হইয়াছে, তখন আর তাঁহার মনে উদয় হইল না। তিনি পক্ষীগণকে তাড়াইয়া দিলেন না—আহার হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিৎ করা তিনি অন্যায় বিবেচনা করিলেন। রামপ্রসাদের উপর একটী গুরুভার ন্যস্ত হইয়াছিল। আয় ব্যয়ের হিসাব পরিষ্কার করিয়া লেখা তাঁহার কার্য্য। তিনি ব্রহ্মময়ীর ভাবে বিভোর হইয়া আর তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিতে পারিলেন-না। পুস্তকের পাতে পাতে দুর্গা নাম ও সংগীত লিখিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার উপরে উপরের কর্ম্মচারী বিরক্ত হইল, সে দিকে তাঁহার দৃক্‌পাৎ নাই, পদচ্যুত হইবার আশঙ্কা নাই।

তুকারাম সংসার হইতে অবসৃত হইয়া, তাঁহার ইষ্ট দেবতা বিঠোবার সেবায় নিযুক্ত হইলে তাঁহার মনের ভাব এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছিলেন;—

"ভাল হইয়াছে ওহে দেবনারায়ণ,
ব্যবসায়ে নষ্ট হলো সমুদায় ধন।
সাংসারিক দুঃখ আর দুর্ভিক্ষ ভীষণ,
হয়েছে আমার পক্ষে সুখের কারণ।
এই সব যাতনায় হইয়া ব্যথিত।
করিয়াছি মন প্রাণ তোমাতে অর্পিত॥"

রামপ্রসাদ সাংসারিক ক্লেশকে তুচ্ছ করিয়া বলিতেছেন;—

"আমি কি দুঃখেরে ডরাই।
আমার দুঃখে দুঃখে জন্ম গেল, আর কত দুঃখ দেও দেখি চাই।
* * *
দেখ সুখ, পেয়ে লোক গর্ব্ব করে, আমি করি দুঃখের বড়াই॥"

তুকারাম, মহারাজা শিবজীকে যে পত্র লেখেন তন্মধ্যে প্রকাশ করিয়াছেন যে, তিনি দুঃখী নহেন। তিনি বলিতেছেন ;—

"কৃপা পাত্র নই মোরা শুন হে রাজন,
আমাদের দুঃখী বলে করোনা গণন।
নারায়ণে সমুদায় করিয়া অর্পণ,
তাঁহার আশ্রয়ে করি জীবন যাপন।
বাসনা বিহীন গ্রামে বসতি আমার
ধরণীর সুখ আশা নাহি কিছু আর।"

রামপ্রসাদ তাঁহার মনকে বুঝাইতেছেন যে তিনি দুঃখি নহেন। যথা ;—

ও মন তুই কাঙ্গালি কিসে।
ও তুই জানিসনেরে সর্ব্বনেশে।

* * *

ও তোর ঘরে চিন্তামণি নিধি,
দেখিস্ নারে বসে বসে॥"

তুকারাম এক স্থলে বলিয়াছেন!—

"বাসনায় নষ্ট করে পবিত্র জীবন।

* * *

সুসজ্জিত নগ্ন নারী করিলে দর্শন,
মৃত প্রায় হই আমি শুনহে রাজন।

* * *

তুকা বলে, ধনীগণ সম্ভ্রমের দাস,
ভক্তগণ হরি গেয়ে সুখে করে বাস।"

যে জন ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে চায়, তাহার পার্থিব সুখের আশা করা উচিত নহে। রামপ্রসাদ বলিতেছেনঃ—

"মন করোনা সুখের আশা,
যদি অভয় পদে লবে বাসা

* *

হরিষে বিষাদ আছে মন,
করোনা এ কথায় গোসা।
ওরে সুখেই দুঃখ, দুঃখেই সুখ,
ডাকের কথা আছে জানা॥"

তুকারাম হরিভক্ত ভাবে বিভোর থাকিয়া আপনাকে সুখী বিবেচনা করিতেন। পার্থিব সুখকে তিনি অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করিতেন। এই জন্য তিনি মহারাজা শিবজীর পত্রের প্রত্যুত্তরে এই প্রকার লিখিতে সক্ষম হইয়া ছিলেনঃ—

"তোমার নিকটে গিয়া কিবা প্রয়োজন,
হইবে ইহাতে বৃথা পথ পর্য্যটন।
খাদ্য যদি হয় মম কভু প্রয়োজন,
ভিক্ষা বৃত্তি করে আমি কাটাবো জীবন॥
বসনের আবশ্যক হইলে কখন,
ছিন্ন বস্ত্রে হবে মম অভাব পূরণ।
প্রস্তর আমার পক্ষে চারু আস্তরণ।
আকাশ হয়েছে মম গাত্র আচ্ছাদন॥"

* *

প্রকৃত ভক্তের পক্ষে বিষয় সুখ ভোগ যে অসম্ভব তাহা, রামপ্রসাদ এইরূপে প্রকাশ করিয়াছেনঃ—

"তারা নামে সকলি ঘুচায়।
কেবল রহে মাত্র ঝুলি কাঁথা,
সেটাও নিত্য নয়॥"

* *

যার পিতা মাতা ভষ্ম মাখে, তরু তলে রয়।
ওমা তার তনয়ের ভিটেয় ট্যাকা, এ বড় সংশয়।
প্রসাদে পেয়েছে তারা প্রসাদ পাওয়া দায়।
ওরে ভাই বন্ধু থেকোনা রামপ্রসাদের আশায়॥"

আর এক স্থলে রামপ্রসাদ বলিয়াছেনঃ—

"আমি ছিলেম গৃহবাসী, কেলে সর্ব্বনাশী
আমায় সন্ন্যাসী করেছে॥

তুকারাম যেমন মহারাজা শিবজীর অনুগ্রহ লাভ বাঞ্ছনীয় বিবেচনা করেন নাই, প্রত্যুত রাজার নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করত তাঁহার

প্রাসাদে গমন করেন নাই। রামপ্রসাদও একজন রাজ সভাসদ হইয়া রাজ বাটীতে থাকা তাঁহার ধর্ম্মজীবনের পথে একটী প্রতিবন্ধক স্বরূপ বিবেচনা করিয়া, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অনুরোধ রক্ষা করেন নাই। তবে এই দুই ভক্তের মধ্যে প্রভেদ এই যে, তুকারাম ধন পাইলে তাহা লইতেন না। তাঁহার পরিজনগণের জন্য যে ধন আবশ্যক, সে বোধ তাঁহার ছিল না। রামপ্রসাদ ধনের জন্য কাহারও নিকট প্রার্থনা করিতেন না, তবে, আচম্বিত ভাবে, তাঁহার হাতে টাকা আসিলে, তাহা উপেক্ষা করিতেন না। রামপ্রসাদ রাজার সভাসদ হইয়া সুখে কাল কাটাইতে পারিতেন। তবে, তাঁহার উপর সংসারের ভার ন্যস্ত ছিল, সুতরাং পরিজন প্রতিপালন জন্য যে মাসিক বৃত্তি পাইয়াছিলেন এবং রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে যে ভূমি দান করিয়াছিলেন, তাহা উপেক্ষা করেন নাই। রামপ্রসাদের সংসারে থাকিবার ইচ্ছা ছিল না। এ সম্বন্ধে তিনি তাঁহার জগৎজননীর কাছে অনেকবার মনের দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। যথাঃ—

"আমি তাই অভিমান করি।
আমায় করেছো গো মা সংসারী।"

আর এক স্থানে বলিয়াছেনঃ—

* *

"মনে করি গৃহ ছাড়ি,
নাম সাধনা করি বসে।"
কিন্তু, এমন কল করেছো কালী,
বেঁধে রাখে মায়া পাশে॥

উভয়েই মুক্ত হস্ত ছিলেন। তুকারাম গৃহত্যাগ করিবার পূর্ব্বে, অকাতরে দান করিতেন। এমন কি, তাঁহার সন্তানগণ যে কষ্ট পাইবে, সে চিন্তা তাঁহার মনে উদয় হইত না। দয়ার পাত্র দেখিলেই তিনি দান করিতেন। তুকারামের স্ত্রী তাঁহার স্বামীর প্রতি আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন—"গৃহে শস্য আসিল, কিন্তু আমার সন্তানেরা তাহা খাইতে পাইবে না। আমার এই গৃহ-চোর (তুকারাম) সমুদায় অপর লোককে বিতরণ করিবে। তাঁহার জন্য বাটীতে কিছু থাকিতে পারিবে না। আমি এখন কি করি, কোথায় যাই, কি প্রকারে সন্তানগণকে প্রতিপালন করি।" কথিত আছে যে, একদা তুকারাম কয়েক গাছি আক লইয়া বাটী আসিতেছিলেন। আসিতে আসিতে দয়ার পাত্র দেখিয়া বিতরণ করিতে লাগিলেন। শেষে, এক গাছি মাত্র রহিল। তাহাই লইয়া বাটীতে আসিলেন। তুকারামের স্ত্রী এ বৃত্তান্ত শুনিতে পাইয়াছিলেন। তাঁহার হস্তে আক গাছি দিবা মাত্র তিনি ক্রোধে অধীরা হইয়া সেই ইক্ষু দণ্ড তুকারামের পৃষ্ঠে ভাঙ্গিলেন। তুকারাম হাসিয়া বলিলেন—"সহধর্ম্মিনীর ইহাই প্রকৃত ধর্ম্ম বটে। তোমাকে আক গাছি খাইতে দিলাম, তুমি তাহা কি প্রকারে একা খাইতে পার—সুতরাং তোমার স্বামীকে দিবার জন্য আকগাছি ভাঙ্গিয়া দুই খণ্ড করিলে।"

রামপ্রসাদও উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। লোকের ক্লেশ দেখিলে তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইত। কালী ঠাকুরাণীর ও কবির প্রণামী স্বরূপ ভক্তগণ যাহা প্রদান করিত, সমুদায়ই দাতব্যে ব্যয়িত হইত। কথিত আছে যে, ইহাতে কুলান না হইলে, কোন কোন সময়ে তাঁহার মাসিক বৃত্তি হইতেও অর্থ দান করিতেন। রামপ্রসা-

দের ঘরণী ... ধর্ম্মশীলা ছিলেন। ইহা সম্ভব যে, ... তাহার সাধু ... প্রকার বাধা পাইতেন না। উভয়েই ধর্ম্ম বলে বলীয়ান ছিলেন। উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইয়া উভয়েই ভগবানের নিকট হইতে মুক্তি পাইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। প্রকৃত ভক্তের যে ভগবানের উপর জোর আছে, তাহা উভয়েই দেখাইয়াছেন। তুকারাম বলিতেছেন—

"আমার পাওনা আমি চাহিব যখন,
বল হরি কোথা তুমি লুকাবে তখন?
করিয়াছ তুমি দেব যে যে অঙ্গীকার,
সাধুজনগণ দেখ সাক্ষী আছে তার।
বসিব তোমার দ্বারে হয়ে মহাজন। *
আদায় না করে, যেতে দিব না যখন॥"

তু... একস্থলে বলিয়াছেনঃ—

"ধোরেছি কোমর তব, সর্ব্বশক্তিমান!
করিতে অনিষ্ট মম সাধ্য আছে কার?
করিতেছি হে বিঠোক! তোমারে আহ্বান,
ত্বরা করে এস তুমি নিকটে আমার।
অন্যদিকে চাহিবার নাহি প্রয়োজন।
ডাকিলেই আসিবে হে আমার সদন॥"

রামপ্রসাদের জোর এক রকমের জোর—ইহা আদুরে ছেলের জোর। এছেলেকে জগৎ মাতার ফাকি দেওয়া কঠিন। ব্রহ্মময়ীর ছেলে বলে, কখন আপনা আপনি গুমোর করে... পেয়ে কখন যমকে শাসাচ্চেন, আবার প্রার্থিত বস্তু পেতে বিলম্ব দেখে কখন জননীকে সর্ব্বনাশী বলে গালি দিচ্চেন—কখন বা, বাবার কাছে নালিস করবেন বলে ভয় দেখাচ্চেন।

* উত্তমর্ণ।

মনকে মৃত্যুভয়ে ভীত দেখিয়া রামপ্রসাদ বলিতেছেনঃ—

"মন ... ।
... কর মত॥
কর্ত্তী হয়ে ভেবের ভয়, এসে বড় অদ্ভুত।
ওরে তুই করিস্ কি কালের ভয়, হয়ে
ব্রহ্মময়ী সুত?

এক সময়ে রামপ্রসাদ যমের দূতকে বেস দুকথা শুনিয়ে দিলেনঃ—

দূর হয়ে যা যমের ভাটা।
ওরে আমি ব্রহ্মময়ীর বেটা॥
বলগে যা তোর যম রাজারে, আমার মতন
নিছে কটা।
আমি যমের যম হতে পারি, ভাবলে ব্রহ্ম-
ময়ীর ছটা॥
প্রসাদ বলে কালের ভাটা, মুখ সামলায়ে
বলিস্ বেটা।
কালীর নামের জোরে বেঁধে তোরে, সাজা
দিলে রাখবে কেটা॥"

ভব-যন্ত্রণায় ব্যথিত হইয়া রামপ্রসাদ ব্রহ্মময়ীর প্রতি কঠিন কথা প্রয়োগ করিতেছেনঃ—

"জন্ম জন্ম জন্মান্তরে মা কত দুঃখ আমায়
দিলে।
রা... এবার মলে ডাকবো
সর্ব্ব...।"

... তোর ন্যায় রামপ্রসা... কি... বলছেনঃ—

"দেখি মা কেমন করে আমারে ছাড়ায়ে
...।
ছেলের হাতের কলা নয় ... দিয়ে
...তে খাবা॥
এমন চাপান ছাপাইব, মাগো, খুঁজে
খোঁজ নাহি পাবা।

বৎস পাছে গাভী যেমন, তেমনি পাছে
পাছে ধাবা ॥
প্রসাদ বলে ফাকি জুকি, মাগো দিতে
পারো পেলে হাবা।
আমায় যদি না তরাও মা, শিব হবে
তোমার বাবা ॥"

মায়ের আদর পাইতে বিলম্ব হওয়াতে রাম-প্রসাদ বলিতেছেনঃ—

"মা হওয়া কি মুখের কথা।
যদি না বুঝে সন্তানের ব্যথা ॥

* *

সন্তানে কুকর্ম্মকরে,বলে সারে পিতা মাতা।
দেখ কাল প্রচণ্ড করে দণ্ড, তাতে তোমার
হয় না ব্যথা ?
দীন রামপ্রসাদ বলে,এচরিত্র শিখিলে কোথা
যদি বল আপন পিতৃধারা, নাম ধরোনা
জগন্মাতা ॥"

নিজে শাসিয়ে যখন রামপ্রসাদ কিছু করিতে পারিলেন না, তখন মায়ের নামে নালিস করিতে উদ্যত হইলেন।

"তারা আমি নই আটাসে ছেলে।
আমি ভয় করিনে চোক্ রাঙ্গালে ॥
সম্পদ আমার ও রাঙ্গাপদ, শিব ধরে যা
হৃদকমলে।
ওমা আমার বিষয় চাইতে গেলে, বিড়ম্বনা
কতই ছলে ॥
শিবের দলিল সই-মোহরে, রেখেছি হৃদয়ে
তুলে।
এবার করবো নালিশ নাথের আগে,
ডিক্রি লব এক সওয়ালে ॥
জানাইব কেমন ছেলে মোকদ্দমায় দাঁড়াইলে;
যখন গুরুদত্ত দস্তাবেজ গুজরাইব মিছিল
কালে ॥
মায়ে পোয়ে মোকর্দ্দমা, খুব হবে রাম-
প্রসাদ বলে।
আমি ক্ষান্ত হব যখন আমায় শান্ত করে
লবে কোলে ॥

ক্রমশঃ

শ্রীদীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা।

আমরা যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রণাম করি। একমাত্র বঙ্গদেশ ব্যতীত সমস্ত আর্য্যভূমি যাঁহার ব্যবস্থা শাস্ত্র দ্বারা শাসিত হইতেছে, তাঁহার পবিত্র চরণ উদ্দেশে মস্তক নত করিতেছি।

যে সময় প্রাচীন আর্য্যগণ পশ্বাদির মাংস ও সোম রস দ্বারা ইন্দ্রাদি দেবগণের অর্চ্চনা করিতেন এবং তদন্তর সেই দেবপ্রসাদ পান ভক্ষণে উন্মত্ত হইয়া সামগান দ্বারা পঞ্চনদ-বিধৌত প্রদেশ বিমোহিত করিতেন, আর্য্য সমাজের তখন এক চিত্র, বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবর্ত্তক ভারত ক্ষেত্রে সমুদিত হইয়া সেই চিত্র চূর্ণ বিচূর্ণ করিলেন। ব্রাহ্মণগণ বিপ্লবতরঙ্গে হাবুডুবু খাইয়া নূতন সমাজ গঠন করিতে লাগিলেন। বৈদিক সূত্র সমূহের পরিবর্ত্তে নূতন স্মৃতি প্রণীত হইল। ক্রমে ইঁহারা সকলেই

মন্বত্রি বিষ্ণুহারীত যাজ্ঞবল্ক্যোশনোঽঙ্গিরা।
যমাপস্তম্বসম্বর্ত্তাঃ কাত্যায়ন বৃহস্পতী ॥
পরাশরব্যাসশঙ্খ লিখিতাদক্ষগোতমৌ।
শাতাতপোবশিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্র প্রয়োজকাঃ।

ইঁহারা সকলেই ধর্ম্মশাস্ত্র প্রয়োজক বলিয়া খ্যাতি লাভ করিলেন। আমরা ব্যবস্থা

প্রণেতাদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমেই মনুর নাম দেখিতে পাই। প্রকৃত পক্ষেও তিনি সকলের শীর্ষস্থানীয়। তাঁহার মতের বিরুদ্ধে যদি কোন ঋষি কোন মত প্রচার করিয়া থাকেন, তবে কখনই গ্রহণ যোগ্য নহে, ইহা সর্ব্বসাধারণ প্রচলিত কথা। কিন্তু সূক্ষ্মানু-সূক্ষ্মরূপে অনুসন্ধান করিলে, আমরা দেখিতে পাই যে, কোন একটী বিষয়ে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য ভগবান মনু হইতেও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন। মনুপ্রোক্ত দায়ভাগ দ্বারা একমাত্র বঙ্গদেশ শাসিত হইতেছে। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্যের দায়ভাগদ্বারা বঙ্গদেশের পশ্চিম সীমাস্থিত বিহার প্রদেশ হইতে বোম্বাই পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ শাসিত হইতেছে। যে মিতাক্ষরা গ্রন্থ জগদ্বিখ্যাত এবং যাহার দ্বারা বঙ্গ ব্যতীত অন্যান্য স্থানবাসী আর্য্যগণ শাসিত হইতেছেন, সেই মিতাক্ষরা গ্রন্থ যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার এক খানা টীকামাত্র।

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকৃত ধর্ম্মশাস্ত্র তিন অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে উপোদ্‌ঘাত, ব্রহ্মচারি, বেদাভ্যাস, বিবাহ, গর্ভাধান, বর্ণ জাতি বিবেক, গৃহস্থ, আতিথ্য, স্নাতব্রতক, অনধ্যায়, ভক্ষ্যাভক্ষ্য, দ্রব্যশুদ্ধি, দান, শ্রাদ্ধ সপিণ্ডীকরণ, প্রতিপদাদিশ্রাদ্ধফল, গণপতি কল্প, গ্রহশান্তি, রাজধর্ম্ম, ত্রসাবধাদিমান, প্রভৃতি ২০টী প্রকরণে আচার নামক প্রথম অধ্যায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। এই অধ্যায়ে ৩৬৮টী শ্লোক আছে। ব্যবহার নামক দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৩১০টী শ্লোক আছে, ইহাতে ব্যবহারমাতৃকা, ভুক্তি লক্ষণ, ঋণদান, নিক্ষেপ, সাক্ষি, লেখ্য, দিব্য, দায়ভাগ, সীমা বিবাদ, স্বামিপালবিবাদ, অস্বামি বিক্রয়, দত্তাপ্রদানিক, ক্রীতানুশয়, সম্বিদ্ব্যতিক্রম বেতনদান, দ্যূতসমাহ্বয়াখ্য, বাকপারুষ্য, দণ্ডপারুষ্য, সাহস, বিক্রীয় সম্প্রদান, সম্ভূয়সমুত্থান, স্তেয়প্রকরণ, স্ত্রী সংগ্রহণ প্রভৃতি ২৩টী প্রকরণ আছে। প্রায়শ্চিত্ত নামক তৃতীয় অধ্যায়ে ৩৩৪টী শ্লোক আছে। ইহাতে প্রেত নির্ণয়, শোকাপনোদন, নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য আপধর্ম্ম, বানপ্রস্থ, যতি, জীবোৎপত্তি, দেহ বর্ত্তিস্থনাদিসংখ্যা, দেহবর্ত্তিরসাদিমান, আত্মতত্ত্ব আত্মনোজগদুৎপত্তি, আত্মনোস্ত্যাদিযোনিপ্রাপ্তি, যোগপ্রবৃত্ত্যুপায়, অকালমৃত্যু, অর্চ্চিরাদ্যয়নকথন, যোগাভ্যাস বিধি, যোগ সিদ্ধি লক্ষণ, ভুক্তাবশিষ্টপাতকৈর্জন্ম বিশেষ, নরকনামানি, মহাপাতক নিরূপণ, উপপাতক, ব্রহ্মহত্যাদি প্রায়শ্চিত্ত, গোবধাদি প্রায়শ্চিত্ত, প্রকীর্ণক প্রায়শ্চিত্ত, পতিতত্যাগ বিধি, স্ত্রীণাং বিশেষ পতনীয়ানি, গোগ্রাস, রহস্যকৃত পাপ প্রায়শ্চিত্ত, যমনিয়ম, সন্তাপনাদিকৃচ্ছ্রলক্ষণানি, এতচ্ছাস্ত্রাভ্যাস ফল প্রভৃতি ৩৩টী প্রকরণ আছে। পরমহংস পরিব্রাজক বিজ্ঞানেশ্বর এই ধর্ম্মশাস্ত্রের যে ব্যাখ্যা করেন, তাহাই মিতাক্ষরা নামে প্রসিদ্ধ। অস্মদ্দেশীয় উকীলগণ এই মিতাক্ষরাগ্রন্থের কিয়দংশের অনুবাদ মাত্র পাঠ করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আদালতে প্রবেশ করেন। কিন্তু তাঁহারা মূল গ্রন্থের অনুসন্ধান ও করেন না। একি আমাদের দেশের উন্নতি, না অবনতি।

আমরা গৌরবের সহিত উল্লেখ করিতে পারি যে, যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য আমাদের পার্শ্ববর্ত্তী মিথিলা দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সংহিতার আরম্ভেই লিখিত হইয়াছে।

যোগীশ্বরং যাজ্ঞবল্ক্যং সংপূজ্য মুনয়োব্রুবন্।

বর্ণাশ্রমেতরাণাং নো ব্রূহি ধর্ম্মানশেষতঃ ॥
মিথিলাস্থঃ স যোগীন্দ্র ক্ষণং ধ্যাত্বা ব্রবীম্মুনীন্।
যস্মিন্ দেশে মৃগঃকৃষ্ণ তস্মিন্ ধর্ম্মান্নিবোধত ॥

অর্থাৎ, যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্যকে বন্দনা করিয়া মুনিগণ বলিলেন, বর্ণাশ্রম ভেদে ইতর বর্ণের ধর্ম্ম আমাদিগকে বলুন। মিথিলা নিবাসী সেই যোগীন্দ্র ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া মুনিগণকে বলিলেন, যেদেশে কৃষ্ণসার (মৃগ) বিচরণ করে, সেই দেশের ধর্ম্ম শ্রবণ কর।

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য যে কেবল ধর্ম্মশাস্ত্রবক্তা বলিয়া পরিচিত, তাহা নহে, তিনি প্রকৃত পক্ষেই যোগীশ্বর ছিলেন। তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিবার জন্য এক্ষণ আমরা সংহিতা পরিত্যাগ করিয়া অন্যান্য গ্রন্থের আশ্রয় গ্রহণ করিব।

বৈশম্পায়ন ঋষির নিকট যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি তাঁহার দ্বাদশজন শিষ্য যজুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। শুক্ল যজুর্ব্বেদের ভাষ্যকার মহীধর বলেন, কোন কারণ বশত বৈশম্পায়ন যাজ্ঞবল্ক্যের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন "হে যাজ্ঞবল্ক্য! তুমি আমার নিকট যাহা অধ্যয়ন করিয়াছ, তাহা পরিত্যাগ কর।" যাজ্ঞবল্ক্য গুরু বাক্য শ্রবণে নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইয়া, যোগ বলে তাহা উদ্গীরণ করিলেন। তখন বৈশম্পায়ন অন্যান্য শিষ্যগণকে বলিলেন "তোমরা তৈত্তিরীয় পক্ষীর রূপ ধারণ করিয়া সেই পরিত্যক্ত বেদ গ্রহণ কর।" শিষ্যগণ তাহা করিল। যাজ্ঞবল্ক্যের পরিত্যক্ত বেদ মলিন হইয়াছিল, তজ্জন্য তাহা "কৃষ্ণ যজু"নামে খ্যাত হইয়াছে। তৈত্তিরীয় দ্বারা গৃহীত বলিয়া বেদের সেই অংশ তৈত্তিরীয় সংহিতা আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে।

তদনন্তর যাজ্ঞবল্ক্য ভগবান ভাস্করের আরাধনা করিলে, তিনি সন্তুষ্ট হইয়া যাজ্ঞবল্ক্যকে বলিলেন "তুমি বেদ রচনা কর, তাহা শুক্ল যজু নামে খ্যাত হইয়া জনসমাজে সমধিক আদৃত হইবে।" সূর্য্য হইতে বর লাভ করিয়া যাজ্ঞবল্ক্য যে বেদ রচনা করেন, তাহাই শুক্লযজু নামে অভিহিত। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য স্বরচিত বেদ, মাধ্যান্দিন প্রভৃতি তাহার পঞ্চদশজন শিষ্যকে অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। এই শিষ্যবর্গ হইতে শুক্ল যজু সহস্র শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। এতদ্দ্বারা সহজেই অনুমিত হয় যে, যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য শুক্লযজুর্ব্বেদ রচনা করেন।

একদা বিদেহপতি জনক এক বৃহৎ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া বেদবিদ ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন। যথাসময়ে ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন, সমাগত বিপ্রমণ্ডলীকে দর্শন করিয়া জনক চিন্তা করিলেন, ইহাদের মধ্যে প্রকৃত ব্রহ্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ কে? কিরূপে ইহার মীমাংসা করি। অনেক চিন্তার পর বিদেহরাজ একটী নূতন উপায় উদ্ভাবন করিলেন। যজ্ঞস্থানের চতুর্দ্দিকস্থ তোরণস্তম্ভে এক সহস্র গো বন্ধন করিয়া সেই সকলের শৃঙ্গ আড়াই পোয়া স্বর্ণ দ্বারা মণ্ডিত করিয়া বলিলেন; "হে ব্রাহ্মণগণ! যিনি আপনাদিগের মধ্যে ব্রহ্মপরায়ণ, এই গো সকল তিনি দক্ষিণা স্বরূপগ্রহণ করুন," রাজার বাক্য শ্রবণে ব্রাহ্মণগণ সকলেই নীরব হইয়া রহিলেন, তখন মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য সভাস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া ব্রহ্মচর্য্যব্রতধারী শিষ্য সোমশ্রবাকে বলিলেন, "হে সোমশ্রবা! এই সকল গো মুক্ত করিয়া লইয়া যাও।" সোমশ্রবা গুরুর আদেশানুসারে গো সকল লইয়া গমন করিল।

তদ্দর্শনে সভাস্থ ব্রাহ্মণগণ ক্রোধে অধীর হইলেন। জনকের হোতা অশ্বল ঋষি ক্রোধকম্পিতস্বরে তখন বলিলেন, "হে যাজ্ঞবল্ক্য! তুমিই কি আমাদিগের মধ্যে একমাত্র ব্রহ্মপরায়ণ।" যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "না, আমি ব্রহ্মিষ্ঠ নহি। ব্রহ্মিষ্ঠগণকে আমি নমস্কার করি। দক্ষিণার জন্যই যজ্ঞে আসিয়াছি, দক্ষিণা স্বরূপ গোগুলি গ্রহণ করিয়াছি।" তখন অশ্বল ঋষি বলিলেন, "চতুরতার প্রয়োজন নাই, আমাদের সহিত এরূপ বিচারে প্রবৃত্ত হও।" যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, 'যাহা ইচ্ছা প্রশ্নকর।'

অশ্বল বলিলেন, "মৃত্যুদ্বারা আক্রান্ত হইলে কোন যজমান রক্ষা পাইবে?"

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "যিনি যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান দ্বারা ফল সঞ্চয় করিয়াছেন, সেই সৎকর্ম্ম-ফলভোগী যজমানই তাহা হইতে অব্যাহতি লাভ করিবেন।"

আর্ত্তভাগ জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে যাজ্ঞবল্ক্য! বল দেখি, এই শরীরাকাশে কতটীগ্রহ ও অতিগ্রহ আছে।"

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "মানব শরীরে অষ্টগ্রহ ও অতিগ্রহ বর্ত্তমান আছে।"

আর্ত্তভাগ বলিলেন, সেই সকলের গুণ ও নাম উল্লেখ কর, এবং তাহারা কিরূপ নিয়তির অধীন হইয়া ভ্রমণ করিতেছে, তাহা বল।"

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, প্রাণগ্রহ, অপান (বায়ু) অতিগ্রহ, প্রাণ বায়ু অপানের সাহায্যে গন্ধ গ্রহণ করিয়া থাকে। বাক্যগ্রহ, নাম অতিগ্রহ, নামের সাহায্যে বাক্য, বাক্য উচ্চারণ করে। জিহ্বা গ্রহ, রসন, অতিগ্রহ, জিহ্বা রসের সাহায্যে আস্বাদন করে। চক্ষুগ্রহ, রূপ অতিগ্রহ, চক্ষু রূপের সাহায্যে দর্শন করিয়া থাকে। কর্ণগ্রহ, শব্দ অতিগ্রহ, কর্ণ শব্দের সাহায্যে শ্রবণ করিয়া থাকে। মনগ্রহ, কামনা অতিগ্রহ, মন কামনার সাহায্যে মনন করিয়া থাকে। হস্তগ্রহ, কর্ম্ম অতিগ্রহ, হস্ত কর্ম্মের সাহায্যে কার্য্য করে। ত্বকগ্রহ, স্পর্শ অতিগ্রহ স্পর্শের সাহায্যে ত্বক স্পর্শ অনুভব করে। ইত্যাদি।

কুশিত নন্দন কোহলক ঋষি বলিলেন, "হে যাজ্ঞবল্ক্য, কোন্ আত্মা অন্তর্যামী? সাক্ষাৎ আত্মা কি পরোক্ষ আত্মা? অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে কোনটী অন্তর্য্যামী আত্মা। এবং তাহাকে কি প্রকারেই বা জানা যায়।"

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, যিনি ক্ষুধা, তৃষ্ণার বশীভূত নহেন, শোক, মোহ, জরামৃত্যু যাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, তিনিই অন্তর্যামী, যিনি বায়ুতে বায়ুর প্রাণ রূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন, বায়ু যাহার শরীর, অথচ সেই বায়ুও যাহাকে জানিতে পারে না, তিনিই অন্তর্য্যামী। যিনি সূর্য্যের প্রাণরূপে সূর্য্যেতে বর্ত্তমান রহিয়াছেন, অথচ সূর্য্য যাহাকে জানে না, সূর্য্যই যাঁহার শরীর তিনিই অন্তর্য্যামী। আকাশে বর্ত্তমান থাকিয়া যিনি আকাশের প্রাণ রূপ হইয়াছেন, আকাশই যাঁহার শরীর, অথচ আকাশ যাঁহাকে জানে না, তিনিই অন্তর্য্যামী। ইত্যাদি।

অতঃপর ঋষি তনয়া গার্গী সমবেত সভ্যগণকে বলিলেন, "ব্রাহ্মণগণ! আমি যাজ্ঞবল্ক্যকে দুইটী প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা করি, যদি তিনি তাহার উত্তর দিতে পারেন, তাহা হইলে কোন ব্রহ্মবাদীই তাঁহাকে পরাজয় করিতে সক্ষম হইবেন না।"

ধন্য প্রাচীন আর্য্য সমাজ, যে সমাজে

পুত্র কন্যাকে সমভাবে বিদ্যাশিক্ষা দানে কোন রূপ প্রতিবন্ধক ছিল না। কোন মূঢ় সেই সমাজের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করিতে পারে? আমরা কি সেই আর্য্য সন্তান, এ সমাজ কি সেই সমাজ? এ যে তাহার বিকৃত ও ঘৃণিত ছায়া মাত্র। যাহারা বর্ত্তমান সময়ের স্ত্রীশিক্ষার প্রতি কটাক্ষ করিয়া গ্রন্থ রচনা ও অভিনয় দ্বারা বাহবা লইবার জন্য লালায়িত, তাহারা কি সেই আর্য্য-কুলের কুলাঙ্গার নহে? হায়! এ হতভাগা জাতি কবে প্রাচীন গ্রন্থ সমূহ আলোচনা করিয়া বর্ত্তমান বিকৃত সমাজ সংশোধন করিতে সক্ষম হইবে। কবে আমরা বঙ্গের সর্ব্বনাশকারী অপদেবতাদিগের পরিবর্ত্তে মনু, অত্রি, বিষ্ণুহারীত, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ঋষি-গণকে বঙ্গের সিংহাসনে দেখিতে পাইব। কবে শনির পরিবর্ত্তে বৃহস্পতি বঙ্গের সিংহা-সন উজ্জ্বল করিবেন। কবে রামদাস, শ্যাম-দাস, ব্রজবিলাস ভট্টাচার্য্যের পরিবর্ত্তে, বঙ্গ-বাসী ভগবান পরাশরকে পূজা করিবে।

ব্রাহ্মণগণ গার্গীর বাক্য শ্রবণ করিয়া, সহর্ষে বলিলেন "গার্গি! তোমার প্রশ্ন উপস্থিত কর।" তখন গার্গী যাজ্ঞবল্ক্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "যেমন বিদেহ ও কাশীদেশীয় ক্ষত্রিয়গণ ধনুতে জ্যা সংযুক্ত করিয়া যুগপৎ দুইটী শর যোজনা করিয়া শত্রুর প্রতীক্ষা করে, সেইরূপ আমিও জিজ্ঞাসে দুইটী প্রশ্ন করিয়া তোমার প্রতীক্ষা করিতেছি, তুমি আমার বাণরূপ প্রশ্নদ্বয় ধারণ ও তাহার উত্তর প্রদান করিতে অগ্রসর হও। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হে গার্গি! তুমি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর। গার্গী বলিলেন, এই যে উর্দ্ধে দৃশ্যমান্ আকাশ ও এই পৃথিবী এবং পৃথিবীর মধ্যস্থ প্রভৃতি স্থান সকল, কোন্ পদার্থ দ্বারা পূর্ণ রহিয়াছে। পৃথিবী ও আকাশের সংযোগ, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান ও অতীত কালই বা কোন্ পদার্থ দ্বারা ওতঃ-প্রোতভাবে পরিপূর্ণ রহিয়াছে।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "এই সকল স্থান ও কাল একমাত্র মহাকাশ দ্বারা পূর্ণ রহি-য়াছে।"

গার্গী বলিলেন হে যোগীশ্বর! আমি আপনার যুক্তিগর্ভ উত্তরে অনুগৃহীতা হই-লাম। আমি আপনাকে প্রণাম করিতেছি। আপনি আমার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর প্রদান করুন।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, জিজ্ঞাসা কর।

গার্গী বলিলেন, আপনি বলিয়াছেন, পৃথিবীর অধ, উর্দ্ধ ও উভয়ের সংযোগ স্থান এবং ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান মহাকাশ দ্বারা পরিপূর্ণ। ভাল, এক্ষণ জিজ্ঞাস্য এই যে, সেই মহাকাশ কাহার দ্বারা পূর্ণ।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন "এসমস্তই অক্ষয় পুরুষ দ্বারা পরিপূর্ণ। ব্রাহ্মণেরা বলিয়া থাকেন, সেই অক্ষয় পুরুষ স্থূল বা অনু নহেন, তিনি জড় পদার্থের ন্যায় সঙ্কীর্ণ কিম্বা বিস্তৃত নহেন, তিনি বর্ণ ও ইন্দ্রিয়াদি বর্জ্জিত, তাঁহার প্রাণ নাই, তাঁহার মুখ নাই, তিনি কিছু আহার করেন না। তাঁহাকেও কেহ কিছু করিতে পারে না। হে গার্গি, সেই অক্ষয় পুরুষের শাসনে চন্দ্রসূর্য্য নিয়মিত হইতেছে, তাঁহারই শাসনে পৃথিবী স্থির ভাবে থাকিয়া লোক সকলকে ধারণ করিতে সক্ষম হইতেছে, পশ্চিম বাহিনী নদী সকল প্রবাহিত হইয়া পৃথিবীকে অভিষিক্ত করিয়াছে। যিনি সেই অক্ষয় পুরুষকে না জানিয়া হোম, যজ্ঞ অথবা বহুবর্ষব্যাপী তপস্যা করেন, তাঁহার অনুষ্ঠিত সমস্ত কর্ম্মই ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায়

নিষ্ফল হইয়া যায়। যে ব্যক্তি সেই অক্ষর পুরুষকে অবগত হইয়া ইহলোক হইতে পরলোকে গমন করেন সেই ব্রাহ্মণ যিনি তাঁহাকে জানিতে অভিলাষ করেন, তিনি স্বতই তাঁহার নিকট প্রকাশিত হন। হে গার্গি! তাঁহার দ্বারাই এই মহাকাশ ওতঃ-প্রোত ভাবে পরিপূর্ণ রহিয়াছে।"

তখন গার্গী ব্রাহ্মণগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আর বিচারের প্রয়োজন নাই, কেহই তাঁহাকে পরাজয় করিতে পারিবে না। যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট মস্তক অবনত করিয়া আপনাদিগকে সম্মানিত কর। শুক্লযজুর্ব্বেদান্তর্গত বৃহদারণ্যক উপনিষদ হইতে যাজ্ঞবল্ক্যের জীবনী ও তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ক অনেক কথা উদ্ধৃত করা যাইতে পারে, কিন্তু আমরা তাহা হইতে বিরত থাকিয়া কেবল আর একটী বিষয় অর্থাৎ মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদ সংক্ষেপে বিবৃত করিব।

অথাহ যাজ্ঞবল্ক্যস্য দ্বে ভার্য্যে বভূবতুঃ মৈত্রেয়ী কাত্যায়নী চ তয়োর্হ মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবাদিনী বভূব স্ত্রী প্রজ্ঞৈব তর্হি কাত্যায়নী।

যাজ্ঞবল্ক্যের দুই পত্নী ছিল, মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী। মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবাদিনী ও কাত্যায়নী স্ত্রীপ্রজ্ঞা অর্থাৎ স্ত্রীজনোচিত গৃহকার্য্যে নিপুণা। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইয়া জ্যেষ্ঠাপত্নীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হে মৈত্রেয়ি! আমি গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ করিব। যদি তোমার বাসনা হয়, তবে কাত্যায়নীর সহিত ধনের বিভাগ করিয়া তোমাকে পৃথক করিয়া দি।"

মৈত্রেয়ী জিজ্ঞাসিলেন, ভগবন্! যদি ধনপূর্ণ সমুদয় পৃথিবী আমার হয়, তবে ধনসাধ্য ক্রিয়া দ্বারা আমি নির্ব্বাণ পদ লাভ করিতে পারিব কি না?

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "না, ধনের দ্বারা তাহা হয় না, অন্যান্য বিষয়ভোগী ব্যক্তিদিগের জীবন যেরূপ হইয়া থাকে, তোমার জীবনও সেইরূপই হইবেক, ধনদ্বারা মোক্ষের আশা মাত্র নাই।"

তখন মৈত্রেয়ী বলিলেন, "ভগবন্! যে ধনের দ্বারা আমার মুক্তির আশা নাই, সেই ধনে আমার প্রয়োজন কি? মহাশয়, যাহাকে মুক্তির সাধন বলিয়া জানেন, তাহাই আমাকে বলুন।"

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হে মৈত্রেয়ি! তুমি স্বভাবতই আমার প্রিয়, এইক্ষণে এই প্রিয় বাক্য বলিয়া আরও অধিক প্রিয়তমা হইলে। তোমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতেছি, মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ কর। প্রত্যক্ষ দেখ, পত্নী হইতে শুশ্রূষা, গার্হস্থ্য ধর্ম্মে অধিকার ইত্যাদি জন্য পতি পত্নীর প্রিয় হন না। উত্তম বস্ত্র অলঙ্কারাদি পরিধান করিব, আপন অভিলাষানুসারে সুখে থাকিব, এই অভিলাষেই পতি পত্নীর প্রিয় হন, ইহার অন্যথা হইলে আর সে ভাব থাকে না। সেইরূপ আপন উপকারক সুখাভিলাষেই পত্নী ও পতির প্রিয় হইয়া থাকে, পত্নী পতির সুখাভিলাষের বিপরীত হইলে, আর প্রিয় থাকে না, বরং ত্যাজ্যা অথবা বধ্যা হইয়া থাকে।

তৎপর মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য, পুত্র, বিত্ত, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, লোক সকল, দেবতা, বেদ, যজ্ঞ, বস্তু প্রভৃতি সম্বন্ধে বলিতেছেন।

ন বা অরে পুত্রাণাং কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি আত্মনস্তু কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি।

ন বা অরে বিত্তস্য কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবতি আত্মনস্তু কামায় বিত্তং প্রিয়ম্ভবতি।

ন বা অরে ব্রাহ্মণঃ কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবতি আত্মনস্তু কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবতি।

ন বা ক্ষত্রস্ত কামায় ক্ষত্রং প্রিয়ং ভবতি আত্মনস্তু কামায় ক্ষত্রং প্রিয়ং ভবতি।

ন বা অরে লোকানাং কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্তি আত্মনস্তু কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্তি।

ন বা অরে দেবানাং কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবন্তি আত্মনস্তু কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবন্তি।

ন বা অরে বেদানাং কামায় বেদাঃ প্রিয়া ভবন্তি আত্মনস্তু কামায় বেদাঃ প্রিয়া ভবন্তি।

ন বা অরে যজ্ঞানাং কামায় যজ্ঞাঃ প্রিয়া ভবন্তি আত্মনস্তু কামায় যজ্ঞাঃ প্রিয়া ভবন্তি।

ন বা অরে সর্ব্বস্ত কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি।

এই সকল শ্রুতির তাৎপর্য্য ইহাই প্রতীত হয় যে, আত্মাই যথার্থ প্রিয়, আত্মা অপেক্ষা কেহ প্রিয় নাই, অন্য সকলই আত্মার অভিলাষ অনুসারে প্রিয় হইয়া থাকে।

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য পুনর্ব্বার বলিতেছেন, হে মৈত্রেয়ি! পরমাত্মার সাক্ষাৎ লাভ করা কর্ত্তব্য, তাহার উপায় প্রথমতঃ বেদ শ্রবণ, তৎপর যুক্তির দ্বারা বেদার্থের মনন, তাহার পর নিদিধ্যাসন, এই সকল উপায়ে যিনি পরমাত্মার সাক্ষাৎলাভ করেন, তিনিই সর্ব্ববিদ হইয়া থাকেন।

শুক্লযজুর্ব্বেদ ও সংহিতা প্রণেতা যাজ্ঞবল্ক্য প্রকৃত যোগীশ্বর। আমরা সংহিতা সম্বন্ধে কিছু লিখিলাম না। সকলেই এই অমূল্য গ্রন্থ পাঠ করেন, ইহাই আমাদের ইচ্ছা। প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র গুলি আমাদের অমূল্য পৈত্রিক সম্পত্তি। সুসভ্য ইয়োরোপবাসিগণ গ্রীশ, রোমের যতই গৌরব করুন না কেন, কোন দেশেই এইরূপ ধর্ম্মশাস্ত্র লিখিত হয় নাই। অনেক দেশেই আইন (Law) ছিল, কিন্তু প্রাচীন আর্য্যগণ ব্যতীত অন্য কেহই বিধিকে ধর্ম্মের সহিত সংযুক্ত করিতে সক্ষম হয় নাই।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।

স্বার্থ, স্বত্ব ও প্রেম।

যে ব্যক্তি পরের শুভাশুভ, সুখ দুঃখের প্রতি উদাসীন হইয়া, কেবল নিজেরই সুখ ও নিজেরই কল্যাণ কামনায় জীবন ধারণ করে ও তদ্বিষয়েই লক্ষ্য রাখিয়া সকল কার্য্য করিয়া থাকে, তাহাকেই "স্বার্থপর" এই নিন্দাই উপাধি দান করা হয়। অদ্য উনবিংশ শতাব্দীর সভ্য জগতে স্বার্থপর মানবের যেরূপ নিন্দা, সেরূপ আর অধিক দেখা যায় না। দশ জন একত্র সমবেত হইলে, তাহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অগ্রে আপনার সুখ ও সুবিধা অন্বেষণ করে, সে ঘৃণিত। অধীনস্থ পরিজন বর্গের মঙ্গলের দিকে কল্পনা রাখিয়া, যে গৃহস্বামী অহোরাত্র কেবল নিজের ইন্দ্রিয় সুখের জন্যই ব্যাকুল, সভ্য জগৎ তাহাকে বড় নিন্দা করে। তদ্রূপ যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক না কেন, যেখানে কেহ অপরের প্রতি উপেক্ষা করিয়া নিজ অভীষ্ট সিদ্ধির উপায় চিন্তনে ব্যস্ত, সেখানেই তিনি ভদ্র লোকদিগের ঘৃণা ও নিন্দার ভাজন হইয়া থাকেন, ইহার কারণ কি?

স্বার্থপরতা যে এত ঘৃণিত, ইহার তাৎপর্য্য এই যে, উহা মানবের স্বাভাবিক ধর্ম্মের বিরুদ্ধ। মানব যে সকল গুণে ইতর প্রাণী-

জন্ম প্রাণ পর্য্যন্ত সমর্পণ করিয়া, আত্মবিস্মৃত হইয়া, সমাজ সংস্কার সাগরে ঝাঁপ দিয়া ইহজীবন কাটাইয়া গেলেন ;—তথাপি সমাজ যাহা তাহাই রহিয়া গেল। তাঁহারা বাহিরের দু একটা ভগ্নশাখা ছিন্ন করিলেন মাত্র। বাহিরের দু চারিটা কুরীতি, কুসংস্কার দূর করিতেই হয়ত তাঁহাদের সমস্ত ক্ষমতা পর্য্যবসিত হইল, সমগ্র মানব সমাজরূপ বিশাল তরুবরের রস ও মজ্জা শোষণকারী এই স্বার্থরূপ কণ্টকময় আগাছার কিছুই করিতে পারিলেন না। উহা সমাজকে একই ভাবে শ্রীভ্রষ্ট ও কদর্য্য করিয়া ফেলিতে লাগিল। বস্তুত এই স্বার্থের শাসন হইতে সমাজকে উদ্ধার করাই সকল সংস্কারকের একমাত্র লক্ষ্য চিরকাল হইয়া আসিতেছে। অথচ আজিও ইহাঁরা কিছুই করিতে সমর্থ হন নাই।

সর্ব্বপ্রকার সংস্কার কার্য্যেই প্রতিবন্ধক, এই স্বার্থপরতা। যে দিকে যাও, উন্নতি লাভ করিতে গেলে, নীচতা ছাড়িতে হইবেই হইবে। এই নীচতাটুকু ছাড়িয়া উঠিতে গেলেই স্বার্থ মানুষের হাত ধরিয়া টানে, ও জ্ঞান বা ধর্ম্মবলে অধিকতর বলীয়ান্ না হইলে, অবশেষে তাহাকে ধরাশায়ী করিয়া তবে ছাড়ে। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশের রাজনৈতিক অবস্থা যে ঘোর শোচনীয়, তাহা কে অস্বীকার করিবে ? এবং ইহার সংস্কারের জন্ত যে জনসাধারণের সুশিক্ষা আবশ্যক, তাহাই বা কে না অবগত আছে ? তথাপি বলুন দেখি, কয় জন লোক আপনাদের সুখ ও সুবিধা বিসর্জ্জন দিয়া এক প্রাণে এই মহাব্রতে ব্রতী হইতে প্রস্তুত ? সেও ত অনেক দূরের কথা ;— যদিও কোন লোক যথার্থ সরল প্রাণে, এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করেন, তথাপি কয়জন লোক নিজ নিজ উপার্জ্জিত বা উত্তরাধিকৃত অর্থরাশির শতাংশের একাংশ দিয়া এই শুভ কর্ম্মে সহায়তা করিতে অগ্রসর হন ? সরল প্রাণে যে সকল যুবাপুরুষ পাঠাবস্থায় মহা উৎসাহপূর্ণ আস্ফালন ও বক্তৃতায় বিদ্যালয় গৃহ কম্পিত করিতেন, আজ তাঁহাদের কাহাকেও নিভৃতে লইয়া গিয়া, যদি জিজ্ঞাসা করি, "ভাই ! তোমার সেই সমস্ত উন্নতির পরামর্শ এখন কে ভুলাইয়া দিল ?"—তাহা হইলে তিনি কি উত্তর দিবেন ?—"স্ত্রী পুত্র, বৃদ্ধ পিতা মাতা, আর নিজের ও সুখ সুবিধা দেখিতে হয় ; কাজেই আর সে সব যৌবন সুলভ উত্তেজিত মস্তিষ্কের কল্পনাপ্রসূত ও বন্ধুদিগের প্রশংসা লাভের প্রবল ইচ্ছাসম্ভূত বিষয়ে এখন আর মন প্রাণ তৃপ্ত হয় না। যা হবার তাই হবে, মাঝখান থেকে কেন বোকার মত আমি তুমি নিজের সুখটা নষ্ট করি।" এইরূপ কোন উত্তর নিশ্চয়ই পাওয়া যাইবে। সহজ সরল কথায় বলিতে গেলে—স্বার্থই ইহাঁর সেই সমস্ত উন্নত ও মহান্ ভাবের পথে অন্তরায়। এক সময়ে পরের দুঃখে তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়াছিল, তাই তখন এ সব ভাল ভাল ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার কামনা মনে হইত। আজ স্বার্থের মোহিনী শক্তিতে তাঁহার প্রাণ মুগ্ধ, ক্ষুধা তৃষ্ণার সময়ে নিজ গৃহের আদরের অন্ন জলের কথা মনে পড়িয়া, পর্য্যটকের পথক্লেশ তাঁহার চক্ষে ভীষণ প্রতীয়মান হইতেছে। যদি রোগ হয়, কে তখন পার্শ্বে বসিয়া প্রিয়তমা পত্নীর মত সেবা করিবে, এই চিন্তায় যাহার হৃদয় আকুল, সে কি কখন দেশ হিত ব্রতে ব্রতী

হইতে পারে? নিজের সুখ স্বচ্ছন্দে আহার বিহারই যাহার চিন্তার একমাত্র বিষয়, সে কিরূপে বুঝিবে যে, স্বার্থত্যাগেই পরম সুখ? তাই আজ শত সহস্র তেজস্বিনী বক্তৃতাও স্বার্থ মোহ-নিদ্রিত ভারত সন্তান-দিগকে জাগরিত করিতে পারিতেছে না। উপদেশ শুনিয়া বা দিয়া কেহ কখনও দেশহিতৈষী হয় নাই, স্বার্থপরতাকে প্রাণ হইতে সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মূল করিতে না পারিলে, শত শত বক্তৃতা ও উপদেশের মূল্য এক কপর্দ্দকও নহে।

সত্য কথা—মনুষ্যসমাজ আজিও স্বার্থপরতাশূন্য হইতে পারে নাই। তাই সমাজের এত দুর্গতি। তবে, এই টুকু হইয়াছে, স্বাভাবিক ক্রমোন্নতির গুণে এই টুকু শুভলক্ষণ দেখা দিয়াছে যে, মানব এখন ব্যক্তিগত স্বার্থপরতাকে ঘৃণা করিতে শিখিয়াছে। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, দশ জন ভদ্র লোক একত্র হইলে, যদি তন্মধ্যে কেহ নিজের সুবিধা অগ্রে চায়, তবে নিশ্চয়ই সে নিন্দিত হইবে। ব্যক্তি-গত চরিত্রে স্বার্থ নিন্দনীয় বলিয়া বিবেচিত হইতেছে, ইহা একটী পরম শুভলক্ষণ, এজন্য অবশ্যই মানবজাতির প্রশংসা ও গৌরব করা যায়। কিন্তু তাহাতেই নিশ্চিন্ত থাকা কোনক্রমে বিধেয় নহে। এখনও সামা-জিক বা জাতিগত জীবনে মানুষ যথেষ্ট স্বার্থপর আছে, দেখা যায়। জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ বিগ্রহ, মনান্তর ও বিরোধ কি লইয়া হয়? অনুসন্ধান করিলেই দেখা যাইবে যে, সে সমুদায়েরই মূলে সামাজিক বা জাতিগত স্বার্থ বর্ত্তমান। একই সমাজে আবার, প্লীবিয়ান্ পেট্রিশিয়ান্দের ন্যায় লর্ডস্ ও কমন্স্, ধনী দরিদ্র, ব্রাহ্মণ শূদ্র, সবল দুর্ব্বল প্রভৃতির কতই পার্থক্য! বিশেষতঃ পুরুষ ও রমণীর মধ্যে সুখ ও সুবিধা বিষয়ে আজিও কি ভয়ানক বৈষম্য বর্ত্তমান রহি-য়াছে, তাহা চিন্তা করিতে করিতে মানব সমাজকে ঘোর পক্ষপাতী ও স্বার্থপর দানব-দল বলিয়া ভ্রম হয়।

স্বার্থ যদি মানবের স্বভাব ধর্ম্মের বিরোধী, তবে আজিও, এই সভ্যতাভি-মানী ও জ্ঞানস্পর্দ্ধান্বিত উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগেও উহার এত প্রাধান্য কেন? এই কঠিন সমস্যার মীমাংসা করা আবশ্যক। এক দলের লোক আছেন, তাঁহাদের মতে স্বার্থ মানব মাত্রের জীবনে নিন্দার্হ হই-লেও, সমাজে নিন্দা বা লজ্জার বিষয় নহে। তাঁহারা গৌরবের সহিত বলেন, ঘরের মধ্যে আমরা পরস্পর সাহায্য করিব, এক জন আর এক জনের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত সমর্পণ করিব, কিন্তু জাতীয় গৌরব রক্ষা বা জাতীয় সম্মান ও তেজ পরিবর্দ্ধনের জন্য যদি অপর জাতির সর্ব্বনাশ করিতে হয়, তাহাতে পরা-ঙ্মুখ হইয়া, কখনও কাপুরুষতা দেখাইব না। তোমার অঙ্গাবরণের অভাব হইলে, আমার বৃহৎ কোট অম্লানবদনে খুলিয়া তোমাকে দিব, কিন্তু পার্শ্বস্থ ব্রহ্মদেশ দুর্ব্বল জানিতে পারিলেই, সামান্য কারণে বা অকারণেই কোন নিরর্থক সূত্র অবলম্বনে, তাহার সর্ব্ব-নাশ করিতে কুণ্ঠিত হইব না। একজন দস্যুকে ধরিতে পারিলে, তাহাকে ফাঁসি-কাষ্ঠে লম্বমান করিয়া তাহার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব, কিন্তু দস্যুরাজাগ্রগণ্য আলেক্জাণ্ডারকে "দিগ্রেট" উপাধিদ্বারা ভূষিত করিয়া, ইতিহাসের বরণীয় করিয়া তুলিব। এক জাতি স্বার্থ-সাধনোদ্দেশে অপর জাতির সর্ব্বস্বাপহরণ

করিতে হয় করুক, সে ন্যায্য, কিন্তু ব্যক্তি-বিশেষ অপর কাহারও অনিষ্ট করিয়া সুখী হইলে অপরাধী। তাঁহাদের মতে এক প্রজা অপর প্রজার একটী কদলী বৃক্ষ অধিকার করিলে রাজদ্বারে দণ্ডিত হউক, কিন্তু জমীদার মহাশয় তাহার মত শত শত প্রজার সর্ব্বস্বান্ত করিয়া আপনার অশ্বশালা ও হস্তিশালার ব্যয় নির্ব্বাহ করিলেও উহা ন্যায় সঙ্গত। এই শ্রেণীর লোকেরা মনে করেন যে, ব্যক্তিগত জীবন ও সামাজিক জীবনে কোন সম্বন্ধ নাই, একটী অপরটীর উপর একটুও নির্ভর করে না। ইহার মত ভ্রান্ত মত আর কি হইতে পারে? বাড়ীটী পাকা হওয়া চাই, অথচ এক এক খানি ইষ্টক পাকা হউক না হউক, এ কথা বলা যেমন অসঙ্গত, উপরোক্ত মতও তেমনি। তাঁহারা সমাজকে মন্দ করিয়া, ব্যক্তিকে ভাল রাখিতে চান;—জানেন না যে, এরূপ করা অসম্ভব। ব্যক্তি মাত্রে মন্দ হইলে সমাজ যেমন মন্দ না হইয়া, থাকিতে পারে না, ব্যক্তিগণ সেইরূপ ভাল থাকিলে, সমাজও কখন স্বার্থপর হইতে পারে না। কেন না, সমাজ ব্যক্তি সমূহের সমষ্টি বৈত নয়? সুতরাং ঐ শ্রেণীর লোকদিগের মত যে ভ্রান্ত তাহাতে আর সংশয় নাই। তথাপি ইহা নিশ্চয়ই সত্য কথা যে, ব্যক্তিগত জীবনে স্বার্থপরতা নিন্দনীয় হইলেও জাতীয় জীবনে তাহার নিন্দনীয়তা তাদৃশ স্পষ্ট অনুভূত হয় না।

ইহার কারণ তবে কি? একটু ধীরভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, ইহার মধ্যে শুভলক্ষণই দেখা যাইতেছে। এক সময়ে মানুষ ঘোর স্বার্থপর ছিল, মনুষ্যসমাজও তখন ভয়ানক স্বার্থপর ছিল। ভিন্নদলের লোককে বিনাশ করিয়া ভক্ষণ করাই তদানীন্তন সামাজিক নীতি ছিল। আজিও আফ্রিকা মহাদেশের তিমিরাচ্ছন্ন অসভ্য জাতিদের মধ্যে এ বীভৎস প্রথা বিরল নহে। সেই ঘোর অন্ধকারময় স্বার্থের গহ্বর হইতে, মানুষ যে এতাদৃশ উন্নতি করিতে সমর্থ হইয়াছেন, ইহা কি কম আনন্দের বিষয়? আমাদের পূজনীয় আর্য্যজাতির মধ্যেও সেকালে স্বার্থপরতার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। সে সকল এখন নাই। তদ্ভিন্ন শ্রমবিভাগ, বিনিময় প্রভৃতি কত সুপ্রথা এখন প্রচলিত হইয়াছে। তাহাদের দ্বারা কি সুস্পষ্ট প্রমাণ হয় না যে, প্রাথমিক অবস্থা অপেক্ষা বর্ত্তমান কয়েক সহস্র বৎসরের মধ্যে "স্বার্থ" শব্দটী ক্রমশ নিন্দার্হ হইয়া পড়িয়াছে, এবং পরস্পরকে জীবন ধারণে ও সুখবর্দ্ধনে সহায়তা করাই মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ অধিকার বলিয়া পরিচিত হইয়াছে? ইহা নিতান্তই সুখের বিষয়, সন্দেহ নাই। যাহারা জগতে কেবল দুঃখের জিনিষ ও শোকের কারণ দেখিয়া নিয়ত অন্ধকার গৃহে বসিয়া অশ্রুবর্ষণ করেন, তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ নাই। যাঁহারা অতীতের অপরিজ্ঞাত তমসাচ্ছন্ন প্রদেশে কল্পিত সত্যযুগ দর্শন করিয়া ক্ষোভ করেন যে, কেন তাঁহারা কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন নাই, তাঁহাদের মতের সহিতও আমাদের কোন সহানুভূতি নাই। আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি, মানবজাতিকে, কে যেন হাতে ধরিয়া তুলিতেছে। তথাপি কেন ব্যক্তিগত উন্নতির সঙ্গে সামাজিক ব্যাধি দূর হয় না? ব্যক্তি-বিশেষের স্বার্থপরতা দূষণীয় হইলেও সামা-

ভিক দোষ ধরা হয়না কেন? তাহার উত্তর এই যে, অগ্রে ব্যক্তি, পরে ক্রমশ সমাজ। আগে ব্যক্তিগত জীবনে সংস্কার আরম্ভ হয়। পরে ঐ উন্নতি ক্রমে সংক্রামিত হইয়া সমাজের গঠন পরিবর্ত্তন করিয়া দেয়। এই কারণেই অনেক স্থলে দেখা যায় যে, সমাজ আজিও যে মত গ্রহণ করে নাই, ব্যক্তিগণের মধ্যে হয়ত অনেকেই সেই মত অবলম্বন করিয়া জীবন গঠনে নিযুক্ত হইয়াছেন। অবশেষে তাঁহাদের দলপুষ্টি হইলে পর সমাজ সংস্কার আরম্ভ হয়।

সুতরাং মানবসমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় ভীত হইবার কোন কারণ নাই। প্রত্যেক ব্যক্তির কর্ত্তব্য এই যে, নিজ নিজ জীবনকে স্বার্থের গ্রাস হইতে মুক্ত রাখেন। তাহা-হইলে সমাজ আপনিই ক্রমশ কালে স্বার্থ-পরতাশূন্য হইয়া, কাজেকাজেই নিজেও নিঃস্বার্থ হইবে।

ব্যক্তিগত জীবনে যেমন একদিকে স্বার্থের লোপ পাইবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে, তেমনি কিন্তু অপর দিকে দেখিতে পাই, আর একটী কথার সৃষ্টি হইয়া পড়িয়াছে। সেটী যদিও "স্বার্থ" কথাটীর মত নিন্দিত নয়, যদি ও উহা এ পর্য্যন্ত জনসাধারণের আদর ও আশ্রয় লাভ করিয়া আসিতেছে,—তথাপি যে সমস্ত নিয়মের বলে প্রাচীনতম রাজা (স্বার্থ) আজ রাজ্যচ্যুত হইতেছেন, আমরা দিব্য-চক্ষে দেখিতেছি যে,সেই অখণ্ড ক্রমোন্নতির নিয়মেই এই অভিনব প্রভুও মানবহৃদয়ের অধিকারচ্যুত হইবেন, তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ করিনা। ইহার নাম "স্বত্ব" (Right)। ইহা নামে স্বতন্ত্র হইলেও বস্তুত স্বার্থেরই স্থূলতা নামান্তর মাত্র। তবে একটু প্রভেদ এই যে, ইহার সিংহাসন নীতির ভিত্তির উপর সংস্থাপিত। নীতির উপর স্থাপিত যে স্বার্থ, তাহারই নাম "স্বত্ব"। এই স্বত্ব কথাটী স্বার্থের উপর যত জয়লাভ করিতেছে, ততই পৃথিবী হইতে অত্যাচার ও উৎপীড়ন দূর হইবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। স্বার্থ এখন কেবল রাজনীতি ও সমাজনীতির সভাগৃহে আদর পাইতেছে, কিন্তু সমাজের নিম্নের স্তর সমূহে বর্ত্তমান সময়ে স্বত্বের অধিকার ক্রমশ সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে। স্বাধীনতার ভাব চারি দিকে যতই বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িতেছে, ততই স্বার্থের মস্তকোপরি পদাঘাত করিয়া হাউয়ার্ড, রোমিলী, হ্যামডেন্ ও ওয়াসিংটন্ আবির্ভূত হইয়া স্বত্বের জয়পতাকা উড্ডীন করিয়া দুর্ব্বলকে বল দিতেছেন, ভীরুকে সাহসী করিতেছেন, এবং উৎপীড়িতকে আশ্বস্ত ও অত্যাচারিকে সান্ত্বনা করিতেছেন। মানবের ব্যক্তিগত মহত্ব যতই প্রকাশিত হইতেছে, ততই দিন দিন নব নব উৎসাহে মাতিয়া জগৎবাসীগণ স্বার্থের প্রাচীন বন্ধনরজ্জু ছিন্ন ভিন্ন করিতেছে। এমন কি, ক্রমশ রমনীগণও তাঁহাদের ন্যায্য অধিকার লাভে দণ্ডায়মানা হইয়া, "স্বত্ব স্বত্ব" বলিয়া ঘোর কোলাহল উত্থিত করিতেছেন। কেহই আর নিদ্রিত নাই। স্বার্থের মোহ, স্বাধীনভাবের পদাঘাতে দূর হইয়াছে, এখন তাই চারিদিকে কেবল "স্বত্ব" ও অধিকার লাভের ঘোর কোলাহল-ধ্বনি শ্রুত হইতেছে। ইতিমধ্যেই সমাজের দ্বারে পর্য্যন্ত গিয়া আঘাত পঁহুছিয়াছে। ফরাসী বিপ্লবের বিভীষিকাময় লোমহর্ষণ ব্যাপারে জাতি ও সমাজ সমূহেরও চেতনা

হইয়াছে। একটু একটু করিয়া তাহারাও ভয়ে ভয়ে স্বার্থের পরিবর্ত্তে "স্বত্ব" নাম গ্রহণ করিয়া চলিয়াছে। ফলত, উহা কার্য্যে সে পরিমাণে পরিমিত হয় নাই। তথাপি, নামটীও যে একটু শুভচিহ্ন, তাহার সন্দেহ কি?

আমরা দেখিলাম যে, এক্ষণে স্বার্থ নামের পরিবর্ত্তে "স্বত্ব" এই নামটীই অনেক স্থলে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু এ উভয়ই যে কার্য্যত প্রায় অভিন্নাত্মক তাহা প্রমাণ করিতেই হইবে না। "স্বত্ব" এই নৈতিক নাম গৃহীত হইয়া অবধি, কয়টী কার্য্য বাস্তবিক নৈতিক সুনিয়মানুসারে অনুষ্ঠিত হইয়াছে? নিতান্তই অল্প। প্রায়ই দেখা যায়, যাহা আমার স্বার্থ,তাহাই কোন না কোনও প্রকারে কুতর্কে বা অন্য উপায়ে আমার স্বত্ব রূপ বা নাম ধারণ করিয়া থাকে। ঠিক যেন সভ্যতার ভয়ে ও স্বাধীনতার আশঙ্কায় স্বার্থ আপনার নামটী পরিবর্ত্তন করিয়াছে, কিন্তু বস্তুত আভ্যন্তরিক কোন বিশেষ বা ব্যাপী পরিবর্ত্তন যে হইয়াছে, এ রূপ ত বোধ হয় না। নামে মাত্র উহার ভিত্তি নীতি, কিন্তু এই নীতি আবার তর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত। কাজেই তর্কের স্পর্শমণি যাহাতে লাগে, তাহাই নীতির কাঞ্চন বর্ণে শোভিত হয়। এই রূপে স্বত্বেরও বিলক্ষণ বিড়ম্বনা হইতেছে। এমন কিছুই নাই, যাহা স্বত্বের নামে গৃহীত হইতেছে না। ঘোর স্বার্থপরতা, ভয়ানক নীচতা পর্য্যন্ত, স্বত্বের মহৎ নাম ধারণ করিয়া অনুষ্ঠিত হইতেছে। ইতিহাসের পত্র এই বিড়ম্বনায় পূর্ণ।

তবে আমাদের আশা কোথায়? মানবের ভাবী কল্যাণ কাহার হস্তে? এই নীতিকে স্বার্থানুসারী কুতর্কের হস্ত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, সত্য ও ধর্ম্মের সংলগ্ন করিয়া দিবে কে? জনসমাজের এই দুঃখ, ক্লেশ, যন্ত্রণা দূর করিয়া শান্তির অমৃত সিঞ্চন করিবে কে? এই স্বার্থপর পশুসমাজকে মানবসমাজ করিবে কে? আজ যে কত লোক বলিতেছে, নারী জাতির প্রকৃতি দ্বারাই প্রমাণিত হইতেছে যে, পুরুষের সমান অধিকার লাভে তাঁহাদের স্বত্ব নাই, সেই হতভাগাদের মুখে হস্ত দিয়া, কে আবার বীণাস্বরে প্রচার করিবে যে, নরনারী উভয়েই ঈশ্বরের প্রিয় সন্ততি; তাঁহার ইচ্ছানুসারে জীবনগতি নির্ণয় ও পরিচালন করিয়া সুখী হইতে উভয়েই সমান অধিকারী? এই যে কত লোক নীতির পবিত্র নাম কলঙ্কিত করিয়া জমীদার ও প্রজার মধ্যে স্বার্থান্ধ সম্বন্ধ বন্ধনে প্রবৃত্ত হইয়া, স্বত্ব বিষয়ে নানা তর্ক বিতর্কে ঈশ্বরের পবিত্র মন্দির অপবিত্র বায়ুতে পরিপূর্ণ করিতেছে, কে তাহাদের কপট প্রাণকে লজ্জায় অবনত ও মলিন করিয়া দিবে? এই যে জ্ঞান-দৃপ্ত সভ্যতার নামে গর্ব্বিত ও বীরত্বাভিমানী ইংরাজ সুশাসন ও সুনীতির স্বর্গীয় নামে কলঙ্ক দিয়া, নিরপরাধী সরলপ্রাণ একটী জাতির স্বাভাবিক স্বাধীনতাধন চিরদিনের মত অপহরণ করিয়া,ঘোর স্বার্থান্ধতাকেও স্বত্ব ও নীতির পরিচ্ছদ পরিধান করাইয়া জগৎকে স্তম্ভিত করিতেও সাহসী হইল, ইহার প্রতিকার করিয়া সংসারে শান্তি ও সৌহার্দ্দ,সুখ ও স্বাধীনতা নীতি ও ন্যায়কে প্রতিষ্ঠিত করিবে কে?—প্রেম।

প্রেমের উদয় না হইলে, স্বার্থ সম্পূর্ণ ভাবে মানব-প্রাণ হইতে উন্মূলিত হইবে না। প্রেমে হৃদয় সজীব না হইলে, স্বত্ব-নামধারী স্বার্থপরতা মানবকে চিরকাল

প্রতারিত করিতে বিরত হইবে না। প্রেমের অমৃত-বারি সিঞ্চনে স্বার্থানল দগ্ধ মনুজ সন্তান নব জীবন লাভ না করিলে, তাহার সকল কার্য্যের মূল যে নীতি, তাহা কখনও বিশুদ্ধ হইবে না; কদাচ কাহার কি ন্যায্য অধিকার, তাহা নির্দ্ধারণে সমর্থ হইবে না; এবং কখনই ন্যায়ানুসারিণী ইচ্ছা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা মানবকে উক্ত অধিকার সমূহ নির্দ্দিষ্ট ও উপযুক্ত পাত্রে নির্ব্বিবাদে সমর্পণ করিতে প্রণোদিত করিবে না। প্রেমই মানবকে যথার্থ আত্মবিস্মৃত করিতে পারে, প্রেমের উদয় হইলেই, তাহার পাশবপ্রকৃতি অদৃশ্য হয় এবং তখনই সে অপরকে সুখী করিয়া ও সুখী দেখিয়া নিজে সুখানুভব করিতে আরম্ভ করে। প্রেমেই মানুষের "স্ব"টীকে ছাড়াইয়া আত্মীয় বন্ধু, প্রতিবেশী, ক্রমে দেশবাসী ও অবশেষে জগৎবাসী নর নারীর "স্ব" র সহিত মিশাইয়া দেয়। কাজেই তখন তাহার "স্বার্থ" আর সকল মানুষের স্বার্থ এক হইয়া যায়। তখন আবার আনন্দের সহিত, সে আপনাকে পূর্ব্বাপেক্ষা সহস্র, কি কোটী গুণে অধিকতর স্বার্থপর দেখিয়া অবাক্ হইয়া প্রেমের জয় ঘোষণা করে। এই প্রেমেই মানুষের প্রকৃত সুখ। সুখ আর প্রেম, প্রেম আর সুখ—এই দুইটী কথা প্রকৃতপক্ষে অভিন্ন বলিয়া বোধ হয়। দুইই এক বস্তু। পবিত্র আনন্দ, বিমল সুখ ত প্রেমে বৈ আর কিছুতে নাই। আর এমন সর্ব্বগ্রাসী জিনিষ প্রেমের মত কিছুই নাই। নীতি বল, সভ্যতা বল, সুখ বল, স্বাধীনতা বল,—যত কিছু ভাল ও মহৎ, যাহা কিছু উন্নত ও ন্যায়সঙ্গত, সমুদায়ই এই প্রেমের অভিধানে লক্ষিত হয়। সকল প্রকার স্বাধীনতাতেই স্বাধীন একক, স্ব-অধীন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য প্রেমের মহিমা—ইহাতে পরাধীনতাই স্বাধীনতার চরমসীমা! আত্মসমর্পণই স্বাবলম্বনের পরাকাষ্ঠা! আত্মবিস্মৃতিই স্বার্থপরতার বার্দ্ধক্যের পূর্ণবেশ! প্রেমের সকলই অদ্ভুত। এক প্রেমিক মহাত্মা বলিয়াছেন "আমার গণিতই স্বতন্ত্রঃ—এখানে তোমার আছে তিন, খরচ কর সাত, হাতে থাকিবে তের।" কি সুন্দর কথা! এ রাজ্যে বস্তুতই তাই।

প্রকৃতই, প্রেম যখন মানবসমাজের রাজা হইবেন, তখনকার কি চমৎকার ভাব? কল্পনারও অতুল আনন্দ। প্রেমের প্রজারা একটুও নিজেদের দিকে চাহিবে না। সকলেই অপরের সুখ, অন্যের স্বার্থ ও আর সকলের স্বত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলিবে, এবং নিজেকে বিস্মৃত হইয়া পরের জন্যই জীবন ধারণ করিবে। আজ যেমন নিজের লইয়াই সকলে ঘুরিতেছে, প্রেমের সংসারে সকলেই পরের জন্য ব্যস্ত হইবে। কাজেই কেহও কষ্ট পাইবে না। সে সুখের সংসার কল্পনা করিয়াও সুখ।

কেহ যেন ইহা স্বপ্ন মনে না করেন। প্রেম মানব প্রাণের স্বাভাবিক ধন, ঈশ্বরের স্বহস্তনিহিত অমূল্য রত্ন। মাতৃগর্ভে কোন্ স্বার্থ আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছিল? ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরেও অন্ততঃ দুইটী সুদীর্ঘ বৎসর কোন্ স্বার্থপরতা বা স্বত্ব-বলে আমাদের স্পন্দহীন, জড়পিণ্ডবৎ দেহ ও তন্নিহিত প্রাণ রক্ষিত হইয়াছিল? প্রেমের অমৃতরসেই প্রথম হইতে শেষ মানবাত্মা পর্য্যন্ত সকলেরই জন্ম, বর্দ্ধন ও জীবন। প্রেম বস্তুতই আমাদের প্রকৃত ও স্বাভাবিক রাজা। তাঁহার বীজ তন্মধ্যেই নিহিত রহি-

য়াছে। ক্রমে অপরাপর বহিরাবরণ স্খলিত হইলে, আপনিই প্রেম স্বরাজ্য অধিকার করিবে। আরও বলি, ইতিমধ্যেই প্রেমের রাজত্ব জগতে স্থলে স্থলে দেখা দিতেছে। যখন স্বার্থের উপর সত্যের জয় হইয়াছে, তখন যে এ উভয়ের উপর প্রেমের জয়লাভ হইবেই হইবে, তাহা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। বর্ত্তমান সময়েই তাহার কত চিহ্ন দেখিয়াছি ও দেখিতেছি। এক মহাত্মা সংসারকে "বারমেসে আম্র বৃক্ষের" সহিত তুলনা করিয়াছেন, কেননা এখানে সবই একত্রে আছে। কুঁড়ি বৌল, কাঁচা ফল, পাকা ফল, সবই এক সঙ্গে, এক বৃক্ষে দেখা যাইতেছে। ক্রমবিকাশের নিয়মই এই যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত অবস্তুর অবস্থার আবশ্যকতা জগতে থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহা দেখা যায়। যখন উহার আবশ্যকতা আর থাকেনা, তখন উহা লোপ পায়। প্রেমের পূর্ণ বিকাশের জন্ত আজিও নীচ স্বার্থ ও অস্ফুট নীতির উপর দণ্ডায়মান স্বত্বের আবশ্যকতা আছে। তাই তাহারাও আছে। পূর্ণ প্রেমের বিকাশ হইলেই তাহারা বিলুপ্ত হইবে। এক্ষণে পাঠক! এস, দেখি আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে কিসে স্বার্থ ও স্বত্বকে পরাজিত করিয়া প্রেমের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি।

শ্রীমন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়।

সোণার পাথর-বাটী।

অমরা কি ভিত্তির উপরে দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছি, তত্ত্বকৌমুদী অথবা মন্মথ বাবু কেহই তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না, অথবা বুঝিয়াও তাহা আক্রমণ করিতেছেন না। তত্ত্বকৌমুদী পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন (১) "গাছকে মাছ মনে করিলে যদি মিথ্যাচরণ হয়, তবে চিন্ময় বস্তুকে জড়রূপে ভাবাতে মিথ্যাচরণ হয়।" (২) "সাধক যদি মনে করে, এই বিশেষ মূর্ত্তিতে বিশেষ ভাবে ঐশী শক্তি বর্ত্তমান্, তাহা হইলেই ইত্যাদি" (৩) "তাহারা সেই সকল দেব মূর্ত্তিকেই ঈশ্বর বলিয়া মনে করিয়া থাকেন, এবং ঈশ্বরের আকারই সেইরূপ মনে করিয়া থাকেন।" (৪) "আমার কোন বন্ধুর ফটোগ্রাফ দেখিয়া বন্ধুকে মনে করা, আর সেই ফটোগ্রাফকেই বন্ধু বলিয়া মনে করা কখনও এক নহে।" (৫) "পৌত্তলিকতা এই জন্তই দোষের। ঈশ্বর যাহা নহেন, তাহারা ঈশ্বরকে তাহাই বলিয়া থাকে।"

আমাদের "পৌত্তলিক কে?" নামক প্রথম প্রবন্ধে আমরা বলিয়াছিলাম "একই সময়ে, একই বস্তুকে জড়, পূজা গ্রহণে অসমর্থ জানিয়া, আবার তাহাকে অজড়, পূজা গ্রহণে সমর্থ বলিয়া ধারণা করা যায় না। অর্থাৎ মূর্ত্তি মনে করিলে ঈশ্বর মনে করা যায় না, ঈশ্বর মনে করিলে মূর্ত্তি মনে করা যায় না।" (৪ পৃ)। আবার "হয় যে (পৌত্তলিক) ঈশ্বরকে জানে, না হয় সে জানে না। যদি বল জানে না, তবে সে স্পষ্ট কোন জীবকেও ঈশ্বর বলিয়া মনে করিতে পারে না। যে যাহা জানে না, সে আবার তাহা মনে করিবে কি রূপে? যদি বল, কিছু কিছু জানে, তবে যতটুকু জানে ততটুকু জীবকে ঈশ্বর অথবা ঈশ্বরকে জীব বলিয়া ভাবিতে পারে না। আর

যতটুকু না জানে, ততটুকুও ভাবিতে পারে না।" আমাদের সমালোচকদের মধ্যে কেহই আমাদের এ সকল কথার ভিতরে প্রবেশ করিতেছেন না। অথচ তত্ত্বকৌমুদী বারম্বার বলিতেছেন "পৌত্তলিক গাছকে গাছ, দেব মূর্ত্তিকেই ঈশ্বর" ইত্যাদি মনে করে। আমরা দ্বিতীয় প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, ঈশ্বর অল্প কি অধিক পরিমানে মানুষ মাত্রেরই নিত্য প্রত্যক্ষ। তাহা হইলে পৌত্তলিক কেহ হইতে পারে না।

ঈশ্বর নিত্যপ্রত্যক্ষ হউন আর না হউন, মূর্ত্তিকে ঈশ্বর মনে করিতে হইলে, হয় মূর্ত্তি, না হয় ঈশ্বরকে ভুলিতেই হইবে। পূজা গ্রহণে অসমর্থ জ্ঞানে কেহ কাহাকেও পূজা করিতে পারে না, অতএব মূর্ত্তি ঈশ্বর নয়, ঈশ্বর মূর্ত্তি নয়, এই বোধ ভিন্ন পূজা অসম্ভব। 'মূর্ত্তিতে ঐশী শক্তি' কথাই বিরুদ্ধ, অর্থ শূন্য। সোনার পাথর-বাটি হয় না, কাঁটালের আমসত্ত্ব হয় না, জড়ের মূর্ত্তির ঐশী শক্তি হয় না। মূর্ত্তিতে ঐশী-শক্তি ধারণা করিতে হইলেই, হয় জড়াত্মক মূর্ত্তি, না হয় চিদাত্মক ঐশীশক্তি ভুলিতেই হইবে। যে সরল ভক্তির সহিত মূর্ত্তিরপূজা করে, যদি তাহাকে চিদাত্মক ঐশী শক্তি ভুলিতে হয়, তবে তাহার পূজা করাই হয় না, সরল ভক্তিরই উদ্রেক হয় না। পূজা বা ভক্তির পাত্র যদি তাহা গ্রহণে অক্ষম জানা যায়, তবে আর তাহাকে মানুষ ভক্তি দিতে পারে না। পৌত্তলিক যাহার পূজা করে, তাহাকে অবশ্য পূজা গ্রহণে সমর্থ জানিয়াই পূজা করে, মূর্ত্তিতে যদি কিছু চেতন আবির্ভূত থাকে, তাহারই পূজা করে। ঐশী শক্তির ধারনা ভিন্ন পূজা হয় না, জড় মূর্ত্তিতে তাহা ধারণা করাতে স্থিতি ব্যাঘাত দোষ ঘটে, অতএব পৌত্তলিক ঈশ্বর ভিন্ন আর কাহাকেও পূজা করে না।

আবার তত্ত্বকৌমুদীর কথা মত "দেব মূর্ত্তিকে ঈশ্বর মনে করা" আর "ঈশ্বরের আকারই সেইরূপ" মনে করা, এক কথা। বস্তুত দুই কথা সম্পূর্ণ বিপরীত, আমার হাত বলিতে যেমন হাত হইতে আমাকে ভিন্ন বুঝায়। ঈশ্বরের আকার বলিলেই আকার অথবা মূর্ত্তি হইতে ঈশ্বরকে ভিন্ন বুঝায়।

আমাদের শ্রদ্ধের ভ্রাতা মন্মথ বাবুও সেই তত্ত্বকৌমুদীর ভুলেই পড়িয়াছেন। 'ভগীরথ গঙ্গা আনিয়া তাঁহার পিতৃকুল উদ্ধার করিয়াছিলেন, এই বিশ্বাস করিয়া যে বলে, "মা গঙ্গা উদ্ধার কর', সেই তাঁহার মতে পৌত্তলিক। যে কথার বাক্যার্থ হয় না, তাহা কেহ ধারণাও করে না, বিশ্বাসও করে না। "গঙ্গা" বলিতে জড় বস্তু বুঝায়, "উদ্ধার কর" বলিতে চেতন বস্তু বুঝায়। গঙ্গার কাছে প্রার্থনা করা, আর জড়কে অজড় ধারণা করা, এক কথা। কিন্তু তাহা বিরুদ্ধ, ধারণা হয় না; তবে কি পৌত্তলিক অর্থশূন্য বাক্য মনে উচ্চারণ করে, আর তাহার চক্ষু দিয়া কপট "ভক্তিস্রোত প্রবাহিত হয়?" একথা বলিলে, পৌত্তলিকের প্রতি নিতান্তই অবিচার করা হয়। তবে কি, আমরা যে ব্যাঘাতদোষ ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়াছি, সে ভিত্তিতেই দোষ, অথবা এস্থলে তাহার প্রয়োগ হয় না। মন্মথ বাবু বা তত্ত্বকৌমুদী অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহা দেখাইলে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইব। আমরা বলি, পৌত্তলিক গঙ্গা বলিতে নদী বুঝিলেও তাহার সঙ্গে সঙ্গেই আরও কিছু বুঝে,

যাহা গঙ্গা শব্দে তুমি, কি আমি বুঝি না; তাঁহার কাছে গঙ্গাজল শুধু জল নয়, যিনি পতিতপাবনী, যিনি উদ্ধার করেন, গঙ্গা জলের সংস্পর্শে সে আত্মাতে তাঁহারই স্পর্শ-সুখ অনুভব করে, করে বলিয়াই চক্ষু দিয়া ভক্তিস্রোত প্রবাহিত হয়। আমাদের মতে পৌত্তলিকের মধ্যে কোন পৌত্তলিকতা নাই। কিন্তু তুমি আমি, আমাদের গঙ্গাজলের ধারণা জড়; সুতরাং নিরবচ্ছিন্ন কর্দ্দমাক্ত জলের ভার পৌত্তলিকের স্কন্ধে চাপাইয়া থাকি, এবং চাপাইয়া তাহাকে ধর্ম্ম জগতের নিম্নস্তরে নিক্ষেপ করি, আপনারা উদ্ভিদের স্থান অধিকার করিয়া, তাহাকে জড়ের স্থান প্রদান করি, অথবা আমরা জন্তু সাজিয়া তাহাকে উদ্ভিদ শ্রেণীতে ভুক্ত করি, বলি সে পৌত্তলিক, সে জড়, নিরবচ্ছিন্ন কর্দ্দমাক্ত কতকগুলি জলকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করে। পাদরি সাহেবও বক্তৃতা করেন "গঙ্গাটে ষ্টান করিলে, যডি পরিট্রান হয়, টবে কুম্ভীর কেন পরিট্রান হয়না।" সাহেব যেখানে জল মাত্র দেখিতেছেন, স্পর্শ করিতেছেন, পৌত্তলিকের বাহ্য চক্ষুহস্ত সেখানে জল দেখিতেছে, স্পর্শ করিতেছে বটে, কিন্তু তাহার অন্তরের চক্ষুহস্ত সেখানে ঈশ্বর দেখিতেছে ও স্পর্শ করিতেছে।

'মা গঙ্গা, উদ্ধার কর'—হয় এই বাক্যের অর্থ নাই, না হয়, আছে। যদি অর্থ না থাকে, যদি পৌত্তলিকের ভক্তি স্রোত কপটই হয়, তবেও সে সাধারণ সংজ্ঞামতই পৌত্তলিক নয়, কারণ সে কথার অর্থ হয় না, সে কথার দ্বারা ঈশ্বরকে পুত্তল, অথবা পুত্তলকে ঈশ্বরও মনে করা হয় না। আবার এইরূপ অর্থশূন্য বাক্য বলিবারই বা কারণ কি? যদি বল, দেখা দেখি সকলে এইরূপ করে, তবু জিজ্ঞাস্য এই, প্রথম হইতেই কি এই ব্যবহার অর্থশূন্য হইয়াছে। প্রথম হইতে বলা যায় না, যে হেতু দেখাদেখি অর্থশূন্য কার্য্য করিবার কারণ, তখন ছিল না। যদি কালক্রমে মাত্র অর্থশূন্য হইয়া থাকে; তবে প্রথমে কি অর্থ ছিল, এবং এখনও যে পৌত্তলিক মাত্রেই সেই অর্থ ভুলিবে, তাহাই বা কি করিয়া বলা যায়।

কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায়কে বিচার করিতে হইলে, তাহাদের আদর্শ দ্বারাই বিচার করা ঠিক। যদি একথা সত্যও হয় ব্রাহ্মনামধারীদিগের অধিকাংশই ধর্ম্ম অপেক্ষা বৈষয়িক উন্নতি সাধনে রত, তথাপি একথা বলা ঠিক হইবে না, বৈষয়িক উন্নতি সাধনই ব্রাহ্মধর্ম্ম। পৌত্তলিক ক্রিয়া কলাপ অর্থশূন্য বলাও ঠিক হইবে না, যতক্ষণ না জানিয়াছি, অর্থশূন্য ভাবশূন্য বাক্য উচ্চারণ করাই পৌত্তলিকদিগের আদর্শ, পূর্ব্বেও ছিল, এখনও আছে। পৌত্তলিকও যখন পশ্চিমবঙ্গে সাধুভক্ত চৈতন্য, রামপ্রসাদ, এবং পূর্ব্ববঙ্গে সিদ্ধবিদ্যা, রামদুলালকে আদর্শ চরিত্র বলিয়া সম্মান করে, তখন আর কি করিয়া বলিব, অর্থশূন্য বাক্য উচ্চারণ করাই পৌত্তলিকতা। যখন দেখিতেছি, পৌত্তলিকতার মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া, যবনভক্তেরাও লজ্জাভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক, পৌত্তলিক অনুষ্ঠান করিয়া, কৃতার্থ হইয়াছেন, উৎসাহের সহিত বলিয়াছেন, "কহে মুজাহোসেন আলি, যা করে মা জয়কালী"—কি করিয়া বলিব, অর্থশূন্য বাক্যমাত্র উচ্চারণ করাই পৌত্তলিকতা।

তবে 'মা গঙ্গা, উদ্ধার কর, একথার অর্থ কি, কাহাকেই বা সম্বোধন করিতেছে; অচেতন জলের সম্বোধন হয় না, বুঝিতে

পারে না, জানিয়া সম্বোধন করিলে, সে সম্বোধনও অর্থশূন্য, অতএব পূর্ব্বেরই প্রশ্ন ফিরিয়া আসিতেছে। "মা গঙ্গা," এই বাক্য যদি অর্থশূন্য না হয়, সার্থক হয়, তবে জড় জল রাশিকে লক্ষ্য করে না। "উদ্ধার কর" একথাই বা কাহাকে বলা হইতেছে? চেষ্টা করিতে অক্ষম জানিয়া, কেহ বলিতে পারে না, "আমাকে উদ্ধার কর, হে রক্ষণে অক্ষম, রক্ষা কর।" সে ইহুদীদের মত "He came to save others, himself he can not save. বলা বরং উপহাসেরই কথা; কিন্তু যখন বলা হইতেছে "চক্ষু হইতে ভক্তি-স্রোত প্রবাহিত হয়," তখন আর উপহাসের সম্ভাবনা কি?

ভক্তি, বিশ্বাস এবং বিচারশক্তি সম্পূর্ণ পৃথক্ পদার্থ। ব্রাহ্মদিগের মধ্যেও আমরা এমন লোক দেখিয়াছি, যাঁহারা নিজের নামটীও লিখিতে জানেন না। তর্ক করিয়া নিজের ভক্তিবিশ্বাসের ভিত্তি বুঝাইতেও পারেন না। বালেশ্বরে লক্ষণদাস নামে একজন নিরক্ষর পরম সাধু ব্রাহ্ম আছেন; ত্রিপুরাতে চরণদাস নামে একজন পরমবিশ্বাসী নিরক্ষর মৎস্য জীবি ব্রাহ্ম আছেন; ভক্তি বিশ্বাসে ইহারা দেবতুল্য লোক। কিন্তু ইহারা হয়ত, সদ্যুক্তি যুক্ত ব্যাখ্যা করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম বুঝাইতে পারিবেন না, অথবা বুঝাইতে ভুল করিবেন। তাহা বলিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে অন্ধ-বিশ্বাস, অথবা অর্থশূন্য কতকগুলিন কথা মাত্র বলা অন্যায় হইবে। কালক্রমে যদি এমন দিন হয় যে, হিন্দু, মুসলমান, বা খৃষ্টান ধর্ম্মের মত ব্রাহ্মধর্ম্মেরও বিস্তার হয়, তখন এই প্রকার নিরক্ষর লোকের সংখ্যাই অধিক হইবে। হয়ত তাঁহাদের মধ্যেই অনেকে ভক্তিবিশ্বাসে দেবতুল্য লোক হইবেন। আবার অনেক লোক হইবে, যাহারা এক দিকে যেমন মূর্খ, আর এক দিকেও তেমনি ভক্তিবিশ্বাস বিহীন। তখন ব্রাহ্মধর্ম্মের বিচার করিতে হইলে, ভক্ত বিশ্বাসী ব্রাহ্মদিগের জীবন দ্বারাই বিচার করিতে হইবে; যদি তাঁহারা নিজের ধর্ম্মজীবনের মর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতে অসমর্থ হন, তবে তাহাদের কথার দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে না; ধর্ম্মজীবনবিহীন, মূর্খদিগের কথামত ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিলে, আর প্রকৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম পাওয়া যাইবে না। পৌত্তলিকের ধর্ম্মেরও বিচার করিতে হইলে অসার, ভক্তিবিহীন, শুষ্ক, অনুষ্ঠাননিরত, মূর্খ লোকদিগের কার্য্য দেখিয়া অথবা কথা শুনিয়া ব্যাখ্যা করিলে অবিচার করা হয়। তাহাদের মধ্যে যাহারা সারগ্রাহী, ভক্ত, সাধারণের শ্রদ্ধার পাত্র, তাঁহাদেরই জীবন দেখিয়া পৌত্ত-লিকতার বিচার করিতে হইবে, যদি তাঁহারা অশিক্ষিত, নিজের ধর্ম্ম জীবনের মর্ম্ম ব্যাখ্যানে অসমর্থ হন, তাঁহাদের কথারদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে না। একরূপ লোক যখন বলে 'মা গঙ্গা, আমাকে উদ্ধার কর,' তখন কি মনে করিতে হইবে? কাহাকে সম্বোধন করিয়া, সে প্রেমভক্তিতে অশ্রুজল বর্ষণ করিতেছে? গঙ্গা বলিতে যদি সে কিছু জড় বুঝে, তাহাকে সে ডাকে না, তাহার নিকট সে উদ্ধার প্রার্থনাও করে না। যাহাকে প্রেমভক্তি গ্রহণে অসমর্থ জানা যায়, ঘোর কপটি না হইলে, কে তাহার প্রেমে অশ্রুবর্ষণ করিতে পারে? এ জন্যই বলিতেছি, যদি সে সরল ভক্ত হয়, তবে সে গঙ্গার পদার্থ ভুলিয়া যায়; তুমি যে নামে, যে স্থানে, জল মাত্র দর্শন

কর, সে সেই স্থানে জলের জল, সকলের সার, একমাত্র চিন্ময় উদ্ধার কর্ত্তাকে হৃদয়ে দর্শন করিয়া, প্রেমবারি বিসর্জ্জন করে।

শ্রীদ্বিজদাস দত্ত।

অপরিজ্ঞেয় ধর্ম্মতত্ত্ব।

যে ধর্ম্মে ভগবৎ প্রকৃতির সর্ব্বাঙ্গীন ভাব প্রতিফলিত না হয়, তাহা আংশিক, একদেশদর্শী; সুতরাং পূর্ণ, সত্যধর্ম্ম নহে। ঈশ্বরের স্বভাবকেই ধর্ম্ম বলা যায়। ধর্ম্মশাস্ত্রে এবং ধর্ম্মচরিত্রে যখন তাঁহার স্বভাব প্রস্ফুটিত হইতে থাকে, তখন ধর্ম্ম বাহিরে একটী দৃশ্যমান আকার ধারণ করে। তখন ভগবানই স্বয়ং আপনাকে মনুষ্যচরিত্রে আত্মপ্রকাশ করেন। অবশ্য পূর্ণমাত্রায় নহে—অপূর্ণ মাত্রায়, সীমাবদ্ধ ভাবে তিনি আত্মস্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন। যে পরিমাণে ধর্ম্মতত্ত্ব এবং ধর্ম্মানুষ্ঠানসকলে ঈশ্বরস্বভাব ব্যক্ত হয়, সেই পরিমাণে তাহা ঐশ্বরিক ধর্ম্ম। যদি তাহার মধ্যে ভগবৎসত্তার কোন অঙ্গবিশেষ অপ্রকাশিত থাকে, তবে তাহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পূর্ণধর্ম্ম নামে অভিহিত হইতে পারে না। যতই কেন বিজ্ঞান, যুক্তি, বিচারচাতুর্য্য তুমি তাহার ভিতর আন না, যদি ব্রহ্মের বিচিত্র স্বরূপের সুসামঞ্জস্য তুমি না দেখাইতে পার এবং তোমার ধর্ম্মের মধ্যে যদি ব্রহ্মস্বভাবের বিচিত্র শোভা নয়নগোচর না হয়, তাহা হইলে, ভক্তপ্রকৃতি তাহা কখনই গ্রহণ করিবে না।

বাস্তবিক ধর্ম্ম যেমন একদিকে গণিতশাস্ত্রবিৎ প্রত্যক্ষবিজ্ঞানবাদীর গণিতসিদ্ধান্ত এবং পুরাতত্ত্বপিপাসু পৌরাণিকের ঐতিহাসিক ঘটনা, তেমনি ইহা ভাবরসজ্ঞ কবিকল্পনার পূর্ণ চরিতার্থতা। বিশ্বাসী, ভক্ত আত্মা যেমন দৈবক্রিয়াকে হস্তামলকবৎ প্রত্যক্ষ গোচর করে, তেমনি অনন্ত তত্ত্বের ঘোর রহস্যময়, অতলস্পর্শ, অপরিমেয়, গভীর, অব্যক্ত ভাণ্ডারের দিকে বালকের ন্যায় কৌতূহল চিত্তে প্রধাবিত হয়। জ্ঞাত অপেক্ষা অজ্ঞাত বিষয়ের প্রতি তাহার প্রাণের টান অত্যন্ত অধিক। ভাবুক ভক্তশিশু বিচিত্র গুণসম্পন্না নিত্যানন্দময়ী জননীর স্নেহের আকর্ষণে অপরিচিত অজ্ঞাত পথে মহারণ্য মধ্যে প্রবেশ করে। সে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া অনন্তের অনাবিষ্কৃত রাজ্যের দিকে নির্ভয়ে চলিয়া যায়। কিন্তু যাহাদের ধর্ম্ম গণিত এবং ইতিহাসে পর্য্যবসিত হইয়াছে, তাহাদের অনন্ত জীবন এবং অনন্ত উন্নতি নাই। তাহারা অদ্ভুত ব্রহ্মতত্ত্বের দুর্ব্বোধ্য রহস্যরস পানে বঞ্চিত। তাহারা সমস্তই বুঝিয়া লইয়া একটী তালিকা করিয়া রাখিতে চায়; এক কটাক্ষপাতে মহাসমুদ্রের আদি, অন্ত এবং গভীরতার সীমা নির্দ্দেশ করত, ধর্ম্মজ্ঞানী হইবার চেষ্টা করে। সেরূপ জ্ঞানীর নিকট সকলই পুরাতন। তাহার নিকট, যে কোন অভিনব তত্ত্ব তুমি ব্যাখ্যা করিবে, তাহাকেই সে পুরাতন বলিয়া উড়াইয়া দিবে। অথচ যাহাকে সে পুরাতন বলিয়া উপেক্ষা করে, তাহারই অভ্যন্তরে অনন্ত নবভাব অবস্থিতি করিতেছে। বাহ্যদর্শী ভক্তিরসানভিজ্ঞ পণ্ডিতের ধর্ম্মতত্ত্ব কাষ্ঠ, পাষাণবৎ নীরস, তাহার ভিতর কোন রহস্য নাই; সুতরাং তাঁহার নিকট পার্থিব পদার্থ সমূহ যেমন কাল সহকারে চর্ব্বিত চর্ব্বণ, পুরাতন, রসহীন বলিয়া প্রতীত হয়, ধর্ম্মও তেমনি পরিত্যাজ্য হইয়া পড়ে। তিনি সঙ্গীত

শ্রবণ করিতে গিয়াও তৎসম্বন্ধে বুদ্ধি বিজ্ঞানের কঠোর বিচারপথ অবলম্বন করত, শেষে নিরাশ মনে ফিরিয়া আসিয়া বলেন, "এক দিন রাগ রাগিণীর বিভিন্ন যোগক্রিয়া নিঃশেষিত হইয়া যাইবে, তখন আর ইহার ভিতর নূতন কিছুই থাকিবে না।" প্রাচীন ও বর্ত্তমান কালের অভক্ত একেশ্বরবাদী ধর্ম্মজ্ঞানীরা ধর্ম্মসম্বন্ধেও এইরূপ সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া পরিণামে কেবল শূন্য অন্ধকার মরুভূমি দেখিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু বিশ্বাসীর শান্তির পন্থা অন্যরূপ। তিনি, না বুঝিয়া ঈশ্বরকে ভাল বাসেন এবং না দেখিয়া তাঁহাকে বিশ্বাস করেন। শিশুসন্তান যদি মাতার মাতৃত্বে বিজ্ঞান বিচার দ্বারা আকৃষ্ট হইবার চেষ্টা করিত, তাহা হইলে মাতৃস্নেহের মাধুর্য্য সে কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিত না। মাতা কি পদার্থ, তাঁহার সমগ্র তত্ত্ব না বুঝিয়া, কেবল তাঁহাকে ভালবাসিতেই সে ভালবাসে। সন্তানের প্রতি জননীরও তেমনি আকর্ষণ। তিনি সন্তানতত্ত্ব কি কিছু বুঝিতে পারেন? তথাপি না বুঝিয়াই তৎপ্রতি তিনি আসক্ত হন। যদি বল, এখানে জ্ঞান নাই, কেবলই অন্ধ ভাবের প্রাদুর্ভাব। বাস্তবিক তাহা নহে, ভাবের পথ দিয়া সহজে দিব্যজ্ঞানের সঞ্চার হয়। স্বভাব স্বভাবকে যেমন স্বভাবত বুঝিতে পারে, জ্ঞান বিচারে তেমন পারা যায় না। প্রাণের নিগূঢ় টানে মানুষ আপনার ব্যথার ব্যথীর নিকটে অন্ধের ন্যায় গমন করে। তাহাতে সে কখন ঠকে না। ভগবৎতত্ত্বের দুর্ব্বোধ্য রহস্য মধ্যে তেমনি ভক্ত অবতরণ করিতে চায়। যেখানে সেরূপ অবতরণের পন্থা বুদ্ধির প্রাচীরে অবরোধ করিয়া দিয়াছে, সেখানে মৃত্যু ভিন্ন আর কিছু নাই। তাই বলি, জ্ঞানের অগম্য প্রদেশে, ভক্ত কবির কল্পনার মহাসাগরে ডুবিতে না পারিলে, শান্তির আশা থাকে না। যে ধর্ম্ম কবিকল্পনা এবং রহস্যবর্জ্জিত, তাহা মূলহীন বৃক্ষের ন্যায় নীরস। গভীর চিন্তাশীল ভাবুক লোকেরা, তাহার সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে তিষ্ঠিতে পারে না। যাহারা কেবল মুখে ঈশ্বরকে অনন্ত বলে, কাজে তাঁহাকে অন্তবৎ, সীমাবিশিষ্ট পদার্থের ন্যায় মনে করে, তাহাদের ধর্ম্মের কোন আকর্ষণ নাই। অপরিজ্ঞেয়ত্বই শান্তির উৎস।

শ্রীচিরঞ্জীব শর্ম্মা।

দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ।

(ঐতিহাসিক উপন্যাস)

প্রথম অধ্যায়।

অবতরণিকা।

১৭৭২ সালের পাঁচ সনা বন্দোবস্তের মিয়াদ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। দেশের জমিদার তালুকদার প্রভৃতি ভূমাধিকারিদিগের এখন কণ্ঠাগত প্রাণ। তাঁহারা সকলেই চিন্তা করিতেছেন, নাজানি এবার আবার কি নূতন নিয়ম জারি হয়। হয়তো ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এবার সকল জমিদারকেই উৎখাৎ করিয়া, নূতন লোকের সহিত জমির বন্দোবস্ত করিবেন।

দেশের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা ওয়ারেণ হেষ্টিংস। ভূমিতে জমিদারদিগের কোন চিরস্থায়ী স্বত্ব আছে বলিয়া, তিনি স্বীকার

করেন না। তাঁহার অনুগ্রহ ক্রয় করিতে না পারিলে, কাহারও আপন জমিদারী ভোগ করিবার সাধ্য নাই।

ওয়ারেণ হেষ্টিংস অত্যন্ত জবরদস্ত লোক। তিনি দেশের আচার ব্যবহার আইন কানুন মতে চলেন না; কোর্ট অব্ ডিরেক্টরের হুকুমও বড় মান্য করেন না; আপন ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করেন। তবে দশ বিশ হাজার টাকা উৎকোচ দিতে পারিলে, তাঁহার অনুগ্রহের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে।

ইতিপূর্ব্বে কৌন্সিলের অধিকাংশ মেম্বর তাঁহার বিপক্ষ ছিল। সুতরাং অধিকাংশ মেম্বরের মতানুসারে তাঁহাকে বাধ্য হইয়া কার্য্য করিতে হইত। কিন্তু বিপক্ষ দলের মধ্যে কর্ণেল মন্‌সনের মৃত্যু হইয়াছে। এখন কেবল ফিলিপ্ ফ্রান্সিস্ এবং জেনেরেল ক্লেবারিং তাঁহার বিপক্ষ। এদিকে রিচার্ড বারওয়েল ছায়ার ন্যায় তাঁহার পদানুসরণ করিতেছেন; সর্ব্বদাই তাঁহার মত সমর্থন করেন। কৌন্সিলে কোন বিষয়ে মতের অনৈক্য হইলে, এখন এ পক্ষেও দুই জন, ওপক্ষেও দুই জন। সুতরাং গবর্ণর জেনেরল ওয়ারেণ হেষ্টিংস যে পক্ষে আছেন, সেই পক্ষের মতানুসারেই কার্য্য হয়। কৌন্সিলের মধ্যে হেষ্টিংসের অপ্রতিহত প্রাধান্য সংস্থাপিত হইয়াছে।

এই সময়ে ইংলণ্ডের রাজমন্ত্রী লর্ড নর্থ। হেষ্টিংসের অসদাচরণ, কুক্রিয়া, এবং নৃশংস ব্যবহার লর্ড নর্থের কর্ণগোচর হইল। নিরাশ্রয়া কুহিলা রমণীদিগের ক্রন্দনধ্বনি এবং আর্ত্তনাদ ইংলণ্ডে পৌঁছিল। লর্ড নর্থ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বলিলেন—

"ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্ম্মচারিগণ অসভ্য ইংরাজ নাম কলঙ্কিত করিয়াছে। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির সৈন্যগণ নিরপরাধিনী কুহিলা রমণীদিগের নাসিকা কর্ণ ছিন্ন করিয়া, তাহাদিগের স্বর্ণাভরণ অপহরণ করিয়াছে। অবশেষে, তাঁহাদের পরিধেয় বস্ত্রখানি পর্য্যন্ত কাড়িয়া নিয়া বিবস্ত্রাবস্থায় বলপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সুজা উদ্দৌলার তাঁবুতে ধরিয়া নিয়াছে। অর্থ গৃধ্নু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হস্ত হইতে দেশশাসনের ক্ষমতা উঠাইয়া লইবার নিমিত্ত বড় দিনের (Christmas) পূর্ব্বেই পার্লিয়ামেণ্ট সভা আহ্বান করিতে হইবে।"

হেষ্টিংসের ইংলণ্ডস্থিত এজেণ্ট (আম মোক্তার) ম্যাক্‌লিন সাহেব দেখিলেন যে, মহা বিপদ উপস্থিত। হেষ্টিংস পূর্ব্বেই তাঁহার এজেণ্ট ম্যাকলিন সাহেবকে বলিয়া রাখিয়াছিলেন "বড় আঁটা আঁটি দেখিলে তৎক্ষণাৎ আমার পক্ষ হইতে পদত্যাগের এস্তফা পত্র দাখিল করিবে।"

ম্যাকলিন সাহেব হেষ্টিংসের পক্ষ হইতে কোর্ট অব ডিরেক্টরের নিকট তাঁহার পদত্যাগের এস্তফা পত্র দাখিল করিলেন। কোর্ট অব ডিরেক্টরও অত্যন্ত ভীত হইয়াছিলেন। তাঁহারা ভাবিলেন, হেষ্টিংসের অসদাচরণ নিবন্ধন হয় তো ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজ্যশাসনের ক্ষমতা একেবারে বিলোপ হইবে। সুতরাং তাঁহারা তৎক্ষণাৎ হেষ্টিংসের এস্তফা মঞ্জুর করিলেন; তাঁহাদের মধ্যের হুইলার সাহেবকে ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল পদে মনোনীত করিলেন; এবং হুইলার সাহেবের ভারতে পৌঁছা পর্য্যন্ত জেনেরেল ক্লেবারিংকে গবর্ণর জেনেরেলের কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে লিখিলেন।

কোর্ট অব ডিরেক্টরের পত্র ভারতবর্ষে পৌঁছিল। হেষ্টিংস অসন্তোষার হইয়া পড়িলেন। এখন নূতন বন্দোবস্তের সময়। এ সময়ে বিলক্ষণ অর্থ সঞ্চয় হইতে পারে। বিশেষত কর্ণেল মন্সনের মৃত্যুর পর, এখন তিনি যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারেন। এ সময় কি পদত্যাগ করা যাইতে পারে? অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া হেষ্টিংস বলিলেন, "আমি আমার আমমোক্তার ম্যাকলিন সাহেবকে পদত্যাগ-পত্র দাখিল করিবার ক্ষমতা প্রদান করি নাই। আমি গবর্ণর জেনেরেলের পদ পরিত্যাগ করিব না।"

জেনেরেল ক্লেবারিং হেষ্টিংসের কথায় কোন কর্ণপাত করিলেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ হেষ্টিংসের নিকট মালখানার এবং দুর্গের চাবী চাহিয়া পাঠাইলেন। হেষ্টিংস তাঁহাকে চাবী প্রদান করিলেন না। উভয়ের মধ্যে ঘোর বিবাদ উপস্থিত হইল। জেনেরেল ক্লেবারিং আইনানুসারে আপনাকে গবর্ণর জেনেরেলের পদাভিষিক্ত মনে করিয়া, ফিলিপ ফ্রান্সিস্কে লইয়া কৌন্সিল-গৃহের এক প্রকোষ্ঠে বসিয়া কৌন্সিলের কার্য্য আরম্ভ করিলেন। এদিকে হেষ্টিংস বারওয়েল সাহেবকে লইয়া অপর প্রকোষ্ঠে বসিয়া কৌন্সিলের কার্য্য করিতে লাগিলেন, এবং সমুদয় লোককে জেনেরেল ক্লেবারিংয়ের হুকুম অমান্য করিতে অনুরোধ করিলেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অন্যান্য কর্ম্মচারি হেষ্টিংসের পক্ষাবলম্বন করিলেন। তাঁহারা জানিতেন, জেনেরেল ক্লেবারিং গবর্ণর জেনেরেল হইলে উৎকোচ গ্রহণের সুবিধা থাকিবে না; দেশীয় লোকের উপর অত্যাচার করিতে পারিবেন না। সুতরাং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সমুদায় স্বার্থপর ইংরাজ কর্ম্মচারি এবং অনেকানেক দেশীয় কুলাঙ্গার জেনেরেল ক্লেবারিংয়ের বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিল। অবশেষে হেষ্টিংসের প্রস্তাবানুসারে জেনেরেল ক্লেবারিং এবং হেষ্টিংস উভয়েই তাঁহাদের মধ্যের এই বিবাদ মীমাংসার ভার সুপ্রিম কোর্টের জজদিগের প্রতি অর্পণ করিলেন। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান জজ ইলাইজা ইম্পি। তিনি হেষ্টিংসের প্রিয় বন্ধু। তাঁহার বিচারে হেষ্টিংসেরই জয় লাভ হইল। তিনি বলিলেন হেষ্টিংসের আমমোক্তারের প্রদত্ত পদত্যাগপত্র কোর্ট অব ডিরেক্টর গ্রহণ করিয়া অন্যায় করিয়াছেন। সুতরাং হেষ্টিংস আইনানুসারে পদচ্যুত হয়েন নাই।"

এই রূপে হেষ্টিংসের পদ বহাল রহিল। এবং তাঁহার ক্ষমতা ও প্রভুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

এই ঘটনার কিছু কাল পরে জেনেরেল ক্লেবারিং পরলোকে গমন করিলেন। সুতরাং হেষ্টিংসের একাধিপত্য আরও দৃঢ়ীভূত হইল। এদিকে ভূমি সম্বন্ধীয় নূতন বন্দোবস্তের সময়ও সমুপস্থিত হইল।

দেশের প্রধান প্রধান জমিদার তালুকদার আপন আপন নায়েব গোমস্তা এবং আমমোক্তারদিগকে দরবার করিবার নিমিত্ত কলিকাতা প্রেরণ করিতে লাগিলেন। কলিকাতা রাজস্ব কমিটির আমলাদিগের বাড়ী প্রত্যহই লোকারণ্যে পরিপূর্ণ। খালসা ডিপার্টমেণ্টের রায়রাঁইয়ার বাড়ীতে অহর্নিশ লোক যাতায়াত করিতে লাগিল।

কিন্তু জমিদারদিগের প্রেরিত লোকেরা অত্যল্প কাল মধ্যেই বুঝিতে পারিলেন যে,

সমুদয় বন্দোবস্তের ভার হেষ্টিংসের হাতে। সুতরাং হেষ্টিংসের প্রিয়পাত্রদিগকে বশীভূত করিতে না পারিলে, কোন কার্য্যই সাধন হইবে না। কিন্তু হেষ্টিংসের বিশেষ প্রিয়পাত্র কে?

দ্বিতীয় অধ্যায়।

হেষ্টিংসের প্রিয় পাত্র কে?

১৭৭৮ খ্রীষ্টীয় অব্দের জুলাই মাসে, এক দিন প্রাতে, এক জন উচ্চ পদস্থ রাজপুরুষ তাঁহার কলিকাতাস্থ ভবনে বসিয়া নানাবিধ বিষয়কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। নজরের টাকা হস্তে করিয়া শত শত জমিদার, তালুকদার তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। অনেকানেক জমিদারের গোমস্তা আপন আপন প্রভুর পত্র ও নজরসহ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। এই উচ্চ পদস্থ রাজপুরুষের সাক্ষাতে কেহ বসিতেও সাহস করেন না। এই সকল লোকের মধ্যে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রেরিত এক জন ব্রাহ্মণ্ এক খানি পত্র হস্তে করিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। "মহারাজের জয় হউক" বলিয়া পত্র খানি এই উচ্চপদস্থ রাজ পুরুষের হস্তে প্রদান করিলেন। পত্রের শিরোভাগে লিখিত রহিয়াছে।

"মরণার অসাধ্য, পুত্র অবাধ্য"

"কেবল ভরসা গঙ্গাগোবিন্দ"

এই উচ্চ পদস্থ রাজ পুরুষের নাম দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ। রাজস্ব আদারের প্রবিন্সিয়েল কৌন্সিল অর্থাৎ প্রাদেশীয় রাজস্ব সমিতি বা রাজস্ব কমিটী সংস্থাপিত হইবার পূর্ব্বেই ইনি গবর্ণর ওয়ারেণ হেষ্টিংসের দেওয়ানের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তৎপরে প্রবিন্সিয়েল কৌন্সিল সংস্থাপিত হইলে, কলিকাতার রাজস্ব কমিটীর দেওয়ানের পদে নিযুক্ত হয়েন। বৎসরাধিক হইল ইনি হেষ্টিংসের বিপক্ষদল কর্ত্তৃক পদচ্যুত হইয়াছেন। কিন্তু পদচ্যুত হইলেও হেষ্টিংসের অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হয়েন নাই। এখন হেষ্টিংসের বিপক্ষদিগের মধ্যে দুই জনেরই মৃত্যু হইয়াছে। বিশেষত রাজস্ব বিভাগের কার্য্যে হেষ্টিংসের একাধিপত্য রহিয়াছে। সুতরাং গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ বরখাস্ত হইলেও রাজস্ব সম্বন্ধে তাঁহাকেই সমুদয় কার্য্যকলাপ করিতে হয়।

উপস্থিত জমিদারগণ ক্রমে বিদায় গ্রহণ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলে পর, প্রায় বিশ পঁচিশজন-পারিষদে পরিবেষ্টিত, অতিশয় মূল্যবান এবং সুচারু পরিচ্ছদে সুসজ্জিত একজন কৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘাকার পুরুষ গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র, দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইয়া, সাদর সম্ভাষণে, তাঁহাকে আপন পার্শ্বে বসাইলেন; তাঁহার সহিত নানা প্রকার বাক্যালাপ করিতে লাগিলেন। ইহাদিগের পরস্পরের কথোপকথন আরম্ভ হইলে পর, অন্যান্য লোক ক্রমে স্থানান্তরে চলিয়া গেল।

অনেক কথা বার্ত্তার পর এই নবাগত কৃষ্ণকায় পুরুষ বলিলেন—"মহাশয় আপনার দ্বারা যে আমার অনিষ্ট হইবে, তাহা আমি কখন মনে করিতাম না। আপনি আমার একমাত্র বল, ভরসা।"

গঙ্গাগোবিন্দ। আমার দ্বারা আপনার অনিষ্ট হইয়াছে! সে কি?

দ্বিতীয় ব্যক্তি। পদচ্যুত হইলাম। এও কি অনিষ্ট নহে?

গঙ্গাগোবিন্দ। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) পদচ্যুতির পর আবার তো বহাল হইয়াছেন।

দ্বিতীয় ব্যক্তি। আবার মকরর হইয়াছি বটে; কিন্তু দাগীলোক হইয়া রহিয়াছি। নামের উপর কলঙ্ক পড়িয়াছে।

গঙ্গাগোবিন্দ। মহাশয়, দাগী হওয়াই ভাল। আবশ্যক মতে সেই দাগ দেখিয়াই লোক বাছিয়া লইতে হয়। সেই দাগ ছিল বলিয়া, মুরশিদাবাদের রাজস্ব কমিটীর দেওয়ান হইয়াছেন।

দ্বিতীয় ব্যক্তি। আপনি বলেন, দাগ থাকা ভাল। কিন্তু এখন তো রাজস্বকমিটী, পূর্ব্বে একবার বরখাস্ত হইয়াছিলাম বলিয়া, আমাকে আবার বরখাস্ত করিতে চাহে।

গঙ্গাগোবিন্দ। প্রদেশীয় রাজস্ব কমিটী (Provincial council) সত্বরই এবালিস্ হইবে। আপনার সে বিষয় কোন চিন্তা নাই।

দ্বিতীয় ব্যক্তি। কমিটী এবালিস্ হইলেই, তাহাতে আমার কি উপকার হইবে।

গঙ্গাগোবিন্দ। নূতন যে বন্দোবস্ত হইবে, তাহাতে আপনার অবশ্যই একটা না একটা সুবিধা হইবে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি। আমার যে কোন সুবিধা হইবে, তাহা কিরূপে জানিতে পারিলেন।

গঙ্গাগোবিন্দ। আপনি এখন চিহ্নিত লোক। ওয়ারেণ হেষ্টিংস নিশ্চয়ই বুঝিয়াছেন যে, আপনি অত্যন্ত কার্য্যদক্ষ এবং উপযুক্ত কর্ম্মচারী। আপনাকে তিনি কখন ছাড়িবেননা।

দ্বিতীয় ব্যক্তি। আপনার এই সকল কথার কিছু অর্থই আমি বুঝিনা। গবর্ণর জেনেরল যদি আমাকে কার্য্যদক্ষ বলিয়া মনে করিতেন, তবে ১৭৭২ সনের পরিদর্শন কালে আমাকে পদচ্যুত করিলেন কেন? আমি তো প্রাণপণে সরকারি কার্য্য সাধন করিয়াছি। ১৭৭০ সনের ঘোর দুর্ভিক্ষের সময়ও রাজস্ব আদায় করিতে কোন ত্রুটী করি নাই।

গঙ্গাগোবিন্দ। রাজস্ব আদায় সম্বন্ধে আপনার ন্যায় কার্য্যদক্ষ লোক যে পাওয়া যায় না, তাহা গবর্ণর জেনেরেল বিলক্ষণ জানেন।

দ্বিতীয় ব্যক্তি। তাহা জানেন, তবে বরখাস্ত করিলেন কেন?

গঙ্গাগোবিন্দ। তিনি কি আর ইচ্ছাপূর্ব্বক আপনাকে বরখাস্ত করিয়াছিলেন। বিলাতি সভ্যতার অনুরোধে—খ্রীষ্টান ধর্ম্মের অনুরোধে,—আপনাকে তখন বরখাস্ত না করিলে চলে না, তাই আপনাকে বরখাস্ত করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় ব্যক্তি। আপনার কথা আমি কিছুই বুঝি না। বিলাতি সভ্যতার অনুরোধ কি—খ্রীষ্টান ধর্ম্মের অনুরোধই বা কি—বুঝাইয়া বলুন দেখি।

গঙ্গাগোবিন্দ। পূর্ণিয়ার লোকেরা আপনার বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিল। রাজস্ব আদায়ের নিমিত্ত কত কত জমিদার, তালুকদারের স্ত্রীলোকদিগকে পর্য্যন্ত আপনি মালের কাছারিতে আনিয়া বিবস্ত্র করিয়া রাখিয়াছিলেন। স্ত্রীলোকদিগকে প্রহার করা কিম্বা তাহাদিগকে বিবস্ত্র করা, বিলাতের লোকেরা বড় অন্যায় বলিয়া মনে করে। এই সকল বিষয় প্রকাশ হইয়া পড়িলে পর, হেষ্টিংস সাহেব আপনাকে বরখাস্ত না করিলে, তাঁহার নিজের উপর দোষ পড়িত। সুতরাং তিনি বাধ্য হইয়া আপনাকে তখন বরখাস্ত করিয়াছেন। কিন্তু আপনি নিশ্চয় জানিবেন যে, আপনি তাঁহার একজন বিশেষ প্রিয়-

পাত্র। আপনার নাম তিনি হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিয়াছেন।

দ্বিতীয় ব্যক্তি। সে বৎসর জমীদার তালুকদারের স্ত্রীলোকদিগকে এইরূপে ধরিয়া না আনিলে, এক পয়সাও আদায় হইত না। তখন তো আপনাদের হাতে রাজস্ব আদায়ের ভার ছিলনা। মহম্মদ রেজাখাঁই নায়েব সুবাদার ছিলেন। তিনি বারম্বার আমার নিকট হুকুম পাঠাইতে লাগিলেন—"যেরূপে পার, পূর্ণিয়ার সমুদয় রাজস্ব আদায় করিতে হইবে"—এদিকে ঘোর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত। জমিদার তালুকদার প্রজার নিকট হইতে এক পয়সাও কর আদায় করিতে পারে নাই। তাহাদের পূর্ব্বসঞ্চিত টাকা হইতে রাজস্ব দিতে হইল। কিন্তু ঘরের টাকা কি লোকে সহজে ছাড়িতে চাহে। তাহাতেই বিশেষ কষ্ট করিয়া, আমাকে রাজস্ব আদায় করিতে হইয়াছিল।

গঙ্গাগোবিন্দ। কিন্তু পূর্ণিয়া সেই বৎসরই লোকশূন্য হইয়াছে। পূর্ণিয়ার রাজস্বও সেই হইতেই কমিয়া গিয়াছে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি। এখন পূর্ণিয়া লোকশূন্য হইলে, আমি কি করিব। আমি তো আর সকল লোকের প্রাণ বিনাশ করি নাই। অনেকানেক জমিদার তালুকদারের স্ত্রীলোকদিগকে মাল-কাছারিতে আনিয়াছিলাম বলিয়া, তাহারা জাতিভ্রষ্ট হইয়া পড়িল। সুতরাং তাহারা দেশ ছাড়িয়া পলাইয়া গেল। প্রহারে আর কয়জন লোক বা মরিয়াছে। আমার বোধ হয় না যে, দুই এক শত লোকের অধিক মরিয়াছে। তাহাতেও আমার কোন দোষ নাই। এই সকল লোক শত শত বেত্রাঘাতেও টাকা দিতে সম্মত হইল না। তখন কাঁটাশুদ্ধ বেলগাছের ডাল দ্বারা ইহাদিগকে প্রহার করিতে আদেশ করিলাম। তাহাতেই অনেকের মৃত্যু হইল। কিন্তু এইরূপ না করিলে কি আর রাজস্ব আদায় হইত?

গঙ্গাগোবিন্দ। সে গত বিষয় লইয়া এখন তর্ক করিলে কি হইবে। আপনার ভয় নাই। হেষ্টিংস সাহেব আপনার ন্যায় কার্য্যদক্ষ লোককে ছাড়িবেন না। প্রবিন্সিয়াল কৌন্সিলের মেম্বরগণ শত চেষ্টা করিয়াও আপনার কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না। প্রবিন্সিয়াল কৌন্সিল এবালিশ করিবার নিমিত্ত গবর্ণর জেনেরেল কোর্ট অব ডিরেক্টরের নিকট পত্র লিখিয়াছিলেন। কিন্তু কোর্ট অব ডিরেক্টর ১৭৭৭ সনের ৪ঠা জুলাইর পত্রে হেষ্টিংস সাহেবের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা নূতন কোন পরিবর্ত্তন আবশ্যক বিবেচনা করেন না।

দ্বিতীয় ব্যক্তি। কোর্ট অব ডিরেক্টর গবর্ণর জেনেরেলের উপর বিরক্ত হইয়াছেন কেন?

গঙ্গাগোবিন্দ। তাঁহারা অনেক বিষয়েই বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। প্রথমত আমি বরখাস্ত হইয়াছি পর, হেষ্টিংস এখনও আমার হাতে রাজস্ব বিভাগের কার্য্য কর্ম্মের ভার দিতেছেন বলিয়া, বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। দ্বিতীয়ত হেষ্টিংসসাহেব আণ্ডারসন, ক্রফ্ট এবং বোগেল সাহেবকে পুনর্ব্বার মফস্বল তদন্তের কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন বলিয়া বিরক্ত হইয়াছেন। তার পর সেই মুঙ্গেরের মনোহর মুখোপাধ্যায়ের মোকদ্দমার এবং শ্রীহট্টের থেকারে (Thackeray) সাহেবের মোকদ্দমার কাগজ পত্র দেখিয়া হেষ্টিংস এবং বারওয়েল উভয়কে যার পর নাই তিরস্কার করিয়াছেন।

দ্বিতীয় ব্যক্তি।—মনোহর মুখোপাধ্যায়ের কি মোকদ্দমা হইয়াছে?

গঙ্গাগোবিন্দ।—মনোহর মুখোপাধ্যায় বেটম্যান (Bateman) সাহেবের গোমস্তা ছিল। বেটম্যান সাহেব তখন মুঙ্গেরের কলেক্টর ছিলেন। মুঙ্গের এবং কারিকপুর এই দুই মহাল বেটম্যান সাহেব ধান্দু বাহাদুর এবং কৃপারাম এই দুই নামে নিজে ইজারা নিয়াছিলেন। ধান্দু বাহাদুর নামে কোন লোক ছিল না। বেটম্যানের আদেশানুসারে, মনোহর ধান্দু বাহাদুর এবং কৃপারামের জামিন হইয়াছিল। বেটম্যান ঐ দুই মহালের জমিদারদিগকে উৎখাৎ করিয়া নিজেই মহাল ইজারা লইলেন। কিন্তু মহালের যাহা কিছু রাজস্ব আদায় করিয়াছিলেন, তৎসমুদয়ই তিনি নিজে আত্মসাৎ করিলেন। কোম্পানির প্রাপ্য রাজস্ব ১৩০০০ টাকা বাকী পড়িয়া রহিল। রায় রাইয়া ১৩০০০ টাকা বাকী থাকা রিপোর্ট করিলে পর, তদন্ত আরম্ভ হয়। তখন মনোহরকে টাকার নিমিত্ত ধৃত করিলে, সে দরখাস্ত করে যে, ধান্দু বাহাদুর নামে কোন লোক নাই। ধান্দু বাহাদুর এবং কৃপারামের নামের মহর বেটম্যান সাহেব প্রস্তুত করাইয়া, তাহার নিজের কাছে রাখিতেন। বেটম্যানই ঐ দুই মহালের ইজারদার ছিলেন। এবং তাঁহার কথানুসারে, সে জামিন হইয়াছিল।

দ্বিতীয় ব্যক্তি।—এ আর একটা বিষয়ই বা কি। এই রূপ তো সর্ব্বত্র হইতেছে। তবে শ্রীহট্টে কি হইয়াছে?

গঙ্গাগোবিন্দ।—শ্রীহট্টের গোলমালে স্বয়ং বারওয়েল সাহেব পর্য্যন্ত লিপ্ত আছেন বলিয়া কোর্ট অব ডিরেক্টরের সন্দেহ হইয়াছে। রাজস্ব পরিদর্শন সমিতি (Committee of circuit) শ্রীহট্টের জমিদারী যে ব্যক্তির নিকট ইজারা দিয়াছিল, সে রাজস্বের পরিবর্ত্তে ৬১ টা হাতি দিবে বলিয়া, কবুলতি লিখিত হয়। কিন্তু যে ব্যক্তির নামে ইজারাদারি পাট্টা কবুলতি লেখা পড়া হইয়াছিল, সে নামে কোন লোক শ্রীহট্টে নাই। শ্রীহট্টের রেসিডেণ্ট থেকারে সাহেবই একটা কল্পিত নামে ঐ সকল মহাল ইজারা লইয়াছিলেন। তিনি হাতির মূল্যের বাবত রাজস্বের টাকা ভিন্ন পরিদর্শন সমিতি হইতে আর ৩৩০০০ টাকা অগ্রিম নিয়াছিলেন। পরে যে কয়েকটা হাতি পাঠাইয়াছেন, তাহা প্রায় সমুদয়ই পথে মরিয়া গিয়াছে। কেবল ১৬ টা হাতি পাটনায় পৌঁছিয়াছে। এই শ্রীহট্টের গোলমাল সম্বন্ধে হেষ্টিংস, বারওয়েল উভয়কে কোর্ট অব ডিরেক্টর যথোচিত তিরস্কার করিয়াছেন।

দ্বিতীয় ব্যক্তি।—এ সকল গোলমাল সত্বরই মিটিয়া যাইবে। ইংরাজদিগের সাত-খুন মাপ। কিন্তু আমি আপনার নিকট একটা কথা বলিতে আসিয়াছি। আপনি প্রতিজ্ঞা করুন যে, আপনি আমার কোন অনিষ্টের চেষ্টা করিবেন না। আর আমিও প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমি আপনার কোন অনিষ্ট করিব না।

গঙ্গাগোবিন্দ।—আমি কখন আপনার কোন অনিষ্ট করিব না। সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকিবেন। এখন প্রবিন্সিয়াল কৌন্সিল উঠিয়া গেলেই ভাল হয়। দুই তিন বৎসর পরে এক একটা পরিবর্ত্তন না হইলে, এক একটা নূতন আইন জারি না হইলে, সরকারি কার্য্যকারকদিগের কোন লাভ হয় না। যাহাতে পুনর্ব্বার মফস্বল তত্ত্ব

হয়, তাহারই চেষ্টা করিব। আপনি কিছুকাল এখানেই অবস্থান করুন। দেখুন আগামী কল্য কৌন্সিলে কি নিয়ম অবধারিত হয়। তারপর, যাহা হয় আমরা পরামর্শ করিয়া স্থির করিব।

দ্বিতীয় ব্যক্তি।—তবে আজ বিদায় হইলাম। আজ হইতে আপনার সঙ্গে এই কথা রহিল যে, আপনিও আমার অনিষ্টের চেষ্টা করিবেন না, আমিও আপনার কোন অনিষ্টের চেষ্টা করিব না।

এই বলিয়া দ্বিতীয় ব্যক্তি দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের নিকট হইতে বিদায় হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

এই দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম, রাজা দেবী সিংহ। যখন মহম্মদ রেজাখাঁ নায়েব সুবাদার ছিলেন, তখন রাজা দেবী সিংহ পূর্ণিয়ার রাজস্ব আদায়ের ভার প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু ইহার অত্যাচারে পূর্ণিয়া প্রায় জনশূন্য হইয়াছিল। সুতরাং ১৭৭২ সালে যখন ওয়ারেণ হেষ্টিংস পরিদর্শন সমিতির (committee of circuit) সভাপতি হইয়াছিলেন, তখন তিনি রাজা দেবী সিংহকে পদচ্যুত করেন। কিন্তু ১৭৭৩ সালে যখন কলিকাতা, মুরশিদাবাদ, বর্দ্ধমান, ঢাকা, পাটনা এবং দিনাজপুরে রাজস্ব আদায় নিমিত্ত এক একটী প্রবিন্সিয়াল কৌন্সিল সংস্থাপিত হইল, তখন আবার হেষ্টিংস সাহেবই রাজা দেবী সিংহকে মুরশিদাবাদ কৌন্সিলের দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করিলেন। প্রবিন্সিয়াল কৌন্সিলের মেম্বরগণ এদেশের রাজস্ব আদায় সম্বন্ধীয় নিয়ম কিছুই বুঝিতেন না। মুরশিদাবাদ কৌন্সিলের সমুদয় কার্য্যই দেবী সিংহ আপন ইচ্ছানুসারে সম্পাদন করিতেন। অনেকানেক জমিদারকে তাহাদের মহাল হইতে উৎখাৎ করিয়া নিজে বিনামিতে সেই সকল মহাল ইজারা লইতেন। এতদ্ভিন্ন দেবী সিংহ ইংরাজদিগকে বাধ্য করিবার নিমিত্ত আর একটী কৌশল করিলেন। তিনি সর্ব্বদাই দশ বারটী স্ত্রীলোক সংগ্রহ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে রাখিতেন। প্রবিন্সিয়াল কৌন্সিলের ইংরাজ কর্ম্মচারিদিগের প্রয়োজন হইলেই, ইহার দুই একটী স্ত্রীলোক তাহাদিগের নিকট প্রেরণ করিতেন। ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ ইহাতে দেবী সিংহের উপর বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন।

কিন্তু চিরকাল কাহারও সমভাবে অতিবাহিত হয় না। ১৭৭৮ সালের কিছু পুর্ব্বে মুরশিদাবাদের প্রবিন্সিয়াল কৌন্সিল দেবী সিংহের প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া, তাহাকে বরখাস্ত করিতে উদ্যত হইলেন। দেবী সিংহ আর কোন প্রকারেই তাহাদিগের মনস্তুষ্টি করিতে সমর্থ হইলেন না। সুতরাং এখন হেষ্টিংস সাহেবের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন বলিয়া, কলিকাতা আসিয়াছেন এবং হেষ্টিংসের বিশেষ প্রিয়পাত্র গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের শরণাগত হইলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

কৌন্সিলের অধিবেশন

২২ জুলাই ১৭৭৮।

উপস্থিত।

মহামান্য ওয়ারেণ হেষ্টিংস গবর্ণর জেনেরেল, সভাপতি

মেষ্টর বারওয়েল, ফ্রান্সিস্, হুইলার — মেম্বরগণ

কৌন্সিলের অধিবেশন হইল। জমাদার

কৌন্সিলে রাজস্ব আদায় সম্বন্ধীয় নিয়ম পর্য্যালোচিত হইবে বলিয়া,পূর্ব্বেই স্থিরীকৃত হইয়া রহিয়াছে। কৌন্সিলের সভাপতি গবর্ণর জেনেরেল ওয়ারেণ হেষ্টিংস কৌন্সিলের কার্য্যারম্ভে দণ্ডায়মান হইয়া বলিতে লাগিলেন—

"মহামান্ত কোর্ট অব ডিরেক্টর তাঁহাদের ১৭৭১ সালের ২৮ আগষ্টের পত্রে নবাব মহম্মদ রেজা খাঁকে বরখাস্ত করিয়া, কোম্পানির ইংরাজ কর্ম্মচারিদিগের হস্তে রাজস্ব আদায়ের ভারার্পণ করিতে লিখিয়াছিলেন। আমরা ডিরেক্টরদিগের আজ্ঞাধীন। সর্ব্বদাই তাঁহাদের আদেশানুসারে কার্য্য করিতেছি। তাঁহাদের প্রাগুক্ত আদেশানুসারে, মহম্মদ রেজা খাঁকে পদচ্যুত করিয়া ১৭৭২ সালের ঘোষণা পত্র দ্বারা কোম্পানির কর্ম্মচারিদিগের হস্তে রাজস্ব আদায়ের ভার এবং পাটনা ও মুরশিদাবাদের ফেক্টরির কৌন্সিলের হস্তে রাজস্ব আদায় সম্বন্ধীয় কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণের ভার অর্পিত হইয়াছিল। তৎপর ১৭৭২ সালের ১৪ মে তারিখের রেগুলেশন (Regulation) দ্বারা পাঁচ সন মিয়াদে দেশের সমুদয় জমি বন্দোবস্ত করা হয়। বাঙ্গলা ১১৭৯ সনের বৈশাখ মাস হইতে এই বন্দোবস্ত আরম্ভ হয়। কোম্পানির রাজস্বের কোন ক্ষতি না হয়, তজ্জন্য আমি স্বয়ং পরিদর্শন কমিটীর (Committee of circuit) অধ্যক্ষ হইয়া সর্ব্বোচ্চ ডাকে জমি পত্তন করিয়াছিলাম। পুরাতন জমিদারগণ পূর্ব্বাপেক্ষা উচ্চতর নিরিখে রাজস্ব দিতে অসম্মত হইয়াছিল বলিয়াই,সর্ব্বোচ্চ ডাকে ভিন্ন ভিন্ন পরগণা নূতন ইজারাদারদিগের সহিত বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল।

"এই বন্দোবস্তের সময় আমাদের সুযোগ্য, ধর্ম্মনিষ্ঠ, সচ্চরিত্র এবং ন্যায়পরায়ণ দেওয়ান মহাত্মা গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ আমার সঙ্গে সঙ্গেই ছিলেন। তিনি সাধ্যানুসারে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানি এবং দেশীয় লোকের হিত সাধনে বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন। তাঁহার সৎপরামর্শ এবং সাহায্য প্রাপ্ত না হইলে, ঈদৃশ উচ্চ নিরিখে জমি পত্তন করিবার সুবিধা হইতনা।

এই প্রকারে পাঁচসন মিয়াদে জমির বন্দোবস্ত করিয়া, প্রত্যেক জিলায় এক এক জন ইংরাজ কর্ম্মচারিকে কলেক্টর উপাধি প্রদান পূর্ব্বক রাজস্ব আদায়ের ভার প্রদান করিয়াছিলাম। কিন্তু কোন কোন জিলার কলেক্টর আদায় উসুলের হিসাব পত্র রাখিতে কিঞ্চিৎ ত্রুটী করিয়াছেন। আর কোন কোন কলেক্টর পুরাতন জমিদারদিগকে উৎখাৎ করিয়া কল্পিত নামে ভূমি নিজ নামে ইজারা লইয়াছিলেন বলিয়া, তাহাদের নামে অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। কোর্ট অব ডিরেক্টর তন্নিবন্ধন এই সকল কলেক্টরের সততা সম্বন্ধে সন্দেহ করিয়াছিলেন। সুতরাং অনতিবিলম্বে আমি ইংরাজ কলেক্টরের পদ উঠাইয়া দিয়া, প্রত্যেক জিলার রাজস্ব আদায়ের ভার আবার বাঙ্গালিদিগের হস্তেই অর্পণ করিয়াছি। এবং এই সকল বাঙ্গালিদিগের কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণার্থ পাটনা, মুরশিদাবাদ, বর্দ্ধমান, দিনাজপুর, ঢাকা এবং কলিকাতা, এই ছয় জিলায় ছয়টী প্রবিন্সিয়াল কৌন্সিল সংস্থাপন করা হইয়াছে।

"কিন্তু এখন দেখিতেছি যে, প্রবিন্সিয়াল কৌন্সিলের দ্বারাও সুচারুরূপে কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে না। এই প্রবি-

ন্সিয়াল কৌন্সিলের ত্রুটী প্রযুক্তই আমরা বিগত ১৭৭৬ সনে অণ্ডারসন, যোগেল এবং ক্রফ্‌ট সাহেবকে পুনর্ব্বার পরিদর্শন কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলাম। রাজস্ব আদায় সম্বন্ধে এখন অনেক বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে। সমুদয় রাজস্ব আদায় হইতেছে না। প্রত্যেক বৎসরই অনেক রাজস্ব বাকী পড়িতেছে। এই সকল বিশৃঙ্খলা নিবারণার্থ আমি এখন প্রস্তাব করিতেছি যে, প্রবিন্সিয়াল কৌন্সিল উঠাইয়া দিয়া তৎপরিবর্ত্তে কলিকাতা নগরে একটী রাজস্ব কমিটী (Revenue Committee) সংস্থাপন করা হউক। মহাত্মা গঙ্গাগোবিন্দ সিংহকে এই রাজস্ব কমিটীর দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করিলে সমুদয় কার্য্যই সুচারুরূপে সম্পাদিত হইবে। সমুদয় বঙ্গদেশের রাজস্ব সম্বন্ধীয় কার্য্যকর্ম্মের ভার গঙ্গাগোবিন্দের হস্তে অর্পণ না করিলে, কোন প্রকার সুশৃঙ্খলা সংস্থাপনের সম্ভব নাই। গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের বিরুদ্ধে আমি কখন বিশেষ কোন অভিযোগ শ্রবণ করি নাই। তিনি এক-বার পদচ্যুত হইলেও তাঁহার ন্যায় বিশ্বস্ত কর্ম্মচারিকে অবশ্যই পুনর্ব্বার নিযুক্ত করিতে হইবে।"

গবর্ণর জেনেরেল হেষ্টিংস সাহেবের বাক্যাবসানে কৌন্সিলের অন্যতম মেম্বর ফিলিপ ফ্রান্সিস্ দণ্ডায়মান হইয়া বলিতে লাগিলেন।

"সভাপতি মহাশয় পূর্ব্ব বন্দোবস্তের কথা উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন যে, এই সমুদয় বন্দোবস্ত আমরা করিয়াছি। কিন্তু এই সকল বন্দোবস্ত আমি করিয়াছি, এই কথা বলিলে আর সত্যের অপলাপ হইত না। পূর্ব্বের সমুদয় বন্দোবস্তই তিনি একক করিয়াছেন; তৎসমুদয় বন্দোবস্তের মধ্যেই সভাপতি মহাশয় এবং তাঁহার পারিষদবর্গের অবৈধরূপে অর্থ সঞ্চয়ের অভিসন্ধি ছিল। *

১৭৭২ সালের রেগুলেসন্ (Regulation) দ্বারা নিয়ম করা হইয়াছিল যে, ইংরাজ কলেক্টরগণ কিম্বা তাহাদের অধীনস্থ বেনিয়ান কিম্বা মুৎসুদ্দিগণ কোন জমি ইজারা লইতে পারিবেন না। কিন্তু সভাপতি মহাশয়ের বেনিয়ান কান্ত পোদ্দার অন্যূন উনবিংশতিটী পরগণা ইজারা লইয়াছে। এই সকল পরগণার পূর্ব্বের জমিদারগণকে তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষের জমি হইতে উৎখাৎ করা হইয়াছে। এদিকে মুঙ্গেরের কলেক্টর বেটম্যান সাহেব ধান্দু বাহাদুর নামক এক জন কল্পিত লোকের নামে মুঙ্গের এবং খারিকপুর পরগণার জমি ইজারা লইয়াছিলেন। এই দুই পরগণার জমিদার অন্যায়রূপে পৈত্রিক জমি হইতে বেদখল হইয়াছে। শ্রীহট্টের থেকারে সাহেব যেরূপ প্রবঞ্চনা করিয়া, কোম্পানির টাকা আত্মসাৎ করিয়াছেন, তাহা কোর্ট অব ডিরেক্টরের পত্রেই বিশেষরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। সভাপতি মহাশয়ের সহোদরসদৃশ কৌন্সিলের অন্যতম মেম্বর মেণ্ডর বারওয়েল বেট্‌মান এবং থেকারে সাহেবের কুক্রিয়া সকল গোপন করিবার নিমিত্ত যে সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাও ডিরেক্টরদিগের প্রাগুপ্ত পত্রে সবিস্তারে বিবৃত হইয়াছে। সুতরাং এই বিষয় অধিক সমালোচনার প্রয়োজন নাই।

* "In the late proceedings of the Revenue Board there is no species of speculation from which the Honourable Governor-General has thought it right to abstain."

"সভাপতি মহাশয়! ১৭৭২ সালের বন্দোবস্তের সময় দেশীয় জমিদারদিগের নিকট হইতে যেরূপ উচ্চ নিরিখে রাজস্ব চাহিয়াছিলেন, তাহা তাহাদিগের দিবার সাধ্য ছিল না। সুতরাং তাহারা অগত্যা আপন আপন পৈত্রিক জমিদারি ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইল। কলিকাতা সহরে যত অসচ্চরিত্র বেনিয়ান ছিল, তাহারাই এই সকল জমিদারের জমি ইজারা লইয়াছে। এই সকল পুরাতন জমিদার কৃষকদিগের প্রতি কখন অত্যাচার করিত না। কিন্তু নূতন ইজারাদারগণ এই সকল ভদ্রবংশীয় জমিদারদিগের স্থলাভিষিক্ত হইয়া, ঘোর প্রজাপীড়ন আরম্ভ করিয়াছে; কোন কোন পরগণা একেবারে জনশূন্য করিয়াছে; প্রজার নিকট হইতে যাহা কিছু আদায় করে, তৎসমুদয় আত্মসাৎ করিতেছে; কোম্পানির রাজস্ব একেবারেই আদায় করে না। ইহাদিগের অত্যাচারে দেশ প্রায় কৃষক শূন্য হইয়া উঠিয়াছে; এবং প্রত্যেক বৎসর কোম্পানির রাজস্ব বাকী পড়িতেছে।

"দিন দিন নূতন নিয়ম প্রচার করিলে, দিন দিন নূতন আইন জারি করিলেই যে শাসন কার্য্যের সমুদয় দোষ নিরাকরণ হইবে, তাহা আমি মনে করি না। এই রূপ নূতন নূতন পরিবর্ত্তনের দ্বারা কোম্পানির অর্থলোভী কর্ম্মচারিদিগকে কেবল দেশ লুণ্ঠনের সুযোগ প্রদান করা হইতেছে। আমি বোধ করি যে, পুরাতন জমিদারদিগের সহিত ভূমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইলে, সকল গোলযোগ মিটিয়া যাইতে পারে।"

কৌন্সিলের অন্যতম মেম্বর মেস্তর বারওয়েল বলিলেন, "জমিদারদিগের সহিত ভূমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিলে জমিদারগণ প্রজাপীড়ন করিবে। দেশীয় জমিদারদিগের চরিত্র বড় ভাল নহে। বর্দ্ধমানের রাণী কিরূপ আচরণ করিতেছেন, তাহা কি মেস্তর ফ্রান্সিস্ জানেন না।"

ফ্রান্সিস্।—দেশের ভদ্রবংশ জাত পুরাতন জমিদারগণ বোধ হয় তত প্রজা পীড়ন করে না। কিন্তু আপনাদিগের বেনিয়ানদিগকে জমিদার করিলে নিশ্চয়ই প্রজাপীড়ন হইবে। কেবল প্রজা পীড়ন কেন? দেশ উৎসন্ন যাইবে, কোম্পানির রাজস্ব ক্রমেই বাকী পড়িবে। মেস্তর বারওয়েল বর্দ্ধমানের রাণীর চরিত্রে দোষারোপ করিতেছেন। এক সময় তিনি বর্দ্ধমানের মহারাণীকে "Vile prostitute" (ঘৃণিত বেশ্যা) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু তাহার, ঈদৃশ আচরণ ভদ্রোচিত বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। বর্দ্ধমানের মহারাণী যে, অতি উচ্চ বংশজাতা ভদ্রমহিলা তাহার কোন সন্দেহ নাই। "সভাপতি মহাশয় যে প্রবিন্সিয়াল কৌন্সিল এবালিশ করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা আমি কখন অনুমোদন করিনা এবং গঙ্গাগোবিন্দ সিংহকে পুনর্ব্বার কোম্পানির কার্য্যে বহাল করা, আমি নিতান্ত অন্যায় মনে করি। বিশেষত কোর্ট অব ডিরেক্টর গঙ্গাগোবিন্দের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে—

(The Roy Royan was the regular channel of such communications as require the interposition of a native, and not Ganga Govinda Singh, whose dismission from Calcutta committee had rendered him an improper person to transact affairs of such moment to the company) বাঙ্গালিদিগের

দ্বারা যে সকল কার্য্য করাইতে হইবে, তাহা রায়রাইয়া করিবেন। সে সকল কার্য্যের ভার গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের হাতে দেওয়া অত্যন্ত অন্যায়। কারণ সে পদচ্যুত হইয়াছে।

ঈদৃশ তর্ক বিতর্কের পর গবর্ণর জেনেরেল ওয়ারেণ হেষ্টিংস দেখিলেন যে, কৌন্সিলের দুইজন মেম্বর ফিলিপ ফ্রানসিস্ এবং হুইলার সাহেব তাহার প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন না। হুইলার সাহেব অল্পদিন হইল এখানে আসিয়া পৌছিয়াছেন। তিনি ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরেলের পদে মনোনীত হইয়াছিলেন। কিন্তু হেষ্টিংস পদ ত্যাগ করিলেন না। সুতরাং হুইলারকে কৌন্সিলের একজন মেম্বর হইয়া এখন থাকিতে হইল।

হেষ্টিংস ইচ্ছা করিলে তাঁহার মতানুসারে কার্য্য করিতে পারিতেন। কিন্তু আজ কাল কোর্ট অব ডিরেক্টর তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। সুতরাং প্রবিন্সিয়াল কৌন্সিল এবালিশ করিয়া কলিকাতা রাজস্ব কমিটী স্থাপন পূর্ব্বক গঙ্গাগোবিন্দ সিংহকে নিযুক্ত করিতে তাঁহার সাহস হইল না।

অনেক তর্ক বিতর্কের পর কৌন্সিল ভঙ্গ হইল। হেষ্টিংস এবং বারওয়েল একত্র হইয়া হেষ্টিংসের গৃহে চলিয়া গেলেন। ফ্রান্সিস্ এবং হুইলার সাহেব আপন আপন গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

শ্রীচণ্ডীচরণ সেন।

মাঘি সপ্তমী নিশি।

(১)

কুহেলিকা-অন্ধকার,
ঘিরিয়াছে চারিধার;
শুক্লা সপ্তমীর নিশি আজি মসিময়;
অর্দ্ধনিশি যায় যায়,
মলিন প্রতীচী গায়
মলিন অর্দ্ধচন্দ্র পাইতেছে লয়।
নিবিড় অরণ্যে ঢাকা,
মৃত চন্দ্রালোকেমাখা,
আকাশের গায় আঁকা, কৃষ্ণ শৈলকায়া,
ক্ষীণালোকে দেখা যায়
ভীম বৃত্রাসুর প্রায়,
আছে ঊর্দ্ধে বিস্তারিয়া ভীমরূপীছায়া।

(২)

মরণের সর্ব্বক্ষম
পরশ-ভীষণতম—
পাইয়ে, শীতল, স্তব্ধ, হয়েছে সকলি;
পুষ্পপত্রে অগণন,
ম'রে আছে সমীরণ;
শাখায় শাখায় মৃত বিহগকাকলি;
শব শত রাখিবুকে,
ধরণী নিস্তব্ধ দুখে;
এমনি নিস্তব্ধ ওরে পরাণ(ও) আমার!
আজি তার আশে পাশে,
কঠোর মৃত্যুর ফাঁসে,
জড়িয়ে পড়িয়ে শত শব আকাঙ্ক্ষার।
শুকান পত্রের প্রায়,
পড়িছে সে শবপায়
প্রফুল্ল নবীন প্রেম, নীরবে কাঁদিয়া;
আর বুঝি ফুটিবেনা,
আর বুঝি ছুটিবেনা,
আর বুঝি মধুময় করিবেনা হিয়া!

(৩)

ঊষার আলোক ভয়া,

স্বপ্নময় গীতে গড়া,
জীবন্ত আনন্দময়ী মূরতি তাহার,
শুকায়েছে অনাদরে ;
কে তারে যতন করে ?
কে চাহে শুকান বুকে স্নেহের আসার ?
ক্রীড়াশীল চক্ষু তার,
প্রতিমূর্ত্তি নিরাশার ;
দারুণ বিষাদ শ্বাসে কাঁপে বিম্বাধর ;
জোছনা নিবায়ে তার
খেলা করে অন্ধকার ;
সুবর্ণ মন্দিরে চর্ম্মচটিকায় ঘর !
প্রেমের আশায় পূর্ণ
হৃদয়ে, অনন্ত শূন্য ;
যারে চায় তারে হায় পায়না,—পাবেনা ;
শুকাবে সে প্রাণ তার,
ইচ্ছা বুঝি বিধাতার ;
দরিদ্রের ঘরে রত্ন রহেনা,—রবেনা !

(৪)

আহা সে নবীন আশা,
প্রাণপূর্ণ ভালবাসা,
কি সুখ তোমার বিধি, দিতে নিবাইয়া ?
সেই তার রূপরাশি,
সে কটাক্ষ, সেই হাসি,
ছিঁড়ি হৃদয়ের শিও, দিতে ভাসাইয়া ?

(৫)

ডুবিল চন্দ্রমা ধীরে ;
তুমিও প্রেয়সি কিরে,
নিঃশব্দে অমনি ধীরে যাবে গো ডুবিয়া ?
ভুলিবে এ দরিদ্রের
শত যত্ন আদরের,
বিস্মৃতির বিষরাশি চুমিয়া চুমিয়া ?
ছিঁড়িয়া মায়ার বাধা,
ভাঙ্গিয়া স্বপ্নের ধাঁধা ।
পায়ে দলি, হায় হায়, বাসনা আমার,
ওই মৃত প্রকৃতির
স্তব্ধ কোলে রাখি শির,
ঘুমাবে ? ঘুমাবে তুমি প্রেয়সি আমার ?

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার ।

জীবন-গান ।

জীবন একটী গান,
বিষাদ একটী তান,
আনন্দ একটী তান,
হাসি আর অশ্রুমাখা
স্বপন-রচিত গীত,
নিখিল ব্রহ্মাণ্ডযোড়া
অনন্ত সঙ্গীত ।

১

সন্ধ্যার আকাশ-গায়
ভাঙ্গা ভাঙ্গা মেঘগুলি
সিঁদুরে মাখিয়াছিল,
বাতাসে উড়িয়া গেল !
আঁধার ঢাকিল তায় !
রামধনু আঁকা ছিল
নীলিমার কোল যুড়ে,
দিগঙ্গনা-মুখে হাসি
এই ছিল রাশি রাশি
তাও যে মিশিয়া গেল !
সুখের স্বপন গুলি
ঘুমাইয়াছিল প্রাণে,
ভেবেছিনু ধরি ধরি
মরমে রাখিব ভরি,
উড়ে গেল পাখা তুলি !

ওই যায়! ওই তারা!
সারি সারি যায় চো'লে!
অনন্ত আকাশ ছে'য়ে
কি যেন কি গে'য়ে গে'য়ে;
এখনও পেতেছি সাড়া!
অনন্ত আকাশে লিখা
অনন্ত গানের ধারা!

২

বিবাদ আঁধার কো'রে
ঝটিকার আগে আগে
দুখের কাহিনী গে'য়ে
শোক শিঙ্গা বাজাইয়ে
আসিল! আসিল ওই!
মরম ফেলিল ভো'রে!
আয় শোক দুঃখ গুলি,
ভাঙ্গাচুরা প্রাণ খানি
রাখি (স্) নে একটু খানি!
ঢে'লে দেনা তপ্ত বালি,
সাজানা অনন্ত মরু?
আয় উ'ড়ে পাখা তুলি!
খু'লেছি মরম দ্বার
আগুন, গরল, ব্যথা,
অপমান, নির্যাতন,
অবহেলা, দুর্ব্বচন,
পদাঘাত রাশি রাশি
কো'রে রাখ্ স্তুপাকার!
নীরব হবেনা প্রাণ,
গাইবে নির্ভয়ে তবু,
আছি সুখে আছি ভাল,
আঁধারে মধুর আলো
নিভৃত মরম-তলে
জলে নিশা-দিনমান,
অনন্ত আকাশময়
অনন্ত আনন্দ গান!

৩

কে যেন বাজা'রে বাঁশী
ফুলের বাগানে একা
জোছনায় বো'সে বো'সে
গাইল নিশীথ-গান।
তান গুলি খো'সে খো'সে,
জোছনায় মি'শে গিয়া
ভরিয়া ফেলিল প্রাণ!
গান গুলি দূরে দূরে
বসন্ত অনিলে উড়ে
স্তবধ জগত বুকে
ঘু'রে ঘু'রে, ফি'রে ফি'রে,
গুমরে, গুমরে কত
কেঁদে কেঁদে ছু'টে গেল!
কত যে হিয়ার দ্বারে
আঘাত করিল জোরে।
সকলি ঘুমা'য়ে ছিল
স্বপন বুকেতে চেপে
গলা-ধো'রে চু'মে চু'মে,
অনন্ত মরণ-কোলে।

৪

আকাশে সুন্দর চাঁদ
পাতিয়া প্রেমের ফাঁদ
জোছনা রূপসীগনে
ঘুমে ছিল বিছানায়,
ছানা ছানা শিশুগুলি
কিরণের ফুল গুলি
তারা গুলি ঘিরে ঘিরে
শুয়ে ছিল নীলিমায়।
পবিত্র প্রেমের আভা
জগতে ঘুমন্ত শোভা
ছড়ায়ে ভিজিতেছিল
ফোঁটা ফোঁটা নিশাজলে।

গান গুলি কেঁদে কেঁদে
কত কি মলিন চাঁদে
কত কি মলিন যেন
জোছনায়, ফু'লে ফু'লে

৫

শুনেছি সে গান গুলি
একাকী সংসার ভুলি
স্তবধ নিশীথ-কোলে
ভাঙ্গা ঘরে শু'য়ে শু'য়ে।
ছিল না ঘুমের ঘোর
ছিনুনা স্বপনে ভোর
কত কি মধুর গাথা
গেল দূরে গে'য়ে গে'য়ে।
আজিও জোছনা হো'লে
দেখি তার বুকে দোলে
স্তবধ নিশায় সেই
ভাঙ্গা ভাঙ্গা তান গুলি।
এখন ও মরম তলে
থেকে থেকে উঠে ফু'লে
কত কি আনন্দ-গাথা
কত কি সুখের বুলি!
মধুর স্বপন মাখা
সে সুধাতরঙ্গ গুলি!

৬

"জীবন সঙ্গীত নহে
বিষাদের গান
সুধায় গরলে মাখা
ভাঙ্গা ভাঙ্গা তান।
আনন্দ কাহিনী শুধু
শুধু মাখা প্রাণ
অপার অনন্ত গীতি
সুধার সমান
প্রেমের সাগর বক্ষে
অমৃতের বাণ।"

শ্রীবিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায়।

আকাশ-বাণী।

(১)

অনন্ত আকাশ পথে, কে যেন ডাকিয়া যায়,
"আয়, আয়, আয়!"
শুনিয়া পরাণ কাঁদে,
পড়িয়া রহিনু ফাঁদে,
প্রাণের বাসনা, আমি বারেক উড়িয়া যাই!
অবিরাম কালস্রোতে মিশিয়া মিলিয়া যাই!

(২)

আবার অনন্ত-পথে কে ওই ডাকিয়া যায়,
"আয়, আয়, আয়!"
উড়ু২ প্রাণ-পাখী,
শিশির ঝরিছে আঁখী।
ভবসিন্ধু উপকূলে,
একেলা নয়ন তলে;
উড়ু২ প্রাণ পাখী! কেমনে উড়িয়া যাই!
জনম শৃঙ্খলে বাঁধা, যাইব কেমনে ভাই!!

(৩)

কে তুমিগো! কে তুমিগো!
কে আজি এদীনে ডাকো!
অভাগার কেউ নাই,
ডাকিতে, আপনা ভাই!
আজিও আকাশ-মুখে কে ডাকিল, "আয়, আয়।"
আশার বাতাসে প্রাণ, উড়িয়া যাইতে চায়!

(৪)

সুমিত্র মহাত্মাগণ, ওপার হইতে ডাকে,
সে মহা আশ্বাস বাণী, পরশিল শ্রুতি পথে।
"মাভৈ-মাভৈ" রব সুদূরে উঠিছে ওই।

ত্যজি মোহ,মায়া ভয়,আমি যাই! আমি যাই!
অনন্ত বিমান পথে এখনো ডাকিয়া যায়,
"আয়, আয়, আয়!"
শুনিয়া পরাণ কাঁদে!
কাটিলাম মোহ ফাঁদে,
প্রাণের বাসনা, আমি বারেক উঠিয়া যাই!
অবিরাম কালস্রোতে মিশিয়া মিলিয়া যাই!

শ্রীচন্দ্রকান্ত সেন।

বাঙ্গালার বর্ব্বর জাতি।

নাগা।—বাঙ্গালার পূর্ব্বভাগে "মণিপুর" পর্ব্বতে ইহাদিগের বাস। আমরা ইহাদিগকে নাগা ও কুকি দুই দলে বিভক্ত করি। মণিপুরিরা ইহাদিগকে কুপুই, কোইরেং, কং-সোল, খোংহৈ, কোং, চিরু, চোট, পুরু, মুণ্টুক, কারুং, মুরিং, টাঙ্কুল, লুহপ, মৌ, মুরাং, মিয়াংখাং, নামে প্রভৃতি সম্প্রদায়ে বিভক্ত করে। পাহাড়িয়ারা এ সকল নাম ব্যবহার করে না। তাহারা আপনাদিগকে অন্য নামে অভিহিত করে। এই সকল জাতি দিন দিন ধ্বংস হইতেছে। পূর্ব্বে যাহারা বিস্তৃত বনভূমের অধিকারী ছিল, এখন দু তিন খানি গ্রামেই তাহাদের সঙ্কুলান হইতেছে। সংখ্যায় অল্প হইলেও ইহাদের প্রত্যেকের ভাষা স্বতন্ত্র এবং আচার ব্যবহার ভিন্ন।

কাছাড় ও মণিপুরের মধ্যগত পাহাড় সকলে কুপুইরা বাস করে। ইহারা বড় ঝগড়াটে প্রিয়। যে জাতির সহিত বিবাদ থাকে, পার্ব্বতীয় কোন নদী তাহাদের-দেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইলে, ইহারা সে নদীর জল স্পর্শ করেনা। অন্যান্য বর্ব্বরদিগের ন্যায়, ইহারাও জাতিবর্গ মিলিয়া এক এক গ্রামে বাস করে, গ্রামগুলি এত নিকটে থাকে যে, আবশ্যক হইলে একটা প্রাচীর দ্বারা সকল গুলিকে সহজে বেষ্টন করা যাইতে পারে। পৈতৃক বাস্তু ও জন্মভূমি বলিয়া ইহারা গ্রাম গুলিকে বড় ভাল-বাসে। কোন কারণে গ্রাম পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলে, গ্রামে ফিরিয়া যাইতে বড়ই আগ্রহ প্রকাশ করে। পাহাড়ে জায়-গায় উঠা নামা দুষ্কর, একটা ঝরণার জল অনেক গুলি গ্রামের লোক ব্যবহার করে, সুতরাং দূরস্থ গ্রামের স্ত্রীলোকেরা বড় কষ্টে জলসঞ্চয় করে, তথাপি পৈতৃক ভিটা পরি-ত্যাগ করিয়া, কেহ ঝরণার নিকটে উঠিয়া যাইবেনা। সোজাপথ দুর্গম হইলেও তাহা ছাড়িয়া, ইহারা সুগম বাঁকা পথে চলেনা। ইহা পৈতৃক ব্যবস্থা-প্রিয়তা-জাত, কি উত্তরা-ধিকৃত প্রাচীন অভ্যাস-মূলক, বলা যায় না। যাহাই হউক অন্যান্য বর্ব্বরদিগের ন্যায় ইহারাও যে বড় স্থিতিশীল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ইহারা ধানের চাস করে; কিন্তু জমীতে সার এত অল্প যে, যে জমিতে একবার চাস হয়, দশবৎসর আর সেখানে কিছু হয় না। দশবৎসরে গাছের সারে জমী সারবান হইলে, আবার তাহাতে চাস করে। জঙ্গল কাটিয়া কিছুদিন শুখাইয়া, ইহারা তাহাতে আগুণ লাগাইয়া দেয়; গাছের ক্ষার পাহাড়ে জমীর প্রধান সার। চাসে ধানও অধিক হয়না। বন্যা, ঝটিকা, পর্ব্বত-জাত পশু, পক্ষীর অত্যাচার ইহাদের চাসের নানা অন্তরায়। পালে পালে ইন্দুর আসিয়া মাঠ আক্রমণ করে। জলে কি আগুণে কিছু-তেই তাহাদের আক্রমণ নিবারণ করা যায়

না। ইহারা লাঙ্গল চালাইতে জানেনা। কোদালি দিয়া লাঙ্গলের কাজ করে। ইহারা বলে, ইন্দুরগুলি কখন কখন পাখী হইয়া পড়ে। বন্যকচু ইহাদের প্রধান আহার। মণিপুর পাহাড়ে কচু অপর্য্যাপ্ত জন্মে। ইহারা চালা ঘরে বাস করে। খুঁটি গুলি এত শক্ত যে, ত্রিশ, চল্লিশ বৎসরেও বদলাইতে হয় না। এবং ঘাস দিয়া এমন ছাইতে পারে যে, একবার ছাইলে দশ বার বৎসর চলিয়া যাইতে পারে। প্রায় সকল গৃহস্থেরই এক একটী গোলা আছে। বাড়ী হইতে গোলাঘর কিছু দূরে। কিন্তু গোলা ঘরে কখনও চুরী হয় না। ইহারা শূকর ও মুরগী পুষে। সকালে উঠিয়া কুপুই-রমণী ধান ভানে, তার পর রন্ধন করে। সূর্য্যোদয়ের সময়েই প্রাতর্ভোজ সমাধা হয়। তাহার পর রমণীরা বাঁশের চোঙ্গা লইয়া ঝরণা হইতে জল আনিতে যায়। জল আনা হইলে, কাঠ সংগ্রহ করে। তাহার পর সুতা কাটিতে, কাপড় বুনিতে, মদ চোয়াইতে বা অন্যান্য গৃহকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। ঘরটী ঝাট দিয়া পরিষ্কার করা, কুপুই রমণীর কর্ত্তব্যমধ্যে পরিগণিত নহে। ইহারা বড় অপরিষ্কার। যে ঘরে রাঁধে, সেই ঘরে শোয়। সম্মুখের ঘরে শূকর, মুরগী, তুষ ও ময়লায় পরিপূর্ণ থাকে। শয়ন ঘরের বাহিরের চালাখানী বসিবার ঘর। তাহার দুই পার্শ্বে বসিবার বা শুইবার জন্য দুইটা মাচা থাকে। মাঠে কাম না থাকিলে, পুরুষেরা মদ খায় ও গল্প করে। বাড়ীর পার্শ্বে ইহারা আত্মীয় স্বজনের কবর দেয়। সেই কবরের উপর বসিয়া সকালে ও সন্ধ্যায় ইহারা গল্প করে। গল্পের সময় এত চিৎকার করে যে, ঝগড়া হইতেছে বলিয়া ভ্রম হয়। তামাক ইহাদের প্রধান নেশা। তামাক খাইতে এত জোরে টান মারে যে, হুঁকার সব জল টুকু মুখের ভিতর আশ্রয় লয়।

ইহারা পঞ্চায়েৎ দ্বারা সকল মোকদ্দমার মিমাংসা করে। বিবাহিত ব্যক্তি চুরী করিলে বড় শাস্তি পায়। কিন্তু অবিবাহিত লোকে মাঠ হইতে ধান চুরী করিলে, কোন সাজা হয় না। অবিবাহিত লোকের অনেক অপরাধ ক্ষমা করা হয়। অবিবাহিত যুবক যুবতীরা বাড়ীতে নিদ্রা যায় না। গ্রামের মধ্যে একটা স্বতন্ত্র ঘরে, গ্রামের সকল যুবক, ও আর একটা ঘরে সকল যুবতী রাত্রিকালে একত্রে থাকে। একটা ঘরে না কুলাইলে দুই তিনটাতে থাকে। বয়োজ্যেষ্ঠ এই ঘরের কর্ত্তা। তাহার হুকুম সকলকে মানিতে হয়। যুবক ও যুবতীদিগের মধ্যে নৃত্যগীত যথেষ্ট চলে। কিন্তু ব্যভিচার হয় না। কুপুইরা চারিগোত্রে বিভক্ত। আপন গোত্রে বিবাহ হয় না। একত্র আমোদ আহ্লাদে যুবক যুবতীর প্রণয় হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। কিন্তু বিবাহকালে কর্ত্তৃপক্ষ আপন পছন্দ মত বিবাহ দিয়া থাকে। এক একটী বধুর মূল্য সাতটী মহিষ, দুখানি দা, দুখানি কোদালি, দুখানি বর্শা, দুছড়া কড়ির মালা, দুটী কান ফুল, দুখানী কাপড়, দুখানী থালা এবং কিছু যৌতুক। দরিদ্র লোকে ইহা অপেক্ষা অল্প দেয়। কিন্তু যে পুরা মূল্য দিতে পারে, তার বড় গৌরব হয়। আর কিছু দেওয়া হোক বা না হোক, যৌতুক না দিলে বিবাহ সম্পূর্ণ হয় না। এদেশে যৌতুকের নাম "মিলন"। বিবাহ মনোমত না হইলেও ব্যভিচার-

কচিৎ ঘটে। কখন কখন যুবক যুবতী মনোমতকে লইয়া, কোন বন্ধুর গৃহে পলায়ন করে। কিছু ধমক ধামকের পর, সব গোল মিটিয়া যায়। ব্যভিচারীর প্রাণদণ্ড হয়। ব্যভিচারী প্রাণ ভয়ে প্রায়ই পলায়ন করে, তখন অত্যাচারিত স্বামী তাহার গৃহসম্পত্তি লুণ্ঠন বা ধ্বংস করে। ব্যভিচারিণীর আত্মীয় স্বজন বিবাহপ্রদত্ত মূল্য ফিরাইয়া দিতে এবং তাহার দেনা শোধ করিতে বাধ্য। স্ত্রীর বা পুত্র কন্যার মৃত্যু হইলে, শ্বশুর-বংশের ক্ষতি পূরণার্থ স্বামীকে অস্থি মূল্য বলিয়া "মুণ্ডু" দিতে হয়। "মুণ্ডু" একটী মহিষের দাম। বিসূচিকা, বসন্ত ও বাত রোগে মৃত্যু হইলে এবং শত্রুহস্তে বা কোন পশু কর্ত্তৃক হত হইলে, "মুণ্ডু" দিতে হয় না। প্রসবকালে মৃত্যু হইলে জীবিত সন্তানকে প্রসূতির সহিত কবর দিতে হয়। স্বামীর মৃত্যু হইলে স্ত্রীকে দেবর গ্রহণ করে। স্বামীর বংশে কোন পুরুষ থাকিতে রমণী পিতৃ গৃহে ফিরিতে পায় না। ইহাদের মধ্যে বহু বিবাহ প্রচলিত আছে। প্রথম পুত্রের জন্মোপলক্ষে নৃত্যগীতের ঘটা পড়িয়া যায়। ঢোল ভিন্ন ইহাদের অন্য বাজনা নাই। ইহারা বড় প্রফুল্ল প্রকৃতি। গান মুখে লাগিয়াই আছে; যখন যে কাজে থাকুক, গান চলিয়াছেই। কাজের ব্যস্ততা যত অধিক হয়, গানের হাউ হাউ রব তত উচ্চ হইতে থাকে। ইহাদের রমণীরা পূর্ণবসনা, কিন্তু পুরুষ দিগের কোমরে কেবল একটু কাপড় জড়ান থাকে, তাহার একাগ্র সম্মুখ ভাগে একটু ঝুলিয়া থাকে। ইহারা বড় অলঙ্কার প্রিয়। কুমারীরা স্ফটিকমালা ও কাঁশার গহনায় সর্ব্বদা সজ্জিত থাকে। উৎসবের সময় পুরুষেরা গলায় রাঙ্গা পাথরের মালা পরে। এই মালা বংশানুক্রমে সযত্নে রক্ষিত হয়। পুরুষেরা খুব ছোট করিয়া চুল ছাটে, যার চুল যত দাঁড়াইয়া থাকে, তাহার তত গৌরব।

বড় মানুষের মৃত্যু হইলে, মহিষ মারিয়া আত্মীয় স্বজনকে ভোজন করাইতে হয়। গরিবে ছাগল বা শূকর মারিয়া শ্রাদ্ধ করে। ইহারা মৃতদেহ কবর দেয়। জামাতা বা আত্মীয় স্বজন দিগকে কবর খনন করিতে হয়। যাহারা এই কার্য্য করে, মৃতের উৎকৃষ্ট অস্ত্র (দা ও বর্শা) তাহাদিগকে দিতে হয়। মৃতদেহের সহিত একখানি কোদালি ও কিছু অস্ত্র শস্ত্র কবরে দিতে হয়।

ইহাদের মধ্যে নানাপ্রকার পর্ব্ব আছে। অগ্রহায়ণ মাসে ইহাদের বড় দিন। সকলে নুতন পোষাক পরে এবং নৃত্য গীত ও পান ভোজনে পাঁচ দিন আনন্দে অতিবাহিত করে। এই সময়ে গ্রামের চারি দিকে দুর্গের ন্যায়, যে গড় থাকে তাহার মেরামত করা হয় এবং এই সময়ে দুই প্রহর রাত্রিতে একজন গ্রামের সিংহদ্বারে যাইয়া দৈব পরীক্ষা করে। যদি কাঠ টানিবার শব্দ শুনা যায়, বুঝিতে হইবে নূতন বৎসরে বাঘে বড় দৌরাত্ম্য করিবে; যদি পাতা কাটিবার শব্দ পাওয়া যায়, বুঝিও মড়ক হইবার সম্ভাবনা। পৌষ মাসে বিজনৈ পর্ব্ব, ইহা তিন দিন ব্যাপী। ইহারা এইদিন স্ত্রী পুরুষ সম্পূর্ণ পৃথক হয়। প্রত্যেকে আপন আপন জল আনে, আপন আপন রন্ধন করে এবং স্বতন্ত্র ভাবে ভোজন করে। একটী কদলিতে মনুষ্যের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া, গাছে ঝুলাইয়া দিয়া তীর, বর্শা ও লাঠি আঘাত করিতে হয়। মাথায় আঘাত করিতে

পারিলে বুঝা যায়, হননকারী নববৎসরে একজন শত্রু বিনাশ করিবে; উদরে আঘাত করিলে, অপর্য্যাপ্ত আহার্য্য মিলিবার সম্ভাবনা। এই সময়ে পিতৃলোকের কবরে মদ্যাদি পানীয় সিঞ্চন করিতে হয়।

পীড়া হইলে কুপুইরা ঔষধ সেবন করে না। দেবতার নিগ্রহে পীড়ার উৎপত্তি। শরীরে ঔষধ দিয়া শান্তির সম্ভাবনা কোথায়? এজন্য ওঝা ডাকাইয়া স্বস্ত্যয়ন করিতে হয়। দেবতার কোপশান্তি সহজ নহে। স্বস্ত্যয়নে ও পুরোহিত সেবায় কাহাকে কাহাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়, তখন স্ত্রী, পুত্র, কন্যাকে বিক্রয় করিয়া, পুরোহিতের আদেশ প্রতিপালন করিতে দেখা গিয়াছে। সুতরাং কুপুইর পীড়া হইলে আশু আরোগ্য বা আশুমৃত্যু একান্ত বাঞ্ছনীয়।

কুপুইরা নানাবিধ দেবতায় বিশ্বাস করে। প্রত্যেক অগম্য বন, জঙ্গল, পর্ব্বতশৃঙ্গ ও গিরিগুহায় এক একটী দেবতা বাস করে। ছাগ, কুক্কুট ডিম্ব, আর্দ্রক, কার্পাস বা পল্লব পত্র উপহার দিয়া দেবতার মনোরঞ্জন করিতে হয়। ইহারা জাতি ভেদ মানে না, এবং ছাগ, কুক্কুট, শূকর, গাভী সকলই আহার করে। কিন্তু দুগ্ধ পান করে না। দুগ্ধ ইহাদিগের অখাদ্য।

কুকী।—পৈ, সুতী, তাউতী, লুসাই প্রভৃতি জাতীর সংখ্যা অতি অল্প। কুকী বা খোঞ্জাইরা সংখ্যায় অনেক। কুকীরা বলে, তাহাদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা পাতালে বাস করিত। একদিন তাহাদিগের রাজার ভ্রাতা বনে সজারু শীকার করিতেছিল। একটী সজারুর পশ্চাতে ছুটিয়া তাঁহার কুকুর একটি গহ্বরে প্রবেশ করে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া, কুকুরের সন্ধান না পাইয়া, তিনি তাহার অনুসরণ করেন, এবং দৈবক্রমে ভূপৃষ্ঠে উপস্থিত হন। প্রত্যাগত হইয়া, তিনি রাজাকে এই সকল কথা বিদিত করেন এবং দলে বলে নূতন রাজ্যে উঠিয়া যাইতে পরামর্শ দেন। সেই পরামর্শ মত রাজা প্রজাদিগকে লইয়া মহাপ্রস্থান অবলম্বন করেন। ভূপৃষ্ঠের নিকটবর্ত্তী হইলে, তাহারা দেখিল, এক বিশালকায় বাসুকী তাহাদের পথ অবরোধ করিয়া শুইয়া আছে এবং সুড়ঙ্গের বহির্ম্মুখে এক বৃহৎ পক্ষী নখপুটে এক বৃহৎ উপলখণ্ড ধারণ করিয়া বসিয়া আছে। রাজার ভ্রাতা সর্পকে হত্যা করিলে, প্রজাদিগের অনেকে সুড়ঙ্গ অতিক্রম করিয়া পৃথিবীতে উপস্থিত হয়। এই সময় রাজার স্মরণ হইল যে, কোন কোন বিশেষ প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান পদার্থ তিনি ছাড়িয়া আসিয়াছেন। সে গুলি আহরণ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, পক্ষী নখপুটে লম্বমান উপলখণ্ড পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। রাজদম্পতি বাহির হইতে পারিল না। রাজমহিষী ভাবিয়াছিলেন, দেবর আপনি রাজা হইবার লোভে উর্দ্ধমুখ বন্ধ করিয়া দিয়াছে, এজন্য তিনি তাহাকে অভিসম্পাত করেন। সেই শাপে কুকীরা রোগ যন্ত্রনা অদ্যাবধি সহ্য করে এবং রাজমহিষীর পূজা দিয়া যন্ত্রনার উপশম করিতে চেষ্টা পায়।

কুকীরা এখন যেখানে বাস করিতেছে, পূর্ব্বে কুপুইরা সেখানে বাস করিত। কুকীরা নানা দলে বিভক্ত হইয়াছে, যথা;— থুরুগুম, চাংসেল, থাডো, সিং সোন, চোংলী, হাংকিন, কিপগেন, হাংকিপ, চোংকুট, ভেলসোক, হোকটিং মাড্ডুং ছুন্টুং ইত্যাদী। কুকীগ্রাম নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে, কিন্তু এক

এক গ্রামের অধিবাসী কয়েকঘর মাত্র। ইহারা পূর্ব্বে একস্থানে স্থির হইয়া বাস করিত, এখন নানা কারণে নানাস্থানে বেদিয়া ব্যাধের মত ঘুরিয়া বেড়ায়, এজন্য তাহাদের গৃহ কুপুইদের মত বৃহৎ বা দৃঢ় নহে। ইহারা অনাবৃত ক্ষেত্রে বাস করিতে ভালবাসে না। বাঁশের দরমার বেড়া দিয়া এবং বাঁশের মাচা প্রস্তুত করিয়া, তাহার উপর চাল তুলিয়া দিলেই একখানি ঘর হইল। কেবল রাজার বাড়ী অপেক্ষাকৃত বৃহৎ। এবং তাহার সম্মুখে একখণ্ড নির্ব্বৃক্ষ ক্ষেত্র অবস্থিত থাকে। সকলেরই বাড়ীর চারিদিকে বেড়া দেওয়া থাকে।

কুকী-রাজার ক্ষমতা সামান্য নহে বা অন্য অসভ্য রাজার ন্যায়, তিনি নাম মাত্র রাজা নহেন। প্রত্যেক গৃহস্থ বৎসরে তাঁহাকে এক সলি ধান্য দেয় এবং কোন কোন গ্রাম হইতে, তাঁহাকে শূকর, কুক্কুট প্রভৃতি কর স্বরূপ দিতে হয়। বিবাহ করিতে বা দ্রব্যাদি বিক্রয় করিতে, রাজাকে ট্যাক্স দিতে হয়; এতদ্ভিন্ন মৃগয়ালব্ধ সম্পত্তির রাজা এক অংশীদার। রাজার চাষবাস, গৃহ নির্ম্মাণ প্রভৃতি কার্য্যে প্রজাদিগকে নিয়মমত বেগার দিতে হয়।

আমাদের মত কুকীদিগের চূড়াকরণ ও বিবাহের বিশেষ ব্যবস্থা আছে। পুত্র পাঁচ দিন পরে, ও কন্যা জন্মের তিন দিন পরে, তাহার নামকরণ কর্ণবেধ ও মস্তক মুণ্ডন করিতে হয়। বিবাহ স্থির হইলে, উভয়পক্ষে একত্র সুরাপান করিয়া পত্র করিতে হয়। এবং কন্যার পিতাকে যৌতুক দিতে হয়। যৌতুকের পণ স্থির হইলে আত্মীয় স্বজন কন্যাকে লইয়া পাত্রের গ্রামে উপস্থিত হয়। পাত্রের আত্মীয় স্বজনের সহিত কন্যার আত্মীয় স্বজনের একটা আপোষলড়াই হইয়া থাকে। তাহার পর কন্যা কিছু খাদ্য দ্রব্য লইয়া স্বামী গৃহে উপস্থিত হয়। রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র পিতার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী, অন্যান্য পুত্রদিগকে পিতা রাজ্যের কিয়দংশ ভাগ করিয়া দেন। স্ত্রীলোক কখন সিংহাসনে বসিতে পারে না। তাই বলিয়া, কুকীরাজ্যে নারীজাতির আধিপত্য সামান্য নহে। সাধারণত রাজমহিষী রাজকার্য্যে বিশেষ সাহায্য করিয়া থাকে এবং পুত্রের নাবালক অবস্থায়, তাহার বিধবা মাতাকে তত্ত্বাবধারণ করিতে দেখা যায়।

কুকীরা ক্ষুদ্রকায়, বলিষ্ঠ ও শিরাল। পা দুখানি ছোট ছোট কিন্তু হাত দুখানি দীর্ঘতর। বর্ণ বাঙ্গালীদিগের মত। মুখ গোয়াল, দীর্ঘে প্রস্থে সমান, চিবুক উচ্চ, চোখ ছোট ও নাক চাপা। কুকীরমণী নাগা বা কুপুনি রমণীর মত স্থূলকায় ও কর্ম্মিষ্ঠা। কুকী পুরুষেরা নাগা পুরুষদিগের মত অলস প্রকৃতি, তবে নাগারা অলসতর। কুকী পুরুষ, রমণী, বালক, সকলেই বড় তামাকুপ্রিয়। মাচায় বসিয়া, তামাক খাইতে ও গল্প করিতে পুরুষদের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়। সর্ব্বদাই ইহাদিগকে তামাকু সেবন করিতে দেখা যায়। কত ছিলিম তামাক খাইয়াছে, গণনা করিয়া ইহারা সময় নিরূপণ করে। ইহারা হুঁকার জল ফেলিয়া দেয় না, বাঁশের চোঙ্গায় রাখিয়া দেয় এবং মধ্যে মধ্যে কুল্লি করে এবং বন্ধুবান্ধবের সহিত সাক্ষাৎ হইলে, অর্ঘ্য স্বরূপ তাহাকেও উহার কিঞ্চিৎ উপহার দেয়। ধূমপান ভিন্ন, ইহারা তামাকু চর্ব্বণ করিয়া থাকে।

কুকীরা বড় অপরিষ্কার, বেশভূষা প্রায় নাগাদের মত। তবে কৌপীন ছাড়িয়া একটী কাপড় গায় জড়াইয়া থাকিতে ইহারা ভালবাসে এবং সাধারণত ঐরূপ করিয়া থাকে। কুকীরমণীরা কোমরে একখান ছোট কাপড় জড়াইয়া রাখে, যুবতীরা বুকেও একখান জড়াইয়া থাকে। ইহাদের কেশরাশী ইহারা সম্মুখে খোপা বাঁধিয়া রাখে। আচার, ব্যবহার ও চিকিৎসাব্যবস্থা কুকী ও নাগাদিগের প্রায় একরূপ। নাগাদিগের ন্যায় ইহাদের মধ্যেও মুণ্ডু দিবার নিয়ম আছে। ইহারা মুণ্ডুকে লংমুল বলে। নাগাদিগকে কুকীদের অপেক্ষা প্রফুল্লতর বোধ হয়। নৃত্য বিদ্যায় নাগা, ও সঙ্গীতে কুকীরা শ্রেষ্ঠ। যুদ্ধের নিম্নেই কুকীরা মৃগয়াকে পুরুষোচিত কর্ম্ম বলিয়া ব্যাখ্যান করে। শীকারে ইহাদের বড় আমোদ। বিষাক্ত তীর সংযোগে ইহারা ব্যাঘ্র হরিণাদি শীকার করে। বংশখণ্ডে বৃক্ষ বল্কলের ছিলা দিয়া, ইহারা ধনুক নির্ম্মাণ করে। তীর গুলি একহাত লম্বা। অন্যান্য জাতির ন্যায় ইহারা ছিলাটীকে "আকর্ণ" আকর্ষণ করেনা, "আবক্ষ" করিয়া থাকে। সুতরাং তীরের বেগ অধিক হয় না। বেগের হ্রস্বতা, ইহারা তীরাগ্রস্থ বিষের তীব্রতায় পূর্ণ করে। বনমধ্যে মৃগের পদ-চিহ্ন অনুসরণে ইহাদিগের অদ্ভুত ক্ষমতা এবং এমন নিঃশব্দে গতায়াত করিতে পারে যে, ব্যাঘ্র, বিড়ালেরও বিস্ময়কর। হস্তী মারিতে ইহারা বিষাক্ত বর্শা ব্যবহার করে। আজকাল বন্দুক ব্যবহার করিতেও শিখিয়াছে। কোন জন্তু বধ করিলে তদধিষ্ঠাত্রী দেবতার পূজা করিয়া, তবে আত্মসাৎ করে এবং সমাজ দরবারে উপাধি পায়। ইহাদিগের শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা নাগাদিগের মত। রাজা কি অন্য কোন বড় লোকের মৃত্যু হইলে, ইহারা তাহার মৃতদেহ আগুনে ভাজিয়া, দুএক মাস ঘরে রাখিয়া, তাহার পর কবরসাৎ করে। এই সময় মধ্যে বিস্তর মিথুন, গাভী, মহিষ, ঘোটক শূকর, ছাগ ও কুকুরেরও শ্রাদ্ধ করিয়া আত্মীয় স্বজনকে তৃপ্ত করিতে হয়। হত জন্তুর মাথা গুলি মৃতদেহের নিকট জমা করিয়া দেয়। মৃত ব্যক্তি সে গুলি পরলোকে ব্যবহার করে। ইহারা বসন্ত রোগকে বড় ভয় করে। কাহারও বসন্ত হইলে, ইহারা তাহাকে কিছু আহার্য্য ও পানীয় দিয়া বনের মধ্যে ফেলিয়া আসে। কুকীদিগের মধ্যে বংশমর্য্যাদার বিশেষ প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। আমরা হীনতর জাতীকে হুঁকা দেই না, ইহারা চিরুণী দেয় না। হিন্দুদিগের কে কোন সম্প্রদায়ের অন্তর্গত, কপালে টীকা দেখিয়া অনুমান করা যায়, কুকীদিগের মধ্যে খোপার অবস্থান দেখিয়া সম্প্রদায় নির্ণয় করিতে হয়। মুরিঙ্গ সম্প্রদায় শৃঙ্গের মত করিয়া চুল বাঁধে। মণিপুরের সম্ভ্রান্ত বংশীয়েরা শিঙের মত করিয়া মাথায় পাগ বাঁধে। রাজদরবারে দেখিয়াছি, উড়িষ্যার রাজারা রাজবেশ করিবার সময় কাপড় দিয়া লাঙ্গুল প্রস্তুত করে। যাহার লাঙ্গুল যত দীর্ঘ, সে তত সম্ভ্রান্ত। মণিপুরী মুরিঙ্গ জাতীর মধ্যে পাকা প্রাচীর, কি চুনদেওয়া সদর, বড় সম্ভ্রান্তের চিহ্ন। কারণ অন্তত ছয়টা মিথুন মারিয়া আত্মীয় স্বজনকে ভোজন করাইতে না পারিলে, এমন মহৎ কার্য্যের কেহ অধিকারী হয় না। টাঙ্কুল পুরুষের কৌপীনের সম্মুখ ভাগে একটা হাতীদাঁতের

আঙ্গটী বাঁধা না থাকিলে, সে উলঙ্গ বলিয়া গণ্য হয়। লুহুপা জাতী অসমসাহসী ও বড় বিবাদ প্রিয়। ইহারা স্ত্রীপুত্রহত্যা, পুরুষ হত্যা অপেক্ষা অধিকতর গৌরবজনক মনে করে। রাগ চড়িলে ইহারা শত্রুকে যেখানে পায় হত্যা করে। কিন্তু সাধারণত একটা স্থান আপোষে ঠিক করিয়া রাখে। সে স্থান ভিন্ন অন্যত্র শত্রু হত্যা নিন্দাজনক। টাঙ্গুল জাতী ঢাল, বর্শা ও তীর, ধনুক ব্যবহার করে। কিন্তু লুহুপাদের ঢাল ও বর্শা ভিন্ন অস্ত্র নাই। এই অস্ত্রদ্বয়ে নির্ভর করিয়া ইহারা টাঙ্গুলদিগকে পদানত করিয়াছে। ব্রহ্মবাসীরা লুহুপাদিগকে বর্গীর ন্যায় ভয় করে। ইহারা মস্তক ক্ষৌর করিয়া সম্মুখ ভাগে একটী শিখা রাখিয়া দেয়। ইহারা যে সকল স্ত্রীহত্যা করে, তাহাদের কেশ বিনাইয়া যুদ্ধকালে পাগড়ী বাঁধে। লুহুপার বিবাহ হইলে, তাহার পিতা মাতা, প্রাচীন গৃহ পুত্র ও পুত্রবধুকে দান করিয়া, স্থানান্তরে যাইয়া নূতন গৃহ বাঁধে। আবার আর একটী ছেলের বিবাহ হয়, সে গৃহও তাহাকে দিয়া আবার অন্য আশ্রয় অনুসন্ধান করিতে হয়। মৃগয়াহত পশু পক্ষী, মৎস্যের মুণ্ডে ইহারা গৃহ সজ্জিত করে। যে গৃহে নরমুণ্ড নাই, সে গৃহের শোভাই হয় না। ইহাদেরও পুরুষেরা কৌপীনের সম্মুখে হাতীদাঁতের অঙ্গুরী রাখে এবং রমণীরা উল্কী পরে। ইহারা গোলামী করিতে ঘৃণা করে। অর্থ দ্বারা পুত্রদিগকে দাসত্বমুক্ত করিতে সক্ষম না হইলে, তাহাদিগকে হত্যা করিয়া যায়। লুহুপারমণীকে অপমান করিতে কেহ সাহস করে না। কারণ নৃশংস লুহুপার হস্তে অপমানকারীর নির্ব্বংশ হইবার সম্ভাবনা আছে।

মরাম জাতীয় যুবক ও যুবতীরা অন্যান্য অসভ্য জাতীর ন্যায় স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গৃহে শয়ন করে। বিবাহিত পুরুষেরাও অবিবাহিতদিগের সহিত এক মণ্ডপে রাত্রি কাটায়। লুহুপা ও মরামদিগের মধ্যে চৌর্য্যাপবাদ নিন্দনীয় নহে। চোরামাল ধরা পড়িলে, অধিস্বামী ফিরিয়া পায়, কিন্তু কাহাকেও চোর বলিয়া অপবাদ দেওয়া প্রাণান্তকর হইতে পারে। ইহাদের মধ্যে দুই জন রাজা যুগপৎ রাজ্য করে। কুপুইসমাজের ন্যায় মরামদিগের মধ্যে পুরোহিতের একাধিপত্য নাই। কাহারও পীড়া হইলে, ইহারা ঠাকুরপূজা করে বা কাঙ্গালী ভোজন করায়।

আঙ্গামী নাগারা বড় নৃশংস ও কলহপ্রিয়। দুর্ব্বলের উপর অত্যাচারে ইহারা সদাই ব্যস্ত। ইহাদের মধ্যে কোন রাজা নাই। আবশ্যকমত ইহারা একজনকে মোক্তার নিযুক্ত করিয়া থাকে। কিন্তু মোক্তার মুখপাত্র মাত্র, তাহার কিছুমাত্র ক্ষমতা নাই। আঙ্গামীরা ব্যবসা বাণিজ্যেও সুদক্ষ, ব্যবসায় উপলক্ষে ইহারা কাছাড়, আসাম, শ্রীহট্ট, ঢাকা ও কলিকাতা পর্য্যন্ত গতায়াত করে। ইহারা হাতীদাঁত ও মোম বিক্রয় করিয়া লবণ, বাসন, কড়ি ও বারুদ প্রভৃতি ক্রয় করে। ইহারা বন্দুক ব্যবহার করে। ইহারা মাথার পশ্চাৎ ভাগে দড়ি দিয়া খোপা বাধে।

এই সকল বন্যজাতী মহিষ, গাভী, মিথুন, ছাগল, শূকর, বিড়াল, কুকুর, মুরগী পোষে। লুহুপা কুকুর বিখ্যাত। ইহারা কুকুর খায়। খোঙ্গারেরা ব্যাঘ্র, ভেক ও টিক্‌টিকী পর্য্যন্ত খাইয়া থাকে।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী।

দুই চারিটী প্রাণের কথা।

ছোট মুখে বড় কথা বলিতে গেলে, লোকের নিকট বড় প্রীতিকর বোধ হয় না বটে; কিন্তু হৃদয়ের উত্তেজনায় সময়ে সময়ে না বলিয়াও থাকা যায় না। বিশেষত লোকের চিন্তার স্রোত যে দিকে প্রবাহিত হইতেছে, তাহার প্রতিকূলে দাঁড়াইয়া কোন কথা বলা বড়ই দুঃসাহসের কার্য্য। এইরূপ স্থলে লোকের বড়ই অপ্রিয় হইয়া উঠিতে হয়। কিন্তু তাহা ভাবিয়া কে কর্ত্তব্য ভুলিতে পারে? ঈশ্বর অনন্ত,— অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত প্রেম, অনন্ত ভাব হইতে চিরবঞ্চিত সসীম মানুষ কেমনে ঈশ্বরের কথা বলিবে? বলিতে পারে না, তবুও বলে। অনন্ত বুঝে না, মানুষ তবুও অনন্তের গানই গায়। কেন গায়, কেন বলে, তাহার উত্তর সকল সময়ে পাওয়া যায় না। না গাইয়া পারে না, না বলিয়া পারে না, তাই গায়, তাই বলে। সমাজ এক গভীর অতলস্পর্শ সমুদ্র বিশেষ, অনন্তকাল ধরিয়া ইহার রহস্য ভেদ করিতে চেষ্টা করিলেও কাহারও সাধ্য নাই যে, সমাজ সম্বন্ধীয় সমস্ত কথা ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিয়া শেষ করিবে। কেহ পারে নাই, কেহ পারিবে না। আমরাও পারিব না, বুঝি, তবুও যাহা ভাবি, তাহা না বলিয়া থাকিতে পারিনা। হৃদয়ের উত্তেজনার হাত এড়ান বড়ই কঠিন।

আর্য্যভূমি ধর্ম্ম ভাবে চিরদিনই মাতোয়ারা। এত প্রেমভক্তিও কোন দেশে নাই, এত চিন্তাও কোথাও নাই। অন্য কোন কথা বলিব না, ধর্ম্ম সম্বন্ধে ভারতে যে সকল গভীর চিন্তার কথা বহু শতাব্দী পূর্ব্বে আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার মর্ম্ম উদ্ভেদ করিতে এখনও বহুশতাব্দী লাগিবে। চিন্তা সম্বন্ধে আর্য্যভূমির সমকক্ষ কোন দেশ আজও হয় নাই। মহান্ ঈশ্বরের স্বরূপ-জ্ঞানে তেত্রিশকোটী দেবতা বিভিন্নাবয়বে এই আর্য্যভূমিতেই পূজিত। অদ্বৈতবাদ এই ভূখণ্ডেই এক দিন রাজত্ব করিয়াছে। ঈশ্বরের অনন্তত্ব ও মানবের ক্ষুদ্রত্ব,— আত্মা ও পরমাত্মার দ্বৈতভাব মূলক গভীর রহস্য ভারতেই একদিন মীমাংসিত হইয়াছিল। যোগ বল, তপস্যা বল, ব্রত বল আর অনুষ্ঠান বল, ভক্তি বল আর প্রেম বল, এ সকলেরই চরমোৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল, এই পুণ্যধাম আর্য্যাবর্ত্তে। কিন্তু কি ছিল, কি হইয়াছে। এক হিন্দুধর্ম্মে আজ কত সম্প্রদায় উদ্ভূত হইয়াছে। সেই সকল সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে কতই বিবাদ বিসম্বাদ চলিতেছে! কত ঘৃণা বিদ্বেষের রাজত্ব লীলা করিতেছে! অহং-জ্ঞানমূলক মতবাদ কতই প্রশ্রয় পাইতেছে! ধর্ম্ম চিরকাল একই রূপ রহিয়াছে, কিন্তু মানুষের দোষে, দেখ, কতই অনর্থ ঘটিতেছে! পাত্রের দোষে স্বর্গীয় ভাব সকল মলিন হইয়া যাইতেছে! মানবের যে দ্রব্যের অভাবে ভারতে ধর্ম্মের অপরাজিত দেবভাব চিরকাল একভাবে থাকিতে পারে নাই, তাহারই অভাবে আজও বিপর্য্যয়ের উপর বিপর্য্যয় চলিতেছে। পরিবর্ত্তন উন্নতির চিরলক্ষণ, সন্দেহ নাই। কিন্তু উন্নতির পরে অবনতি, অবনতির পরে আবার উন্নতি, আবার অবনতি, এই প্রকার পরিবর্ত্তন কখনই উন্নতির লক্ষণ হইতে পারে না। ভারতে কিন্তু তাহাই হইয়া আসিতেছে। একবার,

ভারত জাগিতেছে, আবার ডুবিতেছে। আবার জাগিতেছে, আবার ডুবিতেছে। এত উন্নতিও কোন দেশে হয় নাই, এত অবনতিও কোন দেশে হয় নাই। ইহার একমাত্র কারণ—(Harmonious development of all the faculties) এখানে মানবের সমস্ত শক্তির সমঞ্জসীভূত উন্নতি কখনও হয় নাই। কেবল হয় নাই, তাহা নহে; সমঞ্জসীভূত উন্নতির চেষ্টা করাও হয় নাই। কোথাও জ্ঞান, কোথাও প্রেম, কোথাও বুদ্ধি, কোথাও বিবেক চিরকাল বিচ্ছিন্ন ভাবে রাজত্ব করিয়া আসিয়াছে, একস্থানে এক সময়ে সকল মিলিয়া কখনই রাজত্ব করে নাই। ইহার ফল ভারতে এই হইয়াছে,—প্রেমিক জ্ঞানীকে চিরকাল ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন, জ্ঞানী প্রেমিককে উন্মাদ বলিয়া উপহাস করিয়াছেন। পরস্পরের প্রতি ঘৃণা বিদ্বেষ করিয়াই সময় কাটিয়া গিয়াছে। মত লইয়া ঝগড়া বিবাদ, মারামারী কাটাকাটী ধর্ম্ম-প্রধান ভারতে কত হইয়া গিয়াছে, কে গণনা করিয়া বলিতে পারে? মানুষ, মানুষের ভ্রাতৃত্ব ভুলিয়া শোণিত-পিপাসা চরিতার্থ করিতে একটুও সঙ্কুচিত হয় নাই। একতা, আর্য্যভূমির কল্পনার জিনিস। বিবাদ বিসম্বাদের যে অভিনয় ভারতে দেখা যায়, অন্য দেশেও তাহারই প্রতিকৃতি। আদি সময় হইতে ধর্ম্ম জগতের যে বিশদৃশচিত্র দেখিতে পাই, আজও তাহা সমতা লাভ করিল না। কখনও করিবে কি না, কে জানে? যেখানে ধর্ম্ম, সেইখানেই সম্প্রদায় হইয়াছে। মত বজায় রাখিতে যাইয়া, মানুষ, চিরকাল ঘৃণা বিদ্বেষের দাসত্ব স্বীকার করিয়াছে। বুদ্ধের সাম্যবাদ বৈষম্যবাদে পরিণত হইয়াছে, চৈতন্যের অলৌকিক প্রেমতত্ত্ব রূপান্তরিত হইয়া মলিন হইয়া গিয়াছে—খ্রীষ্টের স্বর্গীয় ভ্রাতৃত্ববাদ পশুত্ববাদে পরিণত হইয়া আকাশের নীলিমায় মিলিয়া গিয়াছে। ভারতের ধর্ম্ম-জগতের চিত্রে যে মলিন অমঙ্গলের চিহ্ন, সমস্ত পৃথিবীময় তাহারই ছায়া। ধর্ম্মভাবের তারতম্যানুসারে সেচিত্র অন্যত্র আরো মসীময়। জগতের আর আশা কোথায়? পরস্পরের ভাল ভাব উপার্জ্জন করিয়া, পরস্পরকে ক্ষমা করিয়া, মানুষ কখনই এক পরিবার ভুক্ত হইতে পারিল না।

মহাত্মা থিওডোর পার্কার ধর্ম্ম জগতের এই গভীর দুর্দ্দশায় ব্যথিত হইয়া ইহার মূল কারণ অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন, সমঞ্জসীভূত উন্নতি লাভ না করিলে আর মানুষের মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই, একতার আশা নাই। কিন্তু সমঞ্জসীভূত উন্নতি লাভ করার অপেক্ষা কঠিন কাজ আর কিছুই নাই। জ্ঞান, প্রেম, বুদ্ধি আর বিবেক, এসকলেরই মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইবে। জ্ঞান আর প্রেম, শিক্ষা আর ভাব, গুরুত্ব আর সরসত্ব, ন্যায় আর পুণ্য, এ সকল পাশাপাশী থাকিবে। কোন দিকে টলিলেই বিপদ। এই গভীর সত্য সাধনায় যখন মানুষ জয়ী হয়, তখন আর ঘৃণা বিদ্বেষ কিছুই থাকে না। তখন মানুষ দেখে, জ্ঞানীও পূজ্য, প্রেমিকও পূজ্য, ন্যায়বানও পূজ্য, পুণ্যবানও পূজ্য। বৈষম্যের অনাদর ঘুচিয়া যায়, পরস্পরের মহিমা পরস্পরে বুঝিতে পারে। বিধাতার সৃষ্টির অলৌকিকত্ব হৃদ-বোধ হয়। হয় বটে, কিন্তু মানুষ কি সহজে এই সাধনায় জয়ী হইতে পারে? বিধাতার সৃষ্ট

যে বৈচিত্র্যপূর্ণ, সে কেবল এই জন্য যে, মানুষ এই কঠোর সাধনার সময়ে পরস্পরের সাহায্য পাইবে। জ্ঞানী, প্রেমিককে ধরিবেন; প্রেমিক, জ্ঞানীকে ধরিবেন। শিক্ষার শুকত্বে ভাব-কোমলত্ব দিবেন, এক জন; আর কোমলত্বে শুকত্ব দিবেন আর একজন। এ বিধানের ভিতরে কেমন আশ্চর্য্য সূক্ষ্ম সত্য নিহিত। জ্ঞান অভাবে প্রেম চিরস্থায়ী হয় না—বিশ্ব বিস্তৃতি পায় না। প্রেম অভাবেও জ্ঞান লাভ অসম্ভব। দুই পাশাপাশী না থাকিলেই বিপদ। গোলাপের সৌন্দর্য্যে যে মুগ্ধ না হয়, সে গোলাপ-তত্ত্বান্বেষণ করে না; আবার যে গোলাপের গুণ জানে না, সেও গোলাপকে ভালবাসে না। তোমার গুণ আমি যত জানিব, ততই ভালবাসিব; আবার যত তোমার নিকটস্থ হইব, ততই তোমার গুণ জানিব। জানা আর ধরা, ধরা আর জানা—এত নিকটের জিনিস যে, কোন্‌টী অগ্রে, কোনটী পশ্চাতে, তাহা বুঝাও কঠিন। এই প্রকার অন্যান্য সকলই কাছাকাছী, ঘেসা-ঘেসি। একের ভিতরে অপর, অপরের ভিতরে একক ডুবিতেই হইবে। কিন্তু মানুষ অহং-পূজক, সে ডুবিতে যায়, আবার ফেরে। গুপ্তসৌন্দর্য্যের টানে মানুষের নিকটবর্ত্তী হয়, আবার আপন ভাবে বিভোর হইয়া পশ্চাতে ধায়। ধরে আবার ছাড়ে। পায় আবার পরিত্যাগ করে। পরস্পরের সাহায্য ভিন্ন, মানুষ, সংসারের কথাই বল আর আধ্যাত্মিক জগতের কথাই বল, কোন কিছুরই উন্নতি করিতে পারে না। কিন্তু সে সাহায্য মানুষ লইবে না। আপনাকে লইয়াই মানুষ মজিবে। স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য মানুষ বুঝিবে না; ব্রহ্মাণ্ডপতির ইঙ্গিত মানুষ শুনিবেনা। এই জন্যই প্রেমিক জ্ঞান না পাইয়া সঙ্কীর্ণ মত্ততাতেই সন্তুষ্ট থাকিতেছেন, জ্ঞানীও প্রেমাভাবে সীমাবদ্ধ হইয়া যাইতেছেন। উদারতা—বিশ্ববিস্তৃতভাব মানুষেরহৃদয়ে আর স্থান পাইতেছে না। সমগ্রসীভূত উন্নতি কেবল শুষ্ক মতেই থাকিয়া যাইতেছে। উন্নতির অভয় বাণী মরুভূমিতে পড়িয়া শুকাইয়া যাইতেছে। একতা, সাম্য, এসকল কবির কল্পনার বস্তু হইয়া উঠিতেছে।

আর্য্যভূমির বড় সৌভাগ্য যে, এখানে আবার পরব্রহ্মের উপাসনা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সম্প্রদায় থাকিবে না, ঘৃণা বিদ্বেষমূলক বিচ্ছেদ ঘুচিবে, সব নর নারী এক সার্ব্বভৌম প্রেমে বদ্ধ হইবে। শাস্ত্র তন্ত্র, বেদ পুরাণ, বাইবেল কোরাণ, সকল সত্য মিলিয়া একাকার হইবে। মানব সমাজের অর্জ্জিত অতীত সত্যমূলক কীর্ত্তিকলাপকে ভিত্তি করিয়া, অনন্ত কালের অনন্ত উন্নতিকে লক্ষ্য করিয়া অভিনব মানব-পরিবার সংগঠিত হইবে। অসাধ্য সাধিত হইবে, বহু একত্বে মিলিবে। কি মনোমোহন বংশিধ্বনিই আকাশে উঠিয়াছিল,—কি আশার বিজয় ভেরিই চতুর্দ্দিকে নিনাদিত হইয়াছিল। স্মরণ করিলেও প্রাণ শীতল হয়। বড় আশা ছিল, ব্রাহ্মসমাজে এক স্বর্গের চিত্র দেখিব। ব্রাহ্মধর্ম্ম—আর্য্য এবং অনার্য্য, পাপী এবং পুণ্যাত্মা, পৃথিবীর সকল সন্তানের সকল ভাব, সকল সত্য লইয়া। যাহা কিছু সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাও এই ধর্ম্মের অবলম্বন, যাহা অনন্তকালে আবিষ্কৃত হইবে, তাহাও ইহারই অধিকৃত। কত উদার ভাব! কেবল মতে নহে, মতে সত্যই আশা ছিল, সাকারের সমগ্রসীভূত উন্নতি সাধন

যতই কঠিন হউক না কেন, সোণার ভারতে সে সাধনা জয়লাভ করিবে। আশা ছিল, যাহা পৃথিবীতে হয় নাই, তাহাই এই আর্য্যভূমিতে এক সময়ে হইয়াছিল; আবারও হইবে। জগতে আর্য্যের নাম আবার উজ্জ্বল হইবে। কিন্তু সত্য কথায় বলিতে গেলে, ইহাই বলিতে হইবে, মতে আজও "সমঞ্জসীভূত উন্নতি" অনেকেরই সরল বটে, কিন্তু জীবন তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। কি কুক্ষণে জানি না, ভারতের কাঁচা মাটীতে অমৃত ফলিল না! আড়ম্বরময় জীবনে মত-বাদেরই আদর বাড়িল, কিন্তু ধর্ম্মের প্রকৃত অঙ্কুর জন্মিল না। সম্প্রদায় ভাঙ্গিবার জন্য যাহার সৃষ্টি, দেখিতে দেখিতে সে আর একটী নূতন সম্প্রদায়ের রূপ ধরিয়া বসিল। আবার অহং পূজা প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। আবার ঘৃণা বিদ্বেষের আগুণ জ্বলিল। মতবাদ কখনও উন্নতিলাভ করে নাই, কখনও করিবে না।

নাম লইয়া গোলযোগ করাতেই নানাপ্রকার বিপদ ঘটিয়াছে। নামের পূজা করিতে যাইয়াই মানুষ বাহিরে মজিতেছে। আর্য্যধর্ম্মের পরিণতিই ব্রাহ্মধর্ম্ম। হিন্দুধর্ম্মের চরমোৎকর্ষই ব্রহ্মপূজা। হিন্দুধর্ম্ম উন্নতির অবস্থায় যাহা ছিল, তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম। হিন্দুধর্ম্ম ভবিষ্যতে যাহা হইত, তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম। যিনি যতই তর্ক বিতর্ক করুন না কেন, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে, ঈশ্বরের উপাসনা ভিন্ন হিন্দুর আর উপাস্য দেবতা নাই*। পৃথিবী চিরকাল একভাবে থাকে না। উন্নতি লাভ করিতে হইবেই হইবে। আর্য্যধর্ম্ম একভাবে থাকে নাই, থাকিতেও পারে না। কালের ফেরে ইংরাজি শিক্ষা ভারতে বিস্তৃত হইতেছে; সেই সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মের আদর্শও উপরে উঠিতেছে। হিন্দুসমাজ সেই আদর্শ ধরিয়া ক্রমে অলক্ষিত ভাবে চলিতেছে। সত্য কথা বলিতে হইলে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। জাতিভেদের মূল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে, পৌত্তলিকতার প্রতি লোকের গভীর অনাস্থা জন্মিয়াছে। ইহা সময়েরই ফল, না হইয়াই পারে না। কিন্তু অনাস্থা হইয়াছে বলিয়াই ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ধর্ম্ম, জীবনের,—প্রাণের জিনিস। ধর্ম্মকে প্রাণের জিনিস করিয়া দেখাইতে যাইয়া ব্রাহ্মসমাজ ক্রমেই সীমাবদ্ধ স্থানে সরিতেছেন। সরিতে সরিতে এখন বড় সঙ্কীর্ণতার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছেন। হিন্দুসমাজ আর সে আদর্শ ধরিতে পারিতেছে না। পারিতেছে না বলিয়া ঘৃণা কটাক্ষপাত করিতেছে। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজও নীরবে তাহা সহ্য করিতে পারিতেছে না। ক্ষমা নামে যে একটা দেবদুর্ল্লভ কথা আছে, তাহা কাহারও জীবনে দেখা যায় না। বড়ই বিপদ উপস্থিত। ব্রাহ্ম কথাটা লইয়া একদিকে ঘৃণা চলিতেছে, একদিকে সংখ্যা বৃদ্ধির চেষ্টা হইতেছে। কথা লইয়া মারামারী করিতে যাইয়া সকলেই আদর্শ চ্যুত হইতেছেন। বাস্তবিক ব্রাহ্ম কথাটা বড়ই আপত্তিজনক। ব্রাহ্ম কথাটার অর্থ বড়ই গভীর। এত গভীর অর্থপূর্ণ কথা লইয়া নাড়াচাড়া না করিলেই ভাল ছিল। ব্রহ্মেতে জীবিত সকলেই—পৃথিবীর সকলেই ব্রহ্মকৃপার অধিকারী—সকলেই তাঁহার সন্তান, তাঁহার নিকট বড় ছোট ভেদাভেদ নাই, এ হিসাবে সকলেই ব্রাহ্ম। কিন্তু ব্রাহ্ম শব্দে এখানে তাহা বুঝায় নাই। ব্রহ্মগত জীবনই ব্রাহ্মের লক্ষণ। বড়ই শক্ত কথা। "সমঞ্জসীভূত

* ১২৯২ সালের মাঘ মাসের প্রচার দেখ।

উন্নতি—অনন্ত উন্নতি ভিন্ন ব্রহ্মগত জীবন হওয়া অসম্ভব। ঈশ্বরকে আমি একটু জানিলাম, একটু ভাল বাসিলাম, তাহাতেই ত সমস্ত জানা হইল না। না জানিলে ধরিব কি? যাঁহাকে বুঝাই হইল না, ধরাই গেল না, তাঁহা-গত জীবন কেমনে হইবে? যদি বল, তাঁহাকে অবলম্বন না করিয়া মানুষ বাঁচিতেই পারে না। সে হিসাবে অংশত সকলেই ব্রাহ্ম। সকলে যাহা, তাহা লইয়াই কত বিষম অনর্থ ঘটিতেছে। এই নাম লইয়াই কত বড়াই করিতেছি। আমি ব্রাহ্ম, সুতরাং আমি হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান সকলের অপেক্ষা উন্নত!! আমি ব্রাহ্ম, সুতরাং আমি পৌত্তলিক অপেক্ষা পবিত্র!! আমি ব্রাহ্ম সুতরাং আমি পৃথিবীর মধ্যে সকলের বড়!! আমার জ্ঞান নাই, বুদ্ধি নাই, বিবেক নাই, তাতে কি, আমি ঈশ্বর-প্রেমিক—আমি ব্রাহ্ম, ঈশ্বরের কৃপা আমার একচেটিয়া সম্বল!! আমি কাহাকেও গণিব না, আমি অহং লইয়াই থাকিব। আমার এতই অহঙ্কার! তুমি কি ছাই বুঝ, আমার নিকট উহা হিজিবিজি মাথামুণ্ড। এই অহংজ্ঞানময় জীবন হইতে ব্রহ্ম-কৃপাকণা উড়িয়া গিয়াছে। যে আপনার পায়ের উপর দাঁড়াইতে যায়, ধর্ম্ম জগতে তাহার পতন অনিবার্য্য। ব্রাহ্মজীবনে তাই কত হীনতা, কত নীচতা দেখিতে পাওয়া যায়! ব্রাহ্মসমাজ, দলে দলে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িতেছে! একদল আর এক দলকে ঘৃণা করে, অপর দল আর এক দলের বিরুদ্ধে কত কথাই বলে। ঈশ্বর-প্রেমিকের ভাব দেখ! কোথায় ঈশ্বর-ভক্ত পৃথিবীর সমস্ত নরনারীকে একপ্রেমে বাঁধিবে, না নিজেরাই কাটাকাটী করিয়া মরিতেছে! জগৎ ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যে কত কালিমাময় নিরাশার চিত্র দেখিয়া ব্যথিত হইতেছেন! গালাগালির পরিবর্ত্তে গালাগালি, শত্রুতার পরিবর্ত্তে শত্রুতারই আদান প্রদান চলিতেছে। মায়ের সন্তান, মায়ের সন্তানের আদর বুঝিল না। মাতা যেরূপ অপরাজিত স্নেহে পাপীকে ক্ষমা করেন, ভাই, ভাইকে সেরূপ ক্ষমা করিতে পারিল না। আর্য্য, আর্য্যের সম্মান বুঝিল না। কোথায় বা প্রেম, কোথায় বা সাম্য, কোথায় বা একতা!! কোথায় বা জ্ঞান, প্রেম, বিবেক ও বুদ্ধির সামঞ্জস্য!! এক ঈশ্বরের উপাসক, অথচ মত লইয়া কাটাকাটী মারামারী ক্রমাগতই চলিতেছে। এক ধর্ম্মে দীক্ষিত, অথচ পরস্পরকে বিদ্বেষের চক্ষে দেখিতেছি। তুমি হিন্দু, তুমি মুসলমান, তুমি খ্রীষ্টান, শরীরগত বা মতগত পার্থক্য কি আসিয়া যায়, তোমরা আমাদের প্রাণের ভাই। কিন্তু আমরা আর তাহা জীবনে দেখাইতে পারিতেছি না। তোমরা আমাদিগকে ঘৃণা করিতেছ, আমরাও করিতেছি। সত্য কোথায়? ক্ষমা কোথায়? ধর্ম্ম কোথায়? "সত্য জয় যুক্ত হইবেই" তোমাদিগকে একথা বলিতে আর সাহস হইতেছে না। সন্দেহ-মেঘ হৃদয়াকাশকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। তোমার সত্য তুমি যখন বল, আমার তাহা সহ্য হয় না; আমার বিশেষ সত্য বলিবার সময় তোমার সহ্য হয় না। সত্যে বিশ্বাস থাকিলে এরূপ হয় না। সত্য সত্যই আমরা পরস্পরকে সকলেই দারুণ বিদ্বেষের কটাক্ষে দেখিতেছি। তোমরা ও আমরা একের সন্তান, সুতরাং সকলেই ভাই। তোমাদের ভিতরে শিক্ষার জিনিস আছে, আমাদের

নিকট ও অনেক আছে, আমরা আর তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। সঙ্কীর্ণতা, স্বার্থপরতা—আমাদিকে চির-অন্ধ করিয়া ফেলিতেছে। আপন ব্যক্তিগত স্বাধীনতার আদর করিতে যাইয়া, আমরা অন্যের স্বাধীনতার সম্মান রাখিতে পারিতেছি না। এমনই ইচ্ছা হয়, শক্তি থাকিলে বুঝি বা পরস্পরের মুখে বিষ তুলিয়া দিতাম। এমন সঙ্কীর্ণতা আমাদিগকে ধরিয়াছে! আমি এ সকল জঘন্যতা আর হৃদয়ে পোষণ করিতে পারিতেছি না। আমি বুঝিতেছি—যতদিন উদারতার রাজ্যে না পৌছিব, যত দিন জগতের সমস্ত ভাই ভগ্নীকে আলিঙ্গন করিয়া বিশ্বেশ্বরের প্রদত্ত অমোঘ লুক্কায়িত সত্য তাঁহাদের হৃদয়ের ভিতর হইতে বাহির করিয়া পান করিয়া তাপিত হৃদয়কে শীতল না করিব,—যত দিন সকল ঘটে মাতার জ্বলন্ত প্রত্যক্ষছবি না দেখিতে পাইব, ততদিন আমার পরিত্রাণ নাই। আর এই যে ব্রাহ্মসমাজ, এই সমাজ হইতে যত দিন সঙ্কীর্ণতা ঘুচিয়া না যাইবে,—সকলের ভিতরে মঙ্গলময় ঈশ্বরের বিশেষ বিশেষ ভাব দেখিয়া যতদিন ব্রাহ্মগণ জাতিনির্ব্বিশেষে জগতের সকল সম্প্রদায়ের ভাই ভগ্নীদিগকে ক্ষমা করিয়া প্রাণের সহিত ভালবাসিতে না পারিবেন, ততদিন সমন্বয়ীভূত উন্নতি কল্পনাতেই বদ্ধ থাকিবে; ততদিন আর ইহার মঙ্গল নাই। 'ব্রাহ্ম' কথা তত দিন উপহাসের থাকিবে। তত দিন ব্রাহ্মসমাজ সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে ছিন্ন ভিন্ন হইবে।

ব্রহ্মগত জীবন হইলে আর ঘৃণা বিদ্বেষ থাকে না। কাহাকে কে ঘৃণা করিবে? সকলেই মায়ের সন্তান। যাহাকে মা ক্ষমা করেন, সন্তান তাহাকে কি ঘৃণা করিবে! তুমি যাঁহার, আমিও তাঁহারই। মাতাই সকল ভাবে, সকল ছবিতে বিকশিত! এক রূপ জগন্ময়, একরূপ ব্রহ্মাণ্ডময়! সমস্ত বিশেষত্বের মধ্যেই একত্ব। জাতীয় ধর্ম্ম পৃথক হউক,—মানুষের আকারগত বা মতগত পার্থক্য থাকুক, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। আত্মায় আত্মায়, প্রাণে প্রাণের ঘনীভূত যোগ। একেই সকল স্থিতি করিতেছে। সকলেরই লক্ষ্য এক অনন্ত অপরাজিত স্নেহময় দেবতায়;—পৃথিবীতে সেই দেবতার পূর্ণ বিকাশ প্রেম। প্রেমই সুন্দর, প্রেমই মহান,—প্রেমেই জ্ঞান, বিবেক, বুদ্ধি মজিয়া একীভূত। পরস্পরকে ক্ষমা কর, ভালবাস, আর হৃদয়ে হৃদয়ে ডুবিয়া যাও। বিশ্বেশ্বরের সৌন্দর্য্য দেখ,—প্রেমতত্ত্ব জীবনগত কর। মরিবে কেন? ভুলিবে কেন? এস সকলে প্রাণে প্রাণে মিলি। এস সকলে এক হই। বিদ্বেষ পরিহার করি—সংসার-কুটবুদ্ধি ছাড়ি। মাকে ডাকি, আর মায়ে মজি। মায়ে মজি আর মায়ের ন্যায় সকলকে ক্ষমা করি। ক্ষমা করি আর ভালবাসি। হিন্দুত্ব, মুসলমানত্ব, খ্রীষ্টানত্ব, বৌদ্ধত্ব,—সকলত্ব না মিলিলে আর রক্ষা নাই। পবিত্র যোগি হিন্দুর আধ্যাত্মিকতা, উদ্যমশীল মুসলমানের শক্তি-বাদের জাগ্রত জীবন্তভাব, আর বিনয়ী খ্রীষ্টানের দয়া ও ক্ষমা, এবং বৌদ্ধের সংসার অনাসক্তি বা নির্ব্বাণ ভিন্ন জগতের কল্যাণ হইবে না। আপনাকে না ভুলিলে আর রক্ষা নাই। তাই ইতিহাস পড়, সময়ের ভাব বুঝ—তারপর এই কঠোর সাধনায় রত হও। আর্য্যভূমিকে ধর্ম্মে মাতাও—নচেৎ আর আর্য্যভূমি টিকে না। কঠোর সাধনায় ডুবিয়া যাও। যশ, মান ভুলিয়া, বাহিরের আড়ম্বর ভুলিয়া জীবনে

জীবন্ত দেবতাকে লাভ করিতে চেষ্টা কর। নচেৎ তোমার আমার অন্তঃসার শূন্য কথা কে শুনিবে? জীবন চাই। সমগ্রনীভূত উন্নতি চাই। চরিত্র চাই। মাকে চাই, মায়ের সকল সন্তানকে চাই। ঘৃণা বিদ্বেষ পুষিতেছ, অথচ মুখে ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিতেছ?—ভণ্ড, দূর হও। মায়ের আদর্শে জীবনকে গঠন কর, নচেৎ সকল শ্রম বৃথা হইবে। দলাদলিই সার হইবে। ধর্ম্মহীনতায় আর্য্যত্ব রক্ষা পাইবে না। সকলে ঘৃণা বিদ্বেষ পরিহার কর। যশমান লইয়া, মত লইয়া কাটাকাটী করিলে কি হইবে? সে যেখানে যেভাবে থাক, সমগ্রনীভূত উন্নতির জন্য বদ্ধপরিকর হও। জ্ঞানী—জ্ঞান দেও, প্রেমিক প্রেম বিলাও। উপহাস, নিন্দা, ঘৃণা বিদ্বেষ—অহং-জ্ঞানমূলক সকল সঙ্কীর্ণতা দূর কর। আর্য্যভূমি আবার মাতিবে, আবার জাগিবে। নচেৎ আর্য্যভূমির নাম অচিরাৎকালের মধ্যে বিস্মৃতির অনন্ত গর্ভে ডুবিয়া যাইবে। অসংখ্য দেবালয় মৃত-জীবের আশ্রয় হইবে—ধর্ম্মমন্দির সকল পিশাচের নৃত্যশালা হইবে। জীবন্ত ধর্ম্মসাধন কথার কথা নহে। প্রতারণায় চলিবে না, ছলনায় হইবে না। প্রাণ চাও ত প্রাণেশ্বরের স্মরণ লও। মান অভিমান ভুলিয়া মাতার চরণে পড়। মা দয়াময়ী অবশ্য দয়া করিবেন।

সামাজিক ব্যাধি। (৩)

চিকিৎসার ব্যবস্থা—পারিবারিক শিক্ষা।

পারিবারিক অবস্থার উপরে সামাজিক নীতি কতদূর নির্ভর করে, তাহা আমরা এখনও সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। যে স্থানে আমাদিগকে দিবসের অধিক ক্ষণ বাস করিতে হয়, সে স্থানটী যদি সুখের স্থান না হয়, তাহা হইলে মানব মন পরিতৃপ্ত ভাবে সেখানে থাকিতে পারে না, সুখের অন্বেষণে অন্যত্র গমন করিতে হয়। তাহাতে পারিবারিক বন্ধন শিথিল হয় এবং বিবিধ দুর্গতির সূত্রপাত হয়। আমরা যতক্ষণ পরিবার মধ্যে থাকি, ততক্ষণ পিতা মাতা, ভ্রাতা ভগিনী স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ইহাদিগের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া থাকি। ইহারা যেমন প্রীতির দ্বারা আমাদের হৃদয়ের পরিতৃপ্তি সাধন করেন, তেমনি অজ্ঞাতসারে প্রহরী স্বরূপ হইয়া আমাদিগকে রক্ষা করেন। আমরা পরিবার মধ্যে পরস্পরের দৃষ্টি দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া বাস করি। ইহাদের সমক্ষে আমরা এমন কিছু করিতে পারি না, যাহা লজ্জাজনক বা অবিশুদ্ধ। সুতরাং যুবকগণের নীতি সম্বন্ধে সর্ব্বদাই এই মূল সত্যটী স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যুবক যুবতী যতই পরিবার মধ্যে আত্মীয় স্বজনের ও গুরুজনের চক্ষের নিকটে নিকটে থাকে, ততই তাহাদের নীতির পক্ষে শ্রেয়। কিন্তু পরিবারটীকে যদি সম্পূর্ণরূপে তাহাদিগের চিত্তের তৃপ্তিদায়ক করিতে না পারা যায়, যদি গৃহ তাহাদিগের পক্ষে আকর্ষণের বস্তু না হয়, তাহা হইলে কদাপি আমরা তাহাদিগকে পরিবার মধ্যে রাখিতে পারিব না। এই কারণে আমাদিগকে স্থির চিত্তে এই প্রশ্নের বিচার

করিতে হইবে যে, কি হইলে পরিবারটী আমাদের পুত্র কন্যার নিকট আকর্ষণের পদার্থ হইতে পারে?

সাধারণ ভাবে পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের এই উত্তর দেওয়া যাইতে পারে যে মানব মন সুখে থাকিবার জন্য যে যে বিষয় চায়, এবং যাহার অভাবে সুখী হইতে পারে না, সে সমুদায় গুলি পরিবার মধ্যে থাকা চাই। বিশেষতঃ আমাদিগকে আর একটী বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে। সেটী এই;—যৌবন কালে বালক বালিকার মন স্বভাবত সতেজ হয়। তাহাদের সতেজ হৃদয় মনের পরিতৃপ্তির জন্য এমন অনেক বিষয়ের প্রয়োজন হয়, যাহা একজন বৃদ্ধের পক্ষে প্রয়োজনীয় নহে। অতএব আমাদের বয়ঃপ্রাপ্ত সন্তানদিগের সুখের জন্য পরিবার মধ্যে, কি কি বিষয় থাকা কর্ত্তব্য, তাহা একবার স্থির চিত্তে আলোচনা করিয়া দেখা উচিত।

এই চিন্তাতে প্রবৃত্ত হইলে সর্ব্ব প্রথমেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, পরিবার মধ্যে সন্তানগণ যদি স্বাধীন ভাবে ও অসংকোচে বাস করিতে না পারে, তাহা হইলে তাহারা কখনই সুখী হইতে পারে না। যে স্থানে মানবকে সংকোচে সংকোচে, ভয়ে ভয়ে থাকিতে হয়, তাহা তাহার পক্ষে সুখের স্থান হইতে পারে না। সন্দেহ ও ভয়ের অবস্থার ন্যায় কষ্টের অবস্থা মানবের পক্ষে অতি অল্পই আছে। কোন সসর্প গৃহে যদি এক রাত্রি বাস করিতে হয়, সেই এক রাত্রি এক যুগের ন্যায় বোধ হয়। যে ভৃত্যকে বিশ্বাস করিতে পারি না, তাহাকে লইয়া কাজ করিতে সর্ব্বদাই মনের অসুখে বাস করিতে হয়, ইহা আমরা প্রতিদিন দেখিতেছি। সেইরূপ পরিবার মধ্যে যদি নরনারীকে সন্দেহ ও ভয়ের মধ্যে সর্ব্বদা বাস করিতে হয়, তাহা হইলে সে পরিবার মধ্যে সর্ব্বদা নরকাগ্নি জ্বলিতে থাকে, কেহই সেখানে থাকিয়া সুখী হয় না; এবং সেখানে থাকিয়া সকলের আত্মার অধোগতি হয়। এই কারণে পারিবারিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে আমাদিগকে সর্ব্বাগ্রেই দেখিতে হইবে যে, কিসে সন্তানগণ নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে ও নির্ভয়ে বাস করিতে পারে। ইহার অর্থ এই যে, পিতা মাতার সহিত তাহাদের এরূপ সম্বন্ধ ও এরূপ ভাব হওয়া চাই, যাহাতে তাহাদের মানসিক ভাব সম্বন্ধে তাহাদের কোন সন্দেহ না থাকে, এবং তাহাদের বিরাগ ভয়ে তাহাদিগকে সর্ব্বদা কুণ্ঠিত থাকিতে না হয়। যদি এসংসারে হৃদয় খুলিয়া কথা কহিবার ও শুনিবার কোথাও প্রয়োজন থাকে, তবে তাহা পরিবার মধ্যে। পিতা মাতা প্রাণ খুলিয়া সন্তানদিগকে সমুদয় মনের ভাব জানাইবেন ও তাহাদিগকে অসংকোচে সমুদয় মনের ভাব গোচর করিতে দিবেন। অনেক সময়ে বালক বালিকারা এমন অনেক কথা বলে, যাহা নিতান্ত অযুক্ত ও উপহাসের উপযুক্ত। তাহাদের সে কথা গুলিও আদর পূর্ব্বক শুনিতে হইবে ও প্রসন্ন চিত্তে বিচার করিতে হইবে। যদি ক্রোধের ঝাপটায় দ্বারা তাহাদের প্রাণের প্রজ্জ্বলিত উৎসাহাগ্নি নির্ব্বাণ করা যায়, তাহা হইলে পরিবার মধ্যে ত্বরায় ভয়ের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রেমের শাসন অন্তর্হিত হইতে থাকে। সেই পিতা মাতা প্রকৃত বুদ্ধিমান, যাঁহার সন্তান-

দিগকে অসংকোচে ও স্বাধীন ভাবে সমুদয় মনের কথা বলিতে দিয়া থাকেন। এমন কি, আমাদের ব্যবহারে তাহারা যে দিন যে কিছু অন্যায় দেখিবে, তাহাও অসংকোচে বলিবে। তাহাদের মতে ভ্রম থাকিলে দেখাইয়া দিব, সত্য থাকিলে নিজ নিজ ত্রুটী স্বীকার করিব। পরিবার মধ্যে সন্তানদিগের স্বীয় স্বীয় হৃদয়ের ভাব গোচর করিবার স্বাধীনতা থাকা যেমন আবশ্যক, সেইরূপ স্বীয় স্বীয় রুচি ও কর্ত্তব্য-বুদ্ধি অনুসারে কার্য্য করিবার স্বাধীনতা থাকাও তেমনি প্রয়োজনীয়। যেখানে মানব নিজ রুচি ও বিশ্বাস অনুসারে কার্য্য করিতে পারে না, সেস্থান তাহার নিজের স্থান নহে। অতএব সন্তানগণ যদি অনুভব করে যে, পিতা মাতার অনুদারতা নিবন্ধন তাহারা স্বীয় স্বীয় বিশ্বাস অনুসারে কার্য্য করিতে পারিতেছে না, তাহা হইলে, সে পরিবার ত্বরায় তাহাদের পক্ষে অসুখের আলয় হইয়া উঠিবে।

বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে পূর্ব্বোক্ত ভাবের বিশেষ অভাব দৃষ্ট হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের পরিবার মধ্যে পিতা মাতার সহিত পুত্র কন্যার মানসিক চিন্তা ও ভাবের বিনিময় দেখা যায় না। অনেক পরিবারে পুত্র কন্যাগণ পিতাকে ভয়ের চক্ষে দেখিয়া থাকে। তাহারা তাঁহার নিকট মন খুলিতে সাহসী হয় না। পুত্র কন্যার হৃদয় অনেক পিতা মাতার পক্ষে দুরবগাহ সাগরের গভীর গর্ত্তের ন্যায়, তন্মধ্যে কি আছে তাহা তাঁহারা জানেন না। তাহারা কি ভাবিতেছে, কি তাহাদের সুখ দুঃখ, কি তাহাদের আকাঙ্ক্ষা, তাহাও তাঁহারা অনেক সময় জানিতে পারেন না। এই কারণে পারিবারিক সম্বন্ধের যে মিষ্টতা, তাহা উভয় পক্ষের কেহই অনুভব করিতে পারেন না। এই দূরত্ব ভাব বিদূরিত না হইলে পরিবার আমাদের পুত্র কন্যার পক্ষে আকর্ষণের পদার্থ হইবে না।

পরিবার মধ্যে পুত্র কন্যাগণ স্বাধীন ভাবে বসিবে দাঁড়াইবে, অসংকোচে হাসিবে খেলিবে, অসংকোচে সকলের সহিত মিশিবে অথচ ধর্ম্ম ও নীতির অব্যক্ত শাসন দ্বারা সুরক্ষিত হইবে। এই কারণে এক দিকে যেমন স্বাধীনতা থাকিবে, অপর দিকে তেমনি চরিত্র ও ধর্ম্মের শাসন থাকিবে, কারণ যে স্বাধীনতা ধর্ম্ম ও পবিত্রতা দ্বারা অনুপ্রাণিত নহে, তাহা সচরাচর উচ্ছৃঙ্খলতার আকার ধারণ করে। ধর্ম্ম-চর্চ্চাকে পারিবারিক সুখের ভিত্তিস্বরূপ করা কর্ত্তব্য, তাহা হইলে পরিবার মধ্যে সুনীতি ও সাধুতার বায়ু প্রবাহিত থাকিবে। শিশুদিগকে শিক্ষা দিবার বিষয়ে একটী পাকা কথা আমরা অনেক দিন শুনিয়াছি, সেটী এই, এরূপ ভাবে শিশুদিগকে শিক্ষা দেও, যাহাতে তাহারা জানিতে না পারে যে শিক্ষা দিতেছ। পারিবারিক শাসন সম্বন্ধেও সেই কথা। পুত্র কন্যাকে এরূপ ভাবে ধর্ম্মের শাসনের মধ্যে রাখ, যাহাতে তাহারা জানিতে না পারে যে তাহাদিগকে শাসনের মধ্যে রাখিতেছ। পিতামাতার স্নেহ ও দৃষ্টির মধ্যে থাকিলেই এই শাসন আপনাপনি ঘটিয়া থাকে। সন্তানদিগকে সকল প্রকার বিশুদ্ধ আমোদ ভোগ করিতে দেও, নিজে তাহার সঙ্গে থাক, ও সেই আমোদে যোগ দেও, তদ্দ্বারা তাহাদের সুখ দশগুণ বর্দ্ধিত হইবে, অথচ তোমার দৃষ্টির দ্বারা তাহারা সুরক্ষিত হইবে; যদি সে পথে

কোন বিপদ থাকে, তাহাতে তাহারা পতিত হইবে না।

বিশুদ্ধ আমোদের উল্লেখ করাতে পারিবারিক সুখের উপযোগী আর একটী উপকরণের উল্লেখ করা হইয়াছে। মানবমনের তৃপ্তির জন্য বিশুদ্ধ আমোদ প্রমোদ নিতান্ত প্রয়োজনীয়। যে গৃহে তাহা থাকে না, সে গৃহে যুবক যুবতীগণ থাকিয়া সুখী হইতে পারে না। গুরুতর শ্রমে মন যখন অবসন্ন ও ক্লান্ত হয়, তখন যদি পরিবার মধ্যে বিনোদনের উপায় কিছু না থাকে তাহা হইলে তাহাদিগকে অন্যত্র গমন করিতে হয়। বিশেষতঃ যে চিত্তে কেবল শ্রম ও আমোদের একান্ত অভাব সে চিত্ত ত্বরায় বিরস হইয়া পড়ে, তাহা আর সংসারের কোন ঘটনাকে প্রসন্ন নয়নে দেখিতে পারে না। কোন প্রকার ভাল বিষয়ে আর তাহার উৎসাহ থাকে না। মনের এরূপ অবস্থা কোন প্রকার উন্নতির অনুকূল নহে। একারণেও পরিবার মধ্যে বিশুদ্ধ আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা থাকা কর্ত্তব্য। নৃত্য, গীত, বাদ্য বালক বালিকার পক্ষে এসকল অনিন্দনীয় বলিয়া গৃহীত হওয়া কর্ত্তব্য। তাহারা অসংকোচে পিতামাতার সমক্ষে নাচিবে গাইবে, হাসিবে এবং জনক জননী সেই সকল আমোদে যোগ দিবেন। তাঁহারা যে আমোদে অংশী হইবেন, তাহা তাহাদের পক্ষে অনেকগুণে অধিক মিষ্ট লাগিবে।

বর্ত্তমান হিন্দু গৃহস্থের গৃহে এবিষয়টীর নিতান্ত অভাব। নৃত্য গীত বাদ্য প্রভৃতি হিন্দু সমাজে অতিশয় নিন্দনীয়, বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্র কন্যাদিগের পক্ষে পিতা মাতার সমক্ষে এরূপ আমোদ করার ন্যায় ভয়ানক কথা আর কিছু হইতে পারে না। যে বালক বালিকা গীতবাদ্যে অনুরক্ত, তাহারা সর্ব্বনাশের পথে পদার্পণ করিয়াছে, লোকে এইরূপ ভাবিয়া থাকে। সমাজের লোকের এইরূপ ভাব থাকাতে দেশের সমূহ অকল্যাণ হইতেছে। আমাদিগের যুবকদিগকে আমোদ প্রমোদের লোভে সমবয়স্ক যুবকদিগের সহিত মিশিয়া অন্যত্র যাইতে হইতেছে। যেখানে পিতা মাতার চক্ষু নাই, নিষেধ বা তিরস্কার করিবার কেহ নাই, তাহাদিগকে নীতির শাসনের মধ্যে রাখিবার জন্য কেহ নাই, সেখানে যে তাহারা বিশুদ্ধ আমোদই করিবে, তাহা কে বলিবে। এই সকল দলে পড়িয়াই অনেক যুবক সর্ব্বনাশের পথে পদার্পণ করে। সুতরাং হিন্দু গৃহস্থের গৃহে বিশুদ্ধ আমোদের উপযোগী বিষয় সকল প্রবর্ত্তিত হওয়া উচিত।

পারিবারিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে এতদ্দেশে আর একটী অভাব দৃষ্ট হয়। পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ যতই পরস্পরের সহিত মিশিবেন, সকল প্রকার আমোদ প্রমোদে যোগ দিবেন, প্রাণখুলিয়া পরস্পরকে মনের কথা বলিবেন ও শুনিবেন, সুখে দুঃখে পরস্পরের সাহায্য করিবেন, পরস্পরের আকাঙ্ক্ষা ও বাসনার অংশী হইবেন, ততই তাঁহাদের মধ্যে অপূর্ব্ব প্রীতিবন্ধন দৃঢ় হইবে, ও সে গৃহস্থের গৃহটী সুখের আলয় হইবে। একটী যুবকের স্বাভাবিক প্রতিভা আছে; তিনি সুকবি। তাঁহার একটী ভগিনী আছেন। দুই ভ্রাতা ভগিনীতে বড় ভাব। ভগিনী ভাইএর প্রতিভা দেখিয়া একেবারে মুগ্ধ, ভাই যাহা কিছু রচনা করেন, তাহা সর্ব্বাগ্রে ভগিনীর নিকট পঠিত হয়;

সুনীতি শিক্ষার অনুকূল হইবে না। পরিবার মধ্যে হৃদয় মনের উন্নতিকর সকল বিষয়ের চর্চাকে জাগ্রত রাখিতে হইবে। বাহিরের জগতে যত ভাল বিষয়ের আন্দোলন হইতেছে, সেই আন্দোলনের তরঙ্গ পরিবার মধ্যে যাওয়া চাই; পুত্রকন্যাদিগকে সেই সকল বিষয়ে মনোযোগী করিতে হইবে, গৃহ মধ্যে জ্ঞান বৃদ্ধির উপায় থাকিবে; পুস্তকালয়, পাঠাগার প্রভৃতি রাখিতে হইবে। পিতা মাতা সকল দেশ-হিতকর ও আত্মার উন্নতিকর বিষয়ে সন্তানদিগের সহিত তর্ক বিতর্ক করিবেন; সর্ব্বদাই প্রকৃত সত্য নির্দ্ধারণ বিষয়ে তাহাদের সহায়তা করিবেন; নিত্য নিত্য নূতন জ্ঞান তাহাদের মনের দ্বারে আনিয়া দিবেন; যেখানে গেলে কিছু শিক্ষা করা যায়, সেখানে যাইতে উৎসাহিত করিবেন; সংক্ষেপে বলিতে গেলে সর্ব্বদাই তাহাদিগের মানসিক আহার যোগাইবার দিকে দৃষ্টি রাখিবেন।

সর্ব্বোপরি তাহাদের জীবনকে ধর্ম্ম বিশ্বাস ও সাধুতার ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পাইবেন। যে চরিত্র ধর্ম্ম বিশ্বাসের ভূমির উপরে প্রতিষ্ঠিত নয়, তাহার স্থিরতা বিষয়ে কোন ভরসা নাই। সৎসঙ্গে ও সৎ পরিবারে থাকিয়া অনেক বালক বালিকা সৎ হইয়া বর্দ্ধিত হয়; তাহাদের স্বভাব মিষ্ট ও বিনয়ী, অসৎদিকে তাহাদের মতি নাই, যে দেখে সেই ভালবাসে, সকলেই প্রশংসা করে। এরূপ স্বাভাবিক সাধুতা দেখিয়া পিতা মাতা সন্তুষ্ট থাকিবেন না। এমন অনেক সাধুতা দেখিলাম! জীবন সংগ্রামে তাহা টিকিল না! প্রবৃত্তিকুলের প্রবল আঘাতে তাহা চূর্ণ হইয়া গেল! প্রলোভনে পড়িয়া তাহা অতি অসার বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। মনু বলিয়াছেন;— "বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি", অর্থাৎ বলবান ইন্দ্রিয় সকল জ্ঞানী ব্যক্তিকেও আকর্ষণ করে। ইহা সত্য কথা। যখন জ্ঞানী ব্যক্তিও প্রবৃত্তিকুলের প্রবল আঘাতে সুস্থির হইতে পারেন না, তখন কেবল মাত্র স্বাভাবিক "ভাল মানুষীর" উপরে সন্তানদিগকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দিও না। যদি পার তাহাদের বিশ্বাস নেত্র খুলিয়া দেও, তাহারা পরমতত্ত্ব একবার দর্শন করুক, ধর্ম্মের ও সাধুতার নিগূঢ় ভূমি একবার দেখিয়া লউক; তৎপরে সংগ্রাম ক্ষেত্রে তাহারা ঈশ্বরের দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া থাকিবে। যে পরিবার মধ্যে এই উপকরণ গুলি বিদ্যমান, সেই পরিবারেই যুবক যুবতীদিগের সুনীতি শিক্ষার অনুকূল।

শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী।

সমাপ্ত।